দীপিতার ঘরে রাত্রি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—
শ্রাবণ ১৩৭২

প্রকাশক—
শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

কর—
কুমার চৌধুরী
প্রিন্টিং ওয়ার্কস
এ. তারক প্রামাণিক রোড
কাতা-৬

শ্রীমতী গৌরী দেবী মজুমদার

করকমলেষু

অঘটনা

কেউ বলল অফিসের ক্যাশ ভাঙা, কেউ বলল—প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী ; দু-একজন ইঙ্গিত করল নেশা করে জলে ডুবেই হয়তো, অন্তত একজন বলল—এমন হয় যে সাধারণ গৃহস্থ হিমালয়ের টানে আর সব কিছু ভুলে যায়।

যাই হোক, এক সন্ধ্যায় চিত্রার স্বামী ফিরল না, রাত্রিতেও নয়, তার পরদিনও নয়, আর কোনো দিনই নয়। বড় দুঃসময়ের দিন সে সব। মানুষ যেমন এখন হঠাৎ হারিয়ে যায় তেমনি তখনও হঠাৎ হারিয়ে যেত। হোক নিঃসম্বল গরীব কেরানী, তবুও সে একটি মেয়ের স্বামী, দুটি শিশুর পিতা, তাদের সকলের আশ্রয়—যদি বা তোমরা বলো সংসারের সে এমন কোন স্থানটি পূর্ণ করে ছিল যে সে চলে গেলে ধরা পড়বে মানুষের চোখে।

চিত্রার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। দূর পশ্চিমের এই শহরে বিয়ের পরে সে শাশুড়ীকে পেয়েছিল আর স্বামীকে। তারপর একদিন অতিদূর সম্পর্কের এই দেবরটি এসেছিল।

চিত্রার স্বামী বলেছিল এই আত্মীয়টিকে বসিয়ে খাওয়াবে এমন সামর্থ্য তার নেই। চিত্রার মাথায় চেপেছিল কথাটা প্রকাশ করার দায়িত্ব। চিত্রা তাকে বলেছিল, 'তোমার দেশে কে আছে ?'

'দেশে ?'

'হ্যাঁ দেশে, মানে বাবা-মা, ভাই…'

আত্মীয়টি হেসে বলেছিল, 'বেশ যা হোক। আমার নাম অশোক। তার মানে এই নয় আমি কারো শোক দূর করেছি। আমাকে কারো জন্যে শোক করতে হবে না তাই।'

'ও !' চিত্রা থ' হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীকে চিত্রা রাত্রিতে বলেছিল, 'ঠিকই এসেছে ও। আমার তবু মামাবাড়ি আছে। তোমার তবু মা আছেন, আমি আছি। ওর সেসব বালাইও নেই। অনাত্মের আড্ডা ঠিকই খুঁজে বার করেছে।

চিত্রার স্বামী হেসে উঠেছিল, 'কিন্তু ও কি লেখাপড়া করবে ? জিজ্ঞাসা ক'রো।'

চিত্রার যখন প্রথম ছেলেপুলে হল তখন অশোক বার দু-এক কলেজের প্রথম পরীক্ষায় ঘায়েল হয়ে বলল, 'ও আর হবার নয়, দাদা, পাঁচ বছর লেখাপড়া ছেড়ে থেকে মাথার ভিতরটা পাথর হয়ে গেছে, দাগ বসছে না। বলো তো নোকরি খুঁজি, না হয় ছেড়ে দাও, আবার ভেসে পড়ি।'

চিত্রা বলেছিল, 'ভাসবে কেন ?'

স্বামীকে সে বলেছিল, 'স্বজন নেই আমাদের, যারা আসছে তাদের নিয়ে আমরা একটা মস্ত পরিবার হব একদিন। নেই বলতে কত হবে। এখন কিন্তু অশোককে চলে যেতে দিও না।

সে কয়েকদিন মাত্র মা হয়েছে কিন্তু তার বসার ভঙ্গি, কথার সুর, বক্তব্য সবটা মিলিয়ে একটি চিরকালের মায়ের মতো দেখাল। তার স্বামী দেখে খুশি হল।

এই বিভুঁই বিদেশে অবাঙালির দেশে দুটি ছেলে নিয়ে চিত্রা, তার স্বামী, তার শাশুড়ী আর অশোক একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠি হয়ে উঠল ক্রমশ। অশোক অর্থ উপার্জন করতে লাগল, সংখ্যার পরিমাপে সামান্য, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাপে অনেক। শেষ পয়সাটা পর্যন্ত চিত্রার হাতে তুলে দিয়ে সে সংসারে একজন হয়ে রইল।

একদিন চিত্রার স্বামী বলেছিল, 'তুই যা পাচ্ছিস, তাতে তোর একার তো ভালোই চলে রে, অশোক, আমাদের সকলের সঙ্গে তবে দুঃখের অন্ন ভাগ করে খাচ্ছিস কেন?'

'তুমি যা উপার্জন কর, তাতে তোমারও তো একলার ভালোই চলে শুনেছি। চল দুজনেই মেসে গিয়ে উঠি।'

'এরা?'

'তাই তো', ব'লে অশোক হেসেছিল।

যা বলছিলাম। চিত্রার স্বামী এল না। অশোক খুঁজল। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়, পুলিশের কাছেও খবর দিল। খবর কেউ আনল না। শুধু পুলিশ যেন সুযোগ পেয়ে চিত্রার স্বামীর অফিসে খোঁজ করল, সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ নিতে লাগল, শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য বাঙালি বিপ্লবীর এই বাড়িটাতেও তল্লাসি করে গেল। চিত্রা কাঁদল, চিত্রার শাশুড়ী কাঁদল। চিত্রাকে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসতে হত ছেলে দুটির জন্য আহার্য যোগাড় করতে। চিত্রার শাশুড়ীর এমন তাগাদা ছিল না। এক বছর পরে তার সব কান্না সব তাগাদা ফুরিয়ে গেল।

একদিন বোঝা গেল সংসারটা চলছে না। খাবার লোক দুজন কমেছে কিন্তু তার সঙ্গে কমেছে চিত্রার স্বামীর উপার্জন। বাকি খরচ যা আছে সেটা অশোকের উপার্জনে কুলোয় না।

অশোক বলল, 'সংসার না-চলাটাই স্বাভাবিক। এতদিন কি ক'রে চলল সেটাই বিস্ময়ের। অকাজের জিনিস, সোনার টুকরো-টাকরা যা ছিল সব গেছে তো?'

'কি করি তাই বলো এখন।'

'তোমার মামারা না থাকেন, মামাতো ভাইরা আছেন! একটা চিঠি লিখে দেখ?'

'এতদিন কোনো খবর দেয়া হয়নি।'

'এ তো মৃত্যু নয়।'

চিত্রা মামাতো ভাইদের খবর দিয়েছিল। দিন পনের পরে উত্তর এল। অশোক উৎসুক হয়ে ঘুরল খবরটা চিত্রা আপনি দেবে আশা করে। অবশেষে সে প্রশ্ন করল, 'বলো কি লিখেছে, ভাইরা। খারাপ হলেও মাথা ঘুরে পড়ে যাব না।'

'কিছু করার নেই তাদের।'

চিত্রা বলতে পারল না মামাতো বৌদি কি লিখেছেন। লেখার যুক্তি আছে তাঁর। ধরতে গেলে তিনিই মানুষ করেছিলেন চিত্রাকে। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন; শাশুড়ীও নেই, এ অবস্থায় একজন নিঃসম্পর্কিত যুবা-পুরুষের সঙ্গে একা এক বাড়িতে তোমার মতো বয়েসের একটি মেয়ের দিন কাটানো সমাজের সামনে খারাপ নজির রাখছে।

সে চিঠিটা পড়ে অশোকের পরিচিত মুখখানা কয়েকবার দেখেছিল, মাঝখানে একবার একটু সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল বৈকি তার চোখে-চোখে তাকাতে। আর একবার তার নিজের অনাহার-জীর্ণ প্রসাধন-সম্পর্কহীন রুক্ষদেহের দিকেও নজর পড়েছিল—চিঠিটার এমনি শাসন।

কিছুদিন পরে চিত্রা বলেছিল, 'তুমি সারা জীবন এমনি অকারণে ঘানি টানবে?'

শিশু দুটির দিকে নির্দেশ করে অশোক বলল, 'ওদের চাইতে বড় কারণ আমার জীবনে আর কোথায় আপাতত।'

প্রায় দু-বছর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে খোঁজ-খবর নেয়াতে তখনও ক্লান্ত না-হয়ে অশোক বলল, 'এক কাজ কর না হয়, বাঙলাদেশে কোথাও রেখে আসি বরং তোমাদের আমি খুঁজে বেড়াই।'

'তা হয় না। যদি উনি এসে আমাদের এখানে না পান—কি করে ঠিকানা জানবেন আমাদের? দু-পক্ষকেই হারালে চলবে না। আমাদের স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আমার মৃত্যুর পরেও খোকারা থাকবে তাঁর জন্যে দরজা খুলে রেখে। আমি বলি, তুমি বরং এবার বিশ্রাম নাও।'

'চাকরি করবে তুমি? চট করে কি তা পাওয়া যায়। মেয়েদের স্কুলে চাকরি করার ডিগ্রি তোমার নেই। হাসপাতালে নার্স হতে পার। কিন্তু এটা তো গল্প নয়, বলা মাত্র হাসপাতাল তৈরি হল। শহরে আছে বটে, কিন্তু নার্স দুটির একটি না মরা পর্যন্ত তুমি চাকরি পাচ্ছ না।'

চিত্রা কি জবাব দেবে?

অশোক ধীরে-ধীরে বলল, 'দশ-বিশ টাকা সেলাই করে পাওয়া যায়, কিন্তু চট করে সংসার চালাবার টাকা ওতে হয় না। বরং সেলাইয়ের কাজও কর, আমিও চাকরি করি। দুয়ে মিলিয়ে সংসারটা চালানো যায় কিনা দেখ।'

তারপর এগারো বছর গেল।

চিত্রা বলল, 'শ্রাদ্ধ করতে হবে।'

'তা করো।'

সামান্য আয়োজনের শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

অশোক সন্ধ্যার পরে ঘরে এসেছিল কাল সকালেই বাজার করতে হবে কিনা খবর করতে। চিত্রাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দারিদ্র্যজীর্ণ হলেও এতদিন পাড়-দেয়া শাড়ি পরেছে সে, কপালে কখনো-কখনো সিঁদুরও দিত। অবেলায় মাথা ঘষে সিঁদুর তুলে ফেলেছে, হাতের লোহা ভেঙেছে, সদ্য বিধবার বেশে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এই মাত্র শাড়ির পাড় টেনে-টেনে ছিঁড়েছে। এখনও হাঁপাচ্ছে, কিম্বা হয়তো সেটা কান্না চাপার চেষ্টা।

'এ কি?'

'শ্রাদ্ধের পরে এই বিধান।'

'না।'

অশোক জানত কোথায় সিঁদুর থাকে। আঙুলে করে সিঁদুর এনে চিত্রার কপালে দিয়ে দিল অশোক।

চিত্রা কিছু বলতে পারার আগেই অশোক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে অশোক বলল, 'অমন চেহারা করে? ছেলেরা ভয় পাবে। পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাবে না।'

'ওরা কি সত্যিটা জানবে না?'

'জানবে যখন প্রয়োজন হবে।'

'তুমি জানো, এ মিথ্যা অভিনয় নয়?'

'অভিনয় হতে পারে, মিথ্যা কেন?'

আরও দু-বছর পরে, চিত্রার বড়ছেলে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ছোট-ছেলেও ডাগর হয়ে উঠেছে।

অশোক একদিন এসে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে, চিত্রা।'

'পার্টনারকে ডাকছ বুঝি?'

'ঠিক তাই। পর-পর চারবার প্রোমোশনের সুযোগ পাশ কাটিয়ে গেছি এই শহরে থাকার তাগাদায়।'

'সে কি? বলোনি তো কোনোদিন। কি তাগিদ এমন এ শহরে থাকার তোমার?'

'সেটা পরে হিসেব করব। এখন বলো কোম্পানি প্রমোশন দিয়ে অন্য শহরে পাঠাতে চাচ্ছে, যাব কি না।'

'তুমি বলো কি করা উচিত।'

'টাকা খুব দরকার! বড় খোকার কলেজে পড়ার খরচ চালাতে হবে, অথচ

অন্য জায়গায় গেলে সে যদি এসে ফিরে যায় ।'

চিত্রা অশোকের মাথার উপর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল, চোখ নামিয়ে আনতে চোখ পড়ল অশোকের চুলের একপাশে যেখানে দু-একটা পাকা চুল চিক-চিক করছে ।

'এখানকার ব্যবস্থাও একটা কিছু কর ।'

চিত্রারা অন্য শহরে এসেছে । প্রোমোশনটা সত্যিকারের । বাসা পেয়েছে । তাদের পুরনো দু-একখানা ঘরের বাসার মতো নয় । বসবার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে অনেকগুলি, সামনে একফালি মরশুমি ফুলের বাগান ।

অশোক শুধু নিজের চাকরির উপযুক্ত পোশাক করল না । চিত্রা ছেলেদের সাজালো যত প্রকারে সম্ভব । একদিন অফিস-ফেরত শাড়ি কিনে আনল চিত্রার জন্য । বলল, 'তুমিই বা বাদ থাক কেন ?'

'আমি ?'

'নয় কেন ?'

'উচিত কি ?'

'কেন অনুচিত ?'

এই সময়ে চিত্রা যেমন দেখতে হয়েছিল তার একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার । প্রায় চল্লিশের দাগ পার হয়েছে তার । পরিমিত আহার এবং কঠিন জীবন যাপনের ফলে প্রৌঢ়ত্ব আসেনি । আধপাকা ধানের রঙ তার ত্বকের, কানের পাশে দু-একটি চুলে পাক ধরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কিন্তু তার দাগটি আছে । প্রোফাইলটায় তাকে ভালো দেখায়, সামনাসামনি তাকে দেখার চাইতে, কিন্তু ঠোঁটের বাঁ কোণে যে তিলটি আছে তা চোখে ধরা পড়ে না । শেষের দিকের কয়েক বছরে একটু পুষ্টাঙ্গী হয়ে উঠেছে সে, গলাটা ভারি হয়েছে ।

এখন তার না-করলে নয় কাজগুলি করলেই চলে না । অশোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করছে জীবনের, চিত্রাকে দু-হাত ভরে সেগুলিকে ঘরে তুলতে হয়, গুছিয়ে রাখতে হয় ।

একদিন অফিস ফেরত আশোকের পিছনে ট্রাক বোঝাই হয়ে মস্ত টেবিল এল আর তার সঙ্গে মাপ করে তৈরি চেয়ার । চিত্রার ছোট ছেলে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে হৈ-হৈ করে মাকে ডেকে আনল, 'দেখবে এস, মা, কি এনেছে খানু সাহেব ।'

চিত্রা এল । কর্মক্লান্ত পুরুষ বাড়ি ফিরবার সময় হাতে করে যা এনেছে সেটা হাত বাড়িয়ে নিতেই হয় ।

সে বলল, 'কিন্তু খাঁ সাহেব, তোমার বসবার ঘরে এ ধরবে কোথায় ?

'এটা তো খাবার টেবিল ।'

'খাবার মানে, সাহেবি ব্যবস্থা ?'

'আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতে পারব তারই ব্যবস্থা,' বলল অশোক খাঁ ভাদুড়ী।

ছোটছেলে আত্মহারা হয়ে বলল, 'এতদিনে ঠিক একটা কাজ করেছে খানু সাহেব। আমরা দু-ভাই, মা আর তুমি চারজন, আরও দু-খানা চেয়ার অতিথির জন্য।'

'সে কিরে, আমি খাব কি তোদের সঙ্গে?'

অশোক বলল, 'এ বিষয়ে আমি আর ছোটবাবু একদলে, ভোটে তোমার হার।'

চিত্রা বলল, 'তা হবে। এখন অমনি থাক। আগে চা হোক।'

একদিন ছোটছেলে মুখ লাল করে ফিরে এল স্কুল থেকে। চিত্রার অনেক অনুনয়েও সে মুখ খুলল না। কিন্তু অশোকের কাছে খবর পেঁৗছেছিল চিত্রার মুখে। রাত্রিতে খেতে বসে অশোক ছোটছেলের বেদনাটা খুঁজে বার করল। তার সহপাঠিদের কাছে খানু সাহেব নামটা অপরিচিত নয়। তাদের কেউ-কেউ আতিথ্য নিয়ে দু-এক বেলা এ বাড়িতে থাকার সুযোগ নিয়ে খানু সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেও গেছে। তাদের মুখে-মুখে তাঁর সহৃদয়তা, সদয়তা, সরসতার খ্যাতি সহপাঠিদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। আজ একটি ছেলে প্রশ্ন করেছিল: 'তোরা তো চক্রবর্তী আর খানু সাহেব তো মুসলমান, তবে?' ছোটছেলে প্রশ্নকর্তার মূর্খতায় হেসে উঠে বলেছিল, 'খানু সাহেবও হিন্দু, তাঁর উপাধি খাঁ ভাদুড়ী।' দ্বিতীয় একটি ছেলে বলেছিল, 'তা হোক বাবাকে কেউ বাবা ছাড়া খানু সাহেব বলে না।' আর একজন বলেছিল, 'তুই বা চক্রবর্তী হতে গেলি কেন, খাঁ ভাদুড়ী তো চমৎকার উপাধি।'

সব শুনে অশোক হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর তেমনি সহসা হাসি থামিয়ে সে বলল, 'ছোটবাবু, তুমি কি খাঁ ভাদুড়ী হতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, কাল স্কুলে যাব আমি, ঠিক করে দিয়ে আসব। আর কি?'

'খানু সাহেব বলা ভালো নয়, এখন আমরা বড় হয়েছি।'

'তোমার দাদা আরও বড় হয়েছে, তার তো ওই ডাকেই চলছে।'

'তা চলুক, বাবা।'

অশোক সময় নিল। আর সময় নেয়াটা যাতে ছোটছেলের চোখে না পড়ে সে জন্য চুরুট জ্বালালে এবং তা জ্বালানোর ছলে মুখের সামনে দেশলাই সমেত হাত দুখানা বিস্তৃত করে রাখল।

'আচ্ছা হোক তাই।'

ছোটছেলে তখন-তখনই উঠে পড়ল। একটা অজানা দেশের দিশা পেয়েছে সে। উদ্ঘাটনটা তাকে এত অস্থির করে তুলল যে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

অশোক দেখল অভুক্ত আহার সম্মুখে পাংশু মুখে চিত্রা বসে আছে। দু-হাত দিয়ে টেবিলের ঢাকনাটা চেপে ধরেছে নতুবা যেন সে মূর্ছায় ভেঙে পড়বে। সে সময় নিক।

অশোক উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

ছোটছেলে মাস্টারের কাছে পড়ছে—এমন সময়ে চিত্রা এল অশোকের ঘরে। অসুখ-বিসুখ ছাড়া অশোকের ঘরে চিত্রা আসে না। হয়তো বা মামীমার প্রাথমিক শাসনই মনের তলায় একটা বাধা সৃষ্টি করেছে। পুরনো বাড়িতে পাশের ঘরে থাকার সময়ে তবু এর চাইতে বেশি আসত চিত্রা। এ বাড়িতে কয়েকটি ঘর ডিঙিয়ে প্রায়ই আসা হয়ে ওঠে না, ঝি বিছানা করে রাখে, চাকরে ঝাড়পোঁছ করে।

অশোক বলল, 'বস।'

চিত্রা বলল, 'একি করলে তুমি?'

অশোক বলল, 'উপায় ছিল কি আর?'

'সত্য চাইতে ভাস্বর আর কি? ওদের কি অপরাধ? সত্য পরিচয় লুকোতে হবে।'

'চেষ্টা তো করেছিলাম, চিত্রা, সত্যই আমার উদ্দেশ্য ছিল। হল আর। তোমার ছেলেদের নর-নারীর সম্বন্ধ বুঝবার বয়েস হয়েছে।'

'তারা কি তাদের মাকে বিশ্বাস করে না, তোমাকে অবিশ্বাস করে?'

'না। এ সব প্রশ্ন তাদের নেই। অত্যন্ত সহজ তাদের বিশ্বাস। কি করে হল জানি না। বিশ্বাস ভাঙিয়ে সত্যটাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে অবিশ্বাস আসলেও আসতে পারে—এই আমার ভয়।'

'তাই বলে সারাজীবন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইব, তুমি বইবে?'

'তারা তো একে কলঙ্ক বলে জানে না। কলঙ্ক বলে সন্দেহ করলেও করতে পারত যদি সত্যটা জানত। তারা মিথ্যা একটা কল্পনাকে সত্য বলে জেনেছে, তার উপর জীবন গড়ে তুলেছে। কোনো সন্দেহ, কোনো অবিশ্বাসের অবকাশ নেই তাদের কল্পনায়। কলঙ্ক একটা ঘটনা নয় চিত্রা। কলঙ্ক রটনা। কলঙ্কের জন্ম মানুষের মনে, প্রকাশ জিহ্বায়। একটি মিথ্যাও সত্যিকারের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পার।'

'কেন তুমি আত্মপ্রকাশ করনি ওদের কাছে এতদিন? আ, অশোক, কেন ওদের মিথ্যাকে সত্যি বলে বুঝবার সময় দিলে।'

'বোধহয় ওদের শিশু মনকে নিদারুণ সত্যটা থেকে আড়াল করার ইচ্ছায়; কিন্তু তুমি জানো, চিত্রা, আমাকে খানু সাহেব বলে ডাকতে আমিই শিখিয়েছিলাম।'

'আমি কি করব? কি করব?'

অশোক উঠল, চুরুট জ্বালিয়ে কি ভাবল, দেরাজ খুলে একখানা চিঠি বার

করে দিল চিত্রার হাতে।

বড় ছেলে লিখেছে ঃ 'খান্ সাহেব আমার মনে হয় এতদিনে তোমার জীবনের ভঙ্গিটা বুঝতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে একটা মধুর রসিকতা বলে সবটাকে গ্রহণ করা। তার সব চাইতে বড় প্রমাণ, তুমি তোমাকে খান্ সাহেব বলে ডাকতে শিখিয়েছ। পরম আরাধ্যের পদমর্যাদায় আসীন থাকার চাইতে সহচরের নৈকট্যে নেমে এসেছ। কিন্তু শোনো, গত পরীক্ষার আগে একরাতে যখন মনে হয়েছিল—আশানুরূপ সাফল্য লাভ হবে না, রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে-চেয়ে তোমাকে ডাকলাম বারবার উৎসাহ, আশ্বাস এবং তোমার বিশিষ্ট খেলোয়াড়-উচিত মনোভঙ্গি পাবার জন্য। বার বার বলেছিলাম, বাবা, আমি যেন তোমার মতো বেদনার দিকে হাসিভরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি।...'

চিঠি পড়ে চিত্রা উঠে দাঁড়াল টলতে-টলতে।

অশোক বলল, 'আজ সারা রাত তুমি ভাববে কলঙ্কমুক্ত মিথ্যা কিম্বা কলঙ্কের ছায়াগ্রস্ত সত্য কোনটা হবে। কাল আমাকে হুকুম কর।'

ছোটছেলের পড়ার ঘরের দরজায় চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়াল চিত্রা। শুনতে পেল ছোটছেলে বলছে তার মাস্টার মশাইকে, 'কাল থেকে স্কুলেও আমার নাম বদলে দেয়া হবে। পাকিস্তান হয়েছে বলেই তাজমহল ভেঙে ফেলা হবে না; তেমনি আমাদের ভাষাগুলো থেকে ফারসি কথাগুলো বাদ দেয়া হবে না। তবে আমার উপাধি খাঁ ভাদুড়ী বলতে দোষ কি হবে।'

চিত্রা দাঁড়াল না।

কুণ্ঠা, সংকোচ ও গ্লানি সবটুকু কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চিত্রা দেখল এই মিথ্যা পরিচয়টা জীবনকে সুসাধ্য করেছে। অত্যন্ত প্রয়োজনে পথে বেরিয়েও আগে মনে হত বহু শত চক্ষু তাদের দুজনের সম্বন্ধটাকে প্রশ্ন করছে, এখন যেন সে সব প্রশ্নের নিবৃত্তি হয়েছে। পৃথিবীর নানা ব্যাপার (হোক তা রাজনীতি কিংবা সাহিত্য, জুতোর দোকানদারের শিষ্টাচারের প্রয়াস কিংবা কাপড়ের দোকানীর অর্থলালসা) নিয়ে অশোকের মতামত যে হাসি আকর্ষিত করে সে হাসি এতদিন চিত্রাকে চেপে রাখতে হত ওই প্রশ্নসংকুল কাল্পনিক দৃষ্টিগুলোর জন্য। এখন সে হাসে। ছেলেদের সামনেও সেও আজকাল হাসে।

তবু ইতিমধ্যে একদিন এ পাড়া ও পাড়ায় খবর নিয়ে ফিরতে ফিরতে এমন সব কথাবার্তা হল (এতদিন এসব খবরদারি ছুটি-ছাটার দিনে অশোককে একাই করতে হত)।

সে যদি আসে কোনোদিন?

'এই নাকি চিত্রা তোমার বুকের বোঝা? তা যদি হয় তবে হাসো তুমি। আমার মনে হচ্ছে তার হাতে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার মুখ আমার থাকবে।'

চিত্রা হাত বাড়িয়ে অশোকের একখানা হাত ধরে বলল, 'তুমি পারবে

পার্টনার। তোমার মনের প্রসারের তুলনায় আমার মন কি তা তুমি দেখতে পেলে এখুনি।'

বড় ছেলে কোথায় এক রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই তার, বাড়িতে আসা দূরের কথা। ছোটছেলেও পড়তে গেল অন্য শহরের কলেজে। খাঁ ভাদুড়ী দম্পতীর হাতে অফুরন্ত সময়। ছোটখাট সভা, ক্লাবের মিটিং, চ্যারিটির জন্য বাজার, এ সবেই দিন কাটে। তাদের ছোঁয়াচে যারা আসে তারাও খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বলে খাঁ ভাদুড়ীদের উভয়কে উভয়ের মাপে ভগবান কেটে ছিলেন।

অশোক বলে, 'বহু যুগের সাধনায় পাওয়া সম্বন্ধ। বিয়ের চাইতেও বড়, কি বলো পার্টনার?'

চিত্রা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রায় প্যারালাল স্ট্রেইট লাইনের সাধনা।'

শহরের সব চাইতে আলোকোজ্জ্বল অংশে স্বামী স্ত্রীরা ওদের দেখাদেখি পরস্পরকে পার্টনার বলে ডাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু আলোর সঙ্গে অন্ধকার না থাকলে বুঝি মানুষের মন ভরে ওঠে না; নইলে খাঁ ভাদুড়ী দম্পতীর পোষ্য এমন একটি পিশাচ কি করে বসবাস করতে পারে এ বাড়িতে। এমন কুৎসিত, এমন ভয়াবহভাবে কুৎসিতও যে কোন মানুষ হতে পারে তা না দেখলে কল্পনা করার কথাও মনে হয় না। একটি চোখ একেবারেই নেই। দ্বিতীয়টির মণিও নিষ্প্রভ, শাদাটে রঙ ধরেছে। ডান হাতের গুটি কয়েক আঙুল নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে তার মুখের বিভৎসতা। গলিত ক্ষত শুকোনোর সময়ে ত্বকের যে সংকোচন হয়েছিল তাতে তার মুখখানা কঙ্কাল আর পশুর মধ্যবর্তী একটা আকৃতি নিয়েছে। হোক না দারোয়ানের ঘরের পাশেই তার ঠাঁই, কিন্তু তাও তো সদরেরই আবর্জনা। এক বিপদসঙ্কুল মেঘের সন্ধ্যায় সে চিত্রার আকস্মিক সদয়তার আশ্রয় পেয়েছে। আহা থাক না, সারাদিনে তো একবারও বেরোয় না ঘর থেকে যে কারো চোখে পড়ে অসুবিধা ঘটবে।

ছোটছেলে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সেদিন ওরা পিকনিক করতে বার হচ্ছে। ফিরতে দুদিন দেরি হলেও হতে পারে।

সদর দিয়ে বেরুতে-বেরুতে চিত্রা বলল, 'দারোয়ান চাকরদের খাবার ব্যবস্থা ঠিক করা থাকল, দুদিন দেরি হলেও ক্ষতি হবে না।'

'তা হবে, চারদিন হলেই বা ক্ষতি কি। ভদ্রগোছের ডাকবাংলো পেলেই হল।'

গাড়িতে উঠে ছোটছেলে বলল, 'ওই লোকটা কিন্তু বাঙালি, ঠিক আমাদের মতো নয়, বোধ হয় মহাতো উপাধির প্রবাসী বাঙালি। উচ্চারণটায় জড়তা আছে।'

'তা নাও হতে পারে। আমরা ঠোঁট, জিভ, দাঁত দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করি,

ওর বোধ মুখের পেশীগুলো ঠিক কাজ করে না।' অশোক বলল।

ছোটছেলে বলল, 'ভীতু কিন্তু লোকটি। সেদিন যেই শুনেছে আমাদের উপাধি চমকে উঠল। যে চোখটা অবশিষ্ট আছে তার মণিটা অস্বাভাবিক ভাবে নড়ে চড়ে উঠল যেন তা করে বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, কিংবা বিপদের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারবে। আমি বললাম—তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ, আমরা হিন্দু।'

'আঘাত পাওয়া লোক কিনা। কিন্তু এবার তোমার গল্পটা বন্ধ কর ছোটবাবু। তোমার মায়ের মন ভার হয়ে উঠছে। কষ্টের কথা শুনলে সকলে সইতে পারে না।'

'কিন্তু লোকটির একটি সদগুণও আছে। কাজ করতে চায়, বসে খেতে চায় না।'

'কি কাজ করতে পারে?'

'কাজ পাগল লোক, খেপল এবার', হাসল চিত্রা।

'কয়েকটা ছোট-ছোট কাজ দিয়েছিলাম, পারল না। হেসে বলল, 'কিছুই যে আর পারি না, বাবুসাহেব।'

'লেখা-পড়ার কাজ দিয়ে দেখেছ?'

চিত্রা পিছন থেকে অশোকের কাঁধে একখানা হাত রাখল।

'কি?'

'দুপুরুষের কাজের তাগিদে বেচারা কুকুরটা গাড়ি চাপা পড়ছিল।'

অশোক হেসে স্টিয়ারিং হুইলে মন দিল।

কথাটা পিকনিকেই স্থির হয়েছিল। হিল-স্টেশনের অত কাছে অমন সমতল উপত্যকায় অতটা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে এমনটা সহসা আশা করা যায় না। ছোটছেলে চারিদিকে ঘুরে এসে বলেছিল, 'উপত্যকাটা বিচ্ছিন্ন ছিল; ওরা বলছে গত বছরে যে রাস্তাটা শেষ হয়েছে সেটার জন্যেই এতদূর আসতে পেরেছি আমরা। আর সেজন্যেই আজ আমাদের চোখে লেগেছে জায়গাটা।'

চিত্রা বলল, 'এমন জায়গায় এবার কত বাড়ি উঠবে। ঝরনার দিকে মুখ রেখে একটা ছোট বাড়ি খুব ভালো হয়।'

বাসায় ফিরে এসে খাবার টেবিলে এই কথাটাই উঠল। নৈশ আহার পর্ব শেষ হয়েছে। আলোগুলো কাঁচের বাসনগুলোতে ছোট-ছোট তরঙ্গের মতো খণ্ড-খণ্ড হয়ে জ্বলছে। চিত্রার হাতে উলের কাঁটা। অশোক পরিতৃপ্তির ছোট একটি উদ্গার তুলে উঠে দাঁড়িয়ে চুরুট জ্বালল। স্নিগ্ধ প্রতিষ্ঠার অবসর এটা। চিত্রা বলল 'তুমি তা হলে এখন খুব বড় চাকরি করছ, বলো?'

এখানে বাইরের লোক নেই। যারা আছে তারা সৌভাগ্যের ও কৃতার্থতার অংশীদার। মুখের আদল দেখা যেত আয়না থাকলে। তা না হলেও প্রৌঢ় এই লোকটিকে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বড় ডাইরেক্টরের মতোই দেখাচ্ছে না?

অশোক বলল, 'চিরকাল তো চাকরি করতে পারব না। তখন কোম্পানির এ বাসা ছেড়ে দিতে হবে। নিজের নীড় দরকার হবে।'

চিত্রা বলল, 'বাঁচার উপরে তোমার খুব লোভ।'

ছোটছেলে কফির কাপটা অশোকের হাতে পেঁছে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছ' ছোটবাবু ?'

রুমালে ঢাকা একটা প্লেট হাতে ছোটছেলে বলল, 'পুডিংটুকু দিয়ে আসি লোকটাকে।'

'তার কথা তুমি এত ভাব ?'

'লোকটিও আমাকে ভালোবাসে। সেবার আমার অসুখের ব্যাপার জানো না তো। সে নাকি খবর পেয়েই দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিল ডাক্তার ডাকা হয়েছে তো ? দারোয়ানরা হেসেই বাঁচে না। কিন্তু তাদের হাসিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—ডাক্তার কি বলে গেল ? দারোয়ান চাকরদের পিছন-পিছন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আমার অসুখ সম্বন্ধে তোমাদের আলাপ নিজের কানে শুনে যেত।'

'অদ্ভুত স্নেহপ্রবণ তো লোকটি !' বলল চিত্রা।

ছোটছেলে চলে গেল খাবার নিয়ে।

চিত্রা বলল, 'অশোক, এ শুধু নিজেদের জীবন পর্যন্ত নয়। বাড়ি করা মানে আমরা চলে যাবার পরও আমাদের ইতিহাস জড়িয়ে রইল পৃথিবীতে।'

অশোক বলল--'ভেবে দেখি।'

কিন্তু ওদের আলাপে ছেদ পড়ল। ছোটছেলে কাতরমুখে ফিরে এল।

'সে নেই।'

'সে কি ! কোথায় গেল ?'

'সন্ধ্যায় খাবার-টাবার খেয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে।'

'অনেক রাত হল।' চোখে ভালো দেখে না।' বলল চিত্রা।

'সে ফিরবে না,' বলল ছোটছেলে।

'কি করে জানলে ?'

'এই দেখ।'

দু-একটা পুরনো কাগজের কাটিং একটা ছোট কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল ছোটছেলে। কাগজের টুকরোটায় লেখা আছে—ছোটবাবু, বিনা কাজে খেতে পারি না, তাই চলে যাচ্ছি।

একটা ক্ষণিক বিরতি। ঝি এসে টেবিলের বাসনগুলো নিয়ে গেল। তাস দিয়ে গেল একজোড়া। ঘুমুতে যাবার আগে আধঘণ্টা খেলা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাসে হাত রেখে অশোক বলল, 'কাগজের কাটিংগুলো কেন ?'

'ওগুলি তার বালিশের নিচে ছিল। ২৬শে জানুয়ারির সংকল্প আছে একটিতে, তার চাইতেও পুরনো একটিতে বেআল্লিশের ভারত ছাড় প্রস্তাবের

খানিকটা। উল্টো পিঠে কে একজন দাদা হারিয়ে গেছে, আর তার ছোট ভাই অশোক তাকে খুঁজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।'

'তুমি এখন কি করবে, খোকা ?' অশোক জিজ্ঞাসা করল।

'শুতে যাব।'

'কবিতা পড়ে শোনাবে বলেছিলে।' অশোক বলল।

'আজ থাক।' চিত্রা উঠে দাঁড়াল।

'তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে, মা ?'

চিত্রা হাসতে চাইল।

'জিন্ খেলেই তোমার অমন হয় দেখছি। এখন থেকে ওটা টেবিলে আনা চলবে না। মুখখানিও তোমার ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে।'

চিত্রা চলে গেলে অশোক আর একটা সিগার ধরাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটছেলে বলল, 'তুমিও আজ বিচলিত হয়েছ দেখছি। কফির পরে তুমি কদাচিত নতুন সিগার ধরাও।'

অশোক কাগজের টুকরোগুলো উল্টেপাল্টে দেখে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ; বলল, 'হঠাৎ একটা লোক চলে গেল।'

দীপিতার ঘরে রাত্রি

দীপিতার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই ইন্দু তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা বোধ করি ঠিক এ শব্দটা দিয়ে বোঝানো যায় না। সাধারণত ভিন্ন-মুখী দুটি শক্তিকে এনে পাশাপাশি দাঁড় করানো গেলে বলা যায় এ কথাটা। কিন্তু কতগুলি অসাধারণ ক্ষেত্রও আছে যখন বৈপরীত্য বোধটা পাশাপাশি অবস্থানের উপর নির্ভর করে না, যখন তুলনার বিষয় দুটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যেমন গোমড়ামুখো মন আর শরৎকালের প্রারম্ভিক রোদ, পলিটিক্যাল পরাজয়ের অনুশোচনা ও যে কোনো একটা জেঠা মেয়ের হাসির মাঝখানে স্যান্ডউইচ করা তার নরম কাঁধের শ্রাগ্।

সান দেওয়া শহরের মেয়ে দীপিতা; কথা যখন সে বলে চশমার সোনার ফ্রেম সেগুলিতে পালিশ লাগিয়ে দেয়, কানের অদ্ভুত-গড়ন দুলজোড়া দুলে, ডিগবাজি খেয়ে কাধের আননিতে ফুটে ওঠা যতি, কমা, কোলোন, জিজ্ঞাসা-চিহ্নের প্রকাশগুলি স্পষ্ট করে তোলে।

দীপিতা খদ্দরেই অভ্যস্ত; শুধু শাড়িতে নয়, তার বসবার ধরন, বুকের কাছে বইগুলি কুড়িয়ে নেবার পদ্ধতিটাতেই শুধু খদ্দর নয়, উঁচু করে কথা সে বলে না, উঁচু গলায় হাসে না।

কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকে বলে: হঠাৎ কিছুদিন ধরে আঁচলের একপ্রান্ত একটু তুলে খোঁপাটাকে আড়াল করার যে রেওয়াজ উঠেছিল কলেজে তার পেছনে দীপিতার শুধু প্রশ্রয়ই ছিল না। তেমনি ডাক-পিওনদের মতো চামড়ার অর্ধচন্দ্রাকার ব্যাগ কাঁধে ঝোলানোর ব্যাপারটাতেও দীপিতার নাম জুড়ে গেছে।

কিন্তু লোকে প্রকাশ্যে বলে না। পাঁছাপেড়ে শাড়ি কলকাতায় কি করে জুটল, এর চাইতেও বড় সমস্যা হল একদিন সেটা পরে কলেজে আসবার কথা দীপিতা কি করে ভাবতে পারল। শুধু পরা নয় যেখানে যে রকম টানটোন দেয়া দরকার তেমনি করে দেহকে ফুটিয়ে তুলে। সারাদিন তাকে কেন্দ্র করে কলেজে একটা বাতাস খেলে গেল। প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলেনি, হয়তো হাস্যকর ব্যাপারও অভিভূত করে দেবার মতো ভালো লেগে যায় কখনো।

দীপিতা নিজেও জানে এগুলি তার একসেন্ট্রিসিটি, আগে টের পায় না, ঘটে যাবার পর। কলেজে নতুন পাশ-করা কোনো অধ্যাপককে বিব্রত করে, লেডি চ্যাটারলির লালসার সমালোচনা তাঁর মৌনতা থেকে টেনে বার করে করে, শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের প্রথম একশো-তিরাশি পাতা স্রেফ গ্রন্থের কলেবর বাড়ানোর

জন্যে লেখা বলিয়ে নিয়ে, লরেন্সের প্রশংসা নিন্দায় পরিণত করে দীপিতা যখন তার বেঞ্চটাতে বসে তখন সে ভাবে এটাও এক একসেন্ট্রোসিটি হল।

ডিবেটিং-ক্লাবের দীপিতা, ভারতীয় ফেবিয়ান-ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'এমাজন' নয়। কেউ তাকে দেখেনি হেদোর উঁচু ব্রিজ থেকে কালো পোশাকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে জলে। কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু যখন সে বাড়ি ফিরে যায় কেউ কি দেখেছে তাকে? একটা ব্লাউস থেকে আর একটায় যাবার ক্ষণটুকু দীর্ঘায়িত হয়ে আয়নায় যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখন ক্লান্তির স্বেদমালা নাভির কাছে জন্ম নিয়ে বিপন্ন স্তনযুগলের মাঝখান দিয়ে কাঁধের দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘাড়ের পেছনে আবার একত্রিত হয়ে মাথাটাকে সামনের দিকে নত করে দেয় যেন। দীপিতা 'আঃ' বলে পাশের চেয়ারটায় গা ঢেলে দেয়। সে শুধু উনিশ বছরের একটি মেয়ে।

পরেশ মিত্তির বেড়িয়ে ফিরে আদ্দির পাঞ্জাবি খুলল, চুনট করা কোঁচাটা এক অদ্ভুত কায়দায় জড়িয়ে আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। কালো পাম্পসুটা খুলে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে গুছিয়ে রাখল, পাঞ্জাবির তলে যে মোটা গেঞ্জিটা পরা ছিল সেটা পালটে মসলিনের মতো হালকা একটা পরল। হালকা রঙের সিল্কের লুঙ্গিটার বাঁধন আলগা করে পায়ের দুপাশে মাথা হেলিয়ে-হেলিয়ে লুঙ্গির ঘের মাটি স্পর্শ করেছে দেখে নিশ্চিন্ত হল। আলনা থেকে বিলিতি তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়াল, আলনাটার পায়ের কাছে বসে জুতো চটিগুলি সোজা করে রাখল।

কাঁধ থেকে চুলের গোড়া, আঙুলের ডগা থেকে কনুই অবধি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরেশ যখন ঘরে ফিরে সরু ধাতব ফ্রেমের চশমা খাপে পুরে কালো ফ্রেমের পুরু কাঁচের বই পড়বার চশমা বার করে বসেছে টেবিলের সম্মুখে তখন ইন্দুর ফিরবার সময় হল।

ইন্দুর বর্ণনা করা বেশ একটু কঠিন। যতই গম্ভীর হয়ে বিচার করতে বসা যাক, বর্ণনা খানিকটা হাস্যকর হবেই। নস্য রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিটা আধো অন্ধকারেও দৃশ্য হচ্ছে। হাতে এক গোছা গোলাপ ফুল। তার গলার সাড়া পেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দু-তিনটে ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের তালায় চাবি পরাতে-পরাতে ইন্দু তাদের দেখে ফিরে ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দায় রেলিঙের কাছে দুটো থামের মাঝখানে যে কোণটুকু আছে তার কাছে ফিরে দাঁড়াল—ভাবখানা এই, এস হল্লা করি খানিকটা।

একটা ছেলে কাঁচ গলায় বললে, 'গোলাপের উঠনো বন্দোবস্ত আছে নাকি, ইন্দুদা?' আর একজন রসিকতা করবার চেষ্টা করে বললে, 'প্রেমের ব্যাপার নাকি, ইন্দুদা, শুনেছি তিনি বন্ধুপত্নী।'

ইন্দু খক্-খক্ করে হেসে উঠে বললে, তা প্রেম বই কি। দাদাকে অজস্র

মুঠি-মুঠি বিলোবার পরও বৌদির ভাঁড়ারে কিছু কিঞ্চিত থাকে, আমাকে ডুবিয়ে দিতে সেইটুকুই যথেষ্ট।'

দীপিতা স্বীকার করে ইন্দুর বর্ণনাটা আগাগোড়াই কল্পনা, হয়তো বা খানিকটা পক্ষপাতদুষ্ট। সে হয়তো নস্য রঙের সিল্কের ভক্ত নয়, কিন্তু ইন্দুর কথা মনে হলেই এ রকম দৃশ্যই তার মনে পড়ে। অনেক অজুহাতেই পরেশ মিত্তিরের ঘরখানা সে দেখেছে। সেটা কল্পনা নয়, ঘর গুছিয়ে রাখে পরেশ। কিছু বললে বলে, নিজের হাতে সাতদিনের জঞ্জাল এক রবিবারে সাফ করবার চাইতে জঞ্জাল জমতে না দেওয়াই ভালো। কিন্তু ইন্দু?

দীপিতা না দেখেও বলে দিতে পারে ইন্দুর ঘরের দুর্দশার কথা। সিগারেটের দগ্ধাবশেষ, টিনের খাবারের খালি আধার, ময়লা কাপড়-জামা, ধুলোয় ঢাকা টেবিল এ সবই থাকবে; যেন শরৎবাবুর কোনো নায়ক, কোনো নায়িকা এসে ঘর গুছিয়ে দেবে, গুছিয়ে দেবার মধ্যে ফুটে উঠবে—নিশ্চিন্তে আরাম এনে দেবার মতো স্ত্রী হতে পারি তোমার। মানুষকে চেনা গেলে তার সম্বন্ধের খুঁটি-নাটি বিষয়গুলি কল্পনা করা কঠিন নয়।

ইন্দুর কথায় পরেশের মনে হয়: মানুষের জীবন কেন বাহুল্য-বর্জিতের একটা তরঙ্গে গঠিত হয় না।

দুজনে এক সঙ্গে ঝরনা কলম কিনতে গিয়েছিল দোকানে; পরেশ কিনল ধূসর রঙের স্ট্রিমলাইন্ড্ একটা কিছু, আর ইন্দু নিল কলরব করে ওঠা ফিরোজ-রঙের দামী পার্কার সোনার খাপে মোড়া। এইখানেই রুচির তফাত, এই পার্থক্যই দুজনের সর্বত্র।

পরেশের বন্ধু হিসাবে ইন্দু চলতে পারে না। বহুদিন পরে, ম্যাট্রিক পাশ করবার পর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে এসে, দেখা; পরেশও খুশি হয়েছিল বৈকি; হাত জোড় করে স্মিত হাসিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল, 'ইন্দুবাবু! ভালোই হল, পুরোনো দিনের অনেক কথা বলা যাবে; প্রত্যুত্তরে ইন্দু 'আরে বাঁটলো যে রে,' বলে লাফিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল পরেশকে।

ইন্দুর সঙ্গে পরেশের বিচ্ছেদের যা কারণ সেটাকে এই রকম বলা যায়; রবিবারের—পাগল ইন্দু; প্রতি রবিবারে সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি কলকাতার পথে-পথে হৈহৈ করে হা-হা করে হেসে, কেবল সিগারেট ফুঁকে রেস্তোঁরাকাফেতে চা খেয়ে ঘুরে বেড়াবে। এই বোহেমিয়ানা যে এক শতাব্দীর পুরোনো হয়ে গেছে এ ইন্দু বোঝেও না, জানে না।

কিন্তু এ কথাগুলি ভাবলেও, কি শোভন প্রকাশ করেছিল তার পরেশ, এতটুকু ক্ষোভ নেই, এতটুকু বিচলন নেই, শান্ত মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ওর স্বাস্থ্য ভালো, ও পারে, পিছিয়ে পড়লুম আমি।'……এই সব দিয়ে ইন্দু গড়া, পরেশও।

মাঝে-মাঝে কিন্তু ইন্দুর রুচি মোহগ্রস্ত করতে পারে চারিপাশের লোককে। দীপিতার গত জন্মদিনে এরকমের একটা ব্যাপার ঘটেছিল ; অন্য অনেকের মতো ইন্দুও উপহার দিয়েছিল। সত্যিকারের কাজ যাতে আছে এমন একটি রুপোর রেকাবিতে একটা কালচে-লাল রঙের দগ্‌দগে গোলাপ। টাকার দেমাক না দেখিয়ে যতটা ব্যয় করা ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নিশ্চয় হয়েছিল রেকাবিখানা কিনতে, কিন্তু তার চাইতে প্রাধান্য পেয়েছিল ক্ষণস্থায়ী গোলাপটি। এমনকি দীপিতার গালেও ব্রীড়ার রঙ লেগেছিল।

তেমনি হয়তো ভালো লাগার উপাদান থাকে তার হঠাৎ বলা কোনো কথায়। পরেশ বলছিল, 'এখনও অর্ধেক কল্পনায় ঘিরে রাখতে চাই নারীকে। হর্ষে, দুঃখে, উদারতায়, হিংসায় সার্টের আড়ালের মানুষটির সঙ্গে বডিসের অন্তর্বর্তিনীর কোনো প্রভেদ নেই, এ বুঝব আমরা কবে? এখনও এই বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসেও বলব, তুমি হেঁটে গেলে পদ্ম ফুটে ওঠে। এসব কথা, ছেলে ভুলানো ছড়া আর কতদিন চলবে।'

দীপিতা বলতে যাচ্ছিল, 'ছেলে ভুলানো ছড়া যাদের জন্য সেই শিশুমন-গুলিতে এখনো আছে, এমনি সব লাল রঙ দেখে হাত-বাড়ানো শিশু।'

প্রথম দিকে ইন্দু চুপ করেছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'বিংশ শতকের কাঁচের বাক্সে রাখা জীবন আমাদের ; শো-কেসে রাখা প্রজাপতির ডানার পরাগের মতো খসে গেছে আমাদের কল্পনা ; অনেক গালভরা টানা-টানা লাতিন নাম সুস্পষ্ট পাইকায় লিখে দিয়েছি বাক্সের গায়ে গায়ে ; তবু পরাগ-উঠে-যাওয়া জীবন।' তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলেছিল।

মাঝে-মাঝে মনে হয় লোকটি কথা বলছে না যেন স্ফটিক নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তার পিছিয়ে থাকবার নজিরও বটে ; কথায় এই সুবিবেচিত প্রয়োগ, লক্ষ্যে পড়ে যাবার মতো প্যাঁচের প্রাচুর্য। বস্তুতঃ ইন্দু লক্ষ্যের মাঝখানে গিয়ে পড়বেই, তার সুগৌর প্রকাণ্ড দেহের মতো প্রাধান্য-কাঙাল যেন তার রুচি, ফলে গোলাপের মতন বর্ণচ্ছটায় ও আবেগের উত্তাপে ভরে ওঠে সে।

ইন্দু নিজেও জানে তার পদ্ধতিতে সেকেলেমি ছাড়া আর কিছু নেই, সেও ধীরে-ধীরে বিকাশের প্রভাব মেনে নিচ্ছে। বিকাশ দীপিতার দাদা, তার সংস্পর্শে এসে ইন্দুর বলবার ভাষার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, অনাড়ম্বর, প্রজ্ঞাদীপ্ত, উৎপ্রেক্ষাহীন হয়ে উঠবার লক্ষণ দিয়েছে ইতিমধ্যে।

এ বাড়ির কথা বলতে গেলে বিকাশের কথা বলতে হয়। খদ্দর পরেন না তিনি, সাধারণ বাঙালীর মতো দোকানের কাপড় কিনে পরেন। জেল তাঁকে বারংবার খাটতে হয়েছে গান্ধী-মহারাজের ডাকে। কোনোদিন কেউ মাথায় দেখেনি গান্ধীটুপি, খুব বিরক্ত করলে মধুর পরিহাস করে বলেন বাঙালীর ছেলে হঠাৎ নগ্নমাথায় খাপ উঠলে বেখাপ্পা দেখাবে। জেল থেকে বেরিয়ে

কেউ দেখেনি তাকে ফুলের মালা গলায় পরতে, জেলে ঢুকবার সময়ে কেউ শোনেনি বন্দেমাতরম বলতে বুক ভরে। দেশ আমার, আমার দেশকে আমার বলতে শ্লোকে গান গেয়ে উঠতে হবে কেন স্বর্গাদপী গরিয়সী বলে? আমার মা আমার ছেলে বলে কেউ কি কোনোদিন গান গেয়ে ওঠে।

এ বাড়ির আবহাওয়া বিকাশের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মতো স্বল্পবাক-বাহুল্যবর্জিত জীবনের তৈরী!

কোথা থেকে কি হল কলেজে, কি কেলেঙ্কারী ঘটে গেল। দরজার পাল্লায় হাত ছেঁচে রক্তারক্তি। দরজার পাল্লায় মানুষের দু-তিনটে আঙুল অমন বিভৎসভাবে জখম হতে পারে এ না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতটা বাড়াবাড়ি যেন ইন্দুর ক্ষেত্রে ছাড়া ঘটতও না। সোস্যালিস্ট এক নেতার সম্বর্ধনার ব্যাপারকে উপলক্ষ করে ঘটল ব্যাপারটা। দীপিতা ও পরেশ, ঝগড়া করতে নয়, ইন্দু ও তার পেছনে কয়েকটি ছেলের একটি দল তৈরী হচ্ছিল তাদের বোঝাতে গিয়েছিল; কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেল। কেউ-কেউ বলে পরেশ ইচ্ছা করে দরজাটা চেপে দিয়েছিল, কেউ বলে ইচ্ছা করে দিলেও ইন্দুকে জখম করবার জন্য নয় দিয়েছিল নিজের বিরক্তির নাটকীয় প্রতীক সৃষ্টি করতে। কিন্তু আর্ত চিৎকার করে হাত চেপে ধরে ইন্দু যখন বসে পড়ল এত সব ভাববার অবকাশ কারো ছিল না। দীপিতা স্তব্ধ হয়ে দেখল, ছ-ফিট উঁচু পুরুষটির দেহটা একেবারে তার পায়ের কাছে নুয়ে পড়েছে; বেদনায় এমন হাহাকার করতে কাউকে সে শোনেনি, দেখেনি এমন করে পুরুষকে কান্না চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে। এম্বুলেন্স, প্রফেসাররা, ছাত্ররা যখন এল তখন দীপিতা ইন্দুর অনতিদূরে চৌকাঠে মাথা রেখে বসে আছে, তার চোখ বন্ধ, হাত মুঠো করা, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, ইন্দুর রক্ত গড়িয়ে এসে তার শাড়ির খানিকটা ভিজে গেছে।

সম্ভবত রক্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম বলেই কথাটা তার মনে দাগ কেটেছিল। পরেশ মিত্তির সম্বন্ধে কেউ-কেউ সন্দেহ আরোপ করেছিল। সহসা একটা আবেগের মতো বোধ হতে প্যাড্ টেনে নিয়ে দীপিতা খস-খস করে একদিন লিখল: পরেশবাবু, আজকের ব্যাপারের জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত; সুরেন্দ্র তোমার ইকর্নমিক্সের নোট চুরি করে পড়েছে এই অজুহাতে কলেজে যে রোল উঠেছিল তার পেছনে তুমি ছিলে এরকম সন্দেহ হচ্ছে আমার।

এই পর্যন্ত লিখে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল সে, ডাকে দেয়া যেত, চাকরের হাতেও পৌঁছে দেয়া যেত, বাধা সেটা নয়; চিঠি লিখবার কোনো যুক্তিই নেই, বরং ভাবাতিশয্য প্রকাশ পাবে; নাটকের মতো হবে ব্যাপারটা।

রাত্রিতে সে খেল না, ইন্দুর রক্তাক্ত হাতের কথা মনে হতে গা ঘেঁটে উঠতে লাগল। পরের দিন কলেজে যেতে কুণ্ঠা হচ্ছিল তার, কিন্তু না গেলে বাড়বে

হৈ-চৈ, গেল সে, পরেশও এল ; অন্যান্য দশদিনের মতো স্বাভাবিক হয়ে চলল তারা। তিনদিনের মাথায় ব্যাপারটা থিতিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে দীপিতা চিঠি পেল, ভেবেছিল পরিচিত কারো, তলায় নাম দেখে অবাক হল। ইন্দু চিঠি লিখেছে ! লিখেছে : শ-দেড়েক টাকার আজই প্রয়োজন ; হাতের অবস্থা ভালো নয়। হাসপাতালের ব্যবস্থায় কেটে বাদ দিতে হবে দুটি আঙুল। আমার অত সুন্দর আঙুলগুলি হারাতে চাই না, বাইরে বড় কাউকে দেখাব। টাকাটা আজই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ইন্দু চিঠি লিখেছে, তাকে লিখেছে, লিখে টাকা চেয়েছে ! পোস্টকার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখে তার শুধু মনে হল হিং টিং ছট। উপন্যাসের নায়িকা যেন সে, জোর করে মন কেড়ে নেবার পার্ট যেন তার সম্মুখে। দেড়শোটা টাকা এমন কিছু নয়, এর আগে চাঁদা হিসাবে সে দিয়েছে, বড় জোর মা একটু হুঁসিয়ার করে দেবেন, কিন্তু ইন্দুর টাকা চাইবার কি যুক্তি এত লোকের মধ্যে বেছে-বেছে তার কাছে। টাকা পাঠাবার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হতে লাগল উপন্যাসের পূর্বরাগের কথা।

রাত্রিতে শুতে গিয়ে একলা অন্ধকারে তার মনে হল চিঠিটার কথা, হাসিও পেল। কিন্তু চিন্তাগুলিকে যখন ঘুমের গহ্বর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে দীপিতার মনে হয়েছিল ঃ নন্তুটা (তার ছোট ভাই) এমন করে মাঝে-মাঝে পয়সা চায় বটে, কিন্তু ক্লাস সিক্সের ছেলে নন্তু আর ইন্দু একই অর্থে পুরুষ নয়।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে বিকালে, অধ্যাপক দু-তিনদিন আসেননি, তাঁর অসুখ করেছে কিনা এ খোঁজ করতে গিয়ে দীপিতা আটকে পড়ল অধ্যাপক যখন বললেন ঃ গাড়ী রাখো, শম্ভু পণ্ডিতের হাসপাতালে ইন্দুকে দেখে যাব তোমাদের বাড়িতে, চা খাওয়া হয়নি, তোমাদের ওখানেই খাব।

এর পরে অজুহাত দেখানো চলে, না-যাওয়া চলে না। বাড়াবাড়ি হয়, জেদের মতো একটা কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ইন্দু বিছানায় উঠে বসেছিল। ক্লান্ত নিষ্প্রভ দৃষ্টি, গভীর শোক ছাড়া এমন চেহারা হয় না কারো। অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত তুলে দেখাল ইন্দু, ব্যাণ্ডেজের ফের দেখেই বোঝা গেল কঠিন সত্যটুকু, দুটি আঙুলই কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অধ্যাপক ধীরতা সম্বন্ধে কি একটা উপদেশ দিতে ইন্দু টেনে-টেনে হেসে উঠেছিল, কিন্তু দীপিতার দিকে চোখ পড়তেই ওর হাসি থেমে গেল ; গভীর অভিমানে মুখের চেহারা যেমন হয় তেমনি হল, চোখেও জল এল।

একদিন মুখ নিচু করে বই গোছাতে-গোছাতে দীপিতা শুনছিল ইন্দুর অসুখের কথা অধ্যাপকের মুখে। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, বেচারার

আঙুলগুলির জন্য দুঃখ হয়। বাইরের কাউকে দেখাতে চেয়েছিল শুধু কিন্তু টাকার জন্যই হল না।

'আপনি দিলেন না কেন', দীপিতা বলেছিল, চিঠির কথা মনে পড়েছিল তার।

'দিয়েছি, কিন্তু বাইরের ডাক্তার এসে বললেন, অপকারটুকু হয়ে গেছে।' অতঃপর অধ্যাপক বললেন, 'কে একজন ওর আছে, তার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, বলেছে তিনি টাকা পাঠালে আমার ধার শোধ করে দেবে। আমি ভেবেই পেলুম না কলকাতায় থেকে এত বড় বিপদের কথা শুনেও টাকা পাঠাতে দেরি করলেন কেন তিনি। অমন বন্ধু থেকে লাভ কি? ধার হিসাবেও তো টাকাটা দেয়া যায়।'

দীপিতা সোজাসুজি একটু তীক্ষ্ম করে অধ্যাপকের দিকে চাইল, সন্দেহ হয়েছে তিনি চিঠির কথা জানেন, বিঁধবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা নয়। অধ্যাপককে এমন একটি বৃত্তি আরোপ করার জন্যই দীপিতা কুণ্ঠাবোধ করল।

অধ্যাপক চলে গেলে দীপিতা ভাবল—পাঠালেও হত টাকাটা, ইন্দুকে যা ভেবেছিল তা হয়তো নয় সে! টাকার প্রয়োজনে লিখেছিল, দীপিতাদের দেবার ক্ষমতা আছে জেনে। হৃদয়ের অনুসন্ধান সে করেনি উপন্যাসের নায়কের মতো। টাকাটা দিতে হবে, অধ্যাপকের ধার যখন ইন্দু শোধ করতে চায় তখন টাকার প্রয়োজন ফুরায়নি, ইন্দুকে অঋণী করতে আগ্রহ হল তার।

পরদিন টাকাটা পাঠাতে গিয়ে আগ্রহটা তাকে সঙ্কুচিত করেছিল, ইন্দু যদি তার আগ্রহে কোনো গভীরতর বৃত্তি আরোপ করে বসে। কিন্তু একটা ভালো লাগার বোধও ছিল এ কুণ্ঠার মধ্যে। মনি-অর্ডারের কুপনে সে লিখল, পাঠাতে দেরি হল বলে আমি দুঃখিত।

তার লিখতে ইচ্ছা হল: আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ, এত অল্পদিনের পরিচয়, যাকে পরিচয়ই বলা যায় না, তাতেই আপনি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন, আপনার আত্মপ্রত্যয়ের মূল অনুসন্ধান করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু দীপিতার মতো মেয়ে এ কথা কাউকে লিখতে পারে না বরং ভালো লাগার বোধটাকে আড়াল করবার জন্য কুপনে লিখল—যখন সম্ভব হয় শোধ করে দেবেন।

টাকাটা পাঠিয়ে রাত্রির অন্ধকার অপূর্ব বোধ হতে লাগল। ইন্দু কি তাকে ভালোবাসে?

দীপিতা বালিশে মুখ গুঁজে হেসে ফেলেছিল। কিন্তু একজন পুরুষ তাকে ভালোবাসে এ বোধটা হাস্যকর হলেও, পুরাতন হলেও প্রত্যেকটি মেয়ে প্রথম যখন অনুভব করে তখন বোধ হয় কৌতুক ও কৌতূহলে উন্মনা হয়ে উঠে—ভাবল দীপিতা।

পরের দিন সকালে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটায় নিজেকে খুবই বোকা

বললে দীপিতা। ইন্দুকে অঋণী করবার জন্য টাকাটাও পাঠাতে হবে এতটা আগ্রহ হওয়া উচিত ছিল না। দু-পাঁচদিন ডাকের দেরি হলেও ইন্দুর বাড়ি থেকেই নিশ্চয় এসেছিল টাকাটা।

কিন্তু খুব খারাপ লাগছে না, কুণ্ঠার মধ্যে ভালো লাগার বোধ একটা থাকেই, বিশেষ করে আজকের রাত্রিটায় যেন ভালো লাগছে চিন্তা করতে।

একদিন সশরীরে ইন্দু এসেছিল দীপিতাদের বাড়িতে, অন্য অনেকবারের মতো দীপিতা অবাক হয়ে শুনছিল ইন্দুর রঙদারী ভাষা।

কিন্তু বিকাল চলে গেলে, দীপিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল ইন্দু। 'ব্যথা নেই আর', দীপিতা বলেছিল।

অস্ফুট একটি—'না'।

একটু পরে আবার দীপিতা বললে, 'হোস্টেলে না ফিরলে যদি চলে—খুব বৃষ্টি হচ্ছে না?'

ইন্দু বললে, 'হোস্টেলে না ফিরলে চলে।'

আসলে ব্যাপারটা এই, পরে একদিন, ভাবল, দীপিতা,—রোজকার ঘটনার বাহিরে যা সেটাই রোমান্স, আর সব ব্যাপারটার মূলে আছে ইন্দুর রোমান্স-প্রিয়তা। টাকা ধার করার ব্যাপারটা হয় কুশীদজীবীর সঙ্গে বা কুশীদজীবীর বিলেতি প্রতিরূপ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কারের কাছে থেকে। আমাদের দেশের মেয়েদের অর্থ সম্বন্ধে কোনো স্বাধীনতা নেই, দিতে হলে কাউকে কিছু তাদের অভিভাবকস্থানীয় পুরুষরা দেন। ঠিক এ জন্যই হঠাৎ কোনো মেয়ের যদি অর্থনীতিগত স্বাধীনতা থাকে তার আবহাওয়া অনেক পুরুষের কাছে রোমান্টিক বোধ হয়। এমনকি অনেক মেয়েরও হয়, যেমন হয়েছিল স্বাগতার। স্বাগতা বুদ্ধিশানিতা মেয়ে, কলেজে সে রোমান্স কল্পনা করতে পারত না। কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে অধ্যাপিকা হিসাবে অর্থ উপার্জন করে সে রোমান্টিক হয়ে উঠল। তার চাইতে বয়েসে ছোট (লোকে বলে) একটি রোগা ফ্যাকাসে খদ্দর-পরা ছেলেকে এখন তখন অর্থসাহায্য করতে-করতে এক সময়ে সে তার মোহে কলেজ ছাড়লে, গ্রামে চলে গেল ছোট একটি রোমান্টিক কুটির গড়বার লোভে।

বিশ বছর আগে কলেজে পড়ার ব্যাপারটাই এমন রোমান্সের উপাদান হত, মেয়েরা কলেজে পড়ছে এই নতুনত্ব। নতুন শাড়ি পরলে পুরোনো বউকে যেমন ভালো লাগে, তেমনি স্ত্রীজাতি-বিমুখ অনেক কলেজের ছাত্রের চোখে এই নতুন রূপটি, বুকের কাছে বই কুড়িয়ে নিয়ে, ছাতা হাতে করে চলা মেয়েদের, ভালো লেগে উঠল। সাহিত্যিকদের উপরেও এসব পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে।

দীপিতা সকালের ডাকে আসা কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা খুলে বসল। কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল

তার। মনে হল ঘুম পেলে ছেলে ছাত্ররা নস্যি নেয়। হাই তুলে সে ভাবল একদিন নিয়ে দেখলে হয় ঘুম যায় কিনা. কিন্তু বড্ড নোংরা।

তা হলেও, ভাবলে দীপিতা—একদিন যদি দেখা যায় মেয়েরা নস্যি নিতে আরম্ভ করেছে, হয়তো সেটাই রোমান্সের উপকরণ হয়ে উঠবে।

এটা হাস্যকর কথা হলেও এর চাইতে বড়-বড় ঘটনার মূলেও এ অভিনয়ের নেশা দেখা যায় বৈকি। বস্তুত আজই দেখেছে সে. বিকাশের ঘরের পাশ দিয়ে আসতে-আসতে গানের মৃদুশব্দে অর্ধোন্মুক্ত দরজা দিয়ে চোখ পড়েছিল ঘরের মধ্যে. ভামিনী বৌদিকে দেখা গিয়েছিল প্রসাধন করতে। একটু অবাক লেগেছিল বৈকি দীপিতার। সবজে সাটিনের পায়জামা পরা, পিঠের চওড়া চ্যাপ্টা বেনী এসে পড়েছে নিতম্বে। আর্দ্র দৃষ্টি বেষ্টন করে যেন কাজলের রেখাও ছিল।

দু গাছি সরু সোনার চুড়িতে. একগাছা সরু সোনার হারে, লাল পাড় সাদা শাড়িতে দেখা ভামিনী বৌদির সঙ্গে মেলে না। তার দাদা বিকাশ স্কুলের হেডমাস্টার, কিন্তু তাই বলে অর্ধ-সন্ন্যাসের আদর্শে খাড়া হবেন ছাত্রদের সম্মুখে এ মত নয় দীপিতার। রাত্রির প্রভাব, আদিম সূর্যোদয়ের চাইতেও প্রাচীন তমিস্রার রক্তে সঞ্চারিত স্মৃতি।

একবার একটা কবিতার কথা মনে হয়েছিল তার ;—পুরুষ বলছে নারীকে, ‘এইটুকু আমার কামনা, শুধু এইটুকু,—তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মন যখন করুণায় টলমল করে উঠেছে, সেই কারুণ্যের কাঁপন লাগুক তোমার মর্মমূলে. পরম সহ-অনুভবের প্রতিতরঙ্গ।’ মিথ্যা নয় কবির আশা, আরও দু-এক শতক পরে হয়তো মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু তা না হলেও ক্ষতি নেই। ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান দীপিতার পাথেয়। যদিও সে এখনও ইংরেজি ‘লাভ্’ কথাটাকে অপ্রচুর মনে করে মানুষের পারস্পরিক সবগুলি আকর্ষণ নির্দেশের পক্ষে, এবং যদিও সে স্নেহ ও শ্রদ্ধা কথা দুটিকে ইংরেজিতে চালানোর চেষ্টা করছে তাদের আদিম বাঙালী অর্থে, সে সব সময়েই স্বীকার করে ভারতবর্ষের লোক আমরা শত চেষ্টা করলেও দাম্পত্য ভালোবাসাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত করতে পারব না, বাৎস্যায়নের এক্তিয়ারের বাইরে এনে।

কাল ভোর হতে না হতে দীপিতা প্রাত্যহিক ভোরাই চায়ের আসরে যোগ দিতে বিকাশের ঘরে যাবে। বাইরে চড়ুই পাখিটা সরু ঠোঁট দিয়ে ঠুকছে ঠুক-ঠুক করে কাঁচের শার্সি, কার্নিশের টবে একটি নিশিগন্ধার কলি আগামী রাত্রির তপস্যায় সংহত ও ঋজু হয়ে উঠবে। মিতভাষিণী ভামিনী-বৌদির মৃদু পরিহাসে ভোরের হাওয়ার মতো অনির্দেশ্য সুখের আমেজ আনবে।

কিন্তু কাল সকালে যদি মনে পড়ে যায় রাত্রির এই বেলোয়াড়ি আড়ম্বর, এই রঙ ও রেখার সপ্রচুরতা ? ইন্দুর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই যেন ঘটে গেছে।

যেন সে প্রভাবিত করছে। মিলিয়ে নেয়া কষ্টকর, আট পহরে দুপুরের বিশদ বস্ত্রের বিকাশের কথা ছেড়ে দিলেও, ভোরাই চায়ের আসরের অম্লান অবিন্যস্ত কেশ বিকাশের সঙ্গেও মেলে না। দীপিতার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ বিকাশ কি সহ্য করতে পারে ভামিনী-বৌদির এই ভাবালুতা, রাত্রির রোমান্স গড়বার প্রয়াস। হয়তো করে, অপ্রিয় হবার জন্য কেউ প্রয়াস করে না, প্রসাধন করে না।

ইলেকট্রিকের বাল্বে মধ্যরাত্রির শব্দ হয় না। টেবিলের সম্মুখে বসে থাকতে থাকতে দীপিতার মনে হল সে যেন বাল্বের অভ্যন্তরে কম্পমান শিখা দেখতে পাচ্ছে। অনেকদিন পূর্বের এক বিয়ে-বাড়িতে চোখ জ্বালা করা মধ্যরাত্রিতে শোনা গ্যাসের সাঁ-সাঁ শব্দটার কথা মনে পড়ে গেল তার। সেই আলোটার চারিদিকে অসংখ্য সবুজরঙের পোকা গিজগিজ করছিল। দীপিতা এবার লক্ষ্য করলে ঘেরাটোপের গায়ে কতগুলি বাদলা পোকা লেগে আছে স্ট্যাণ্ডের পক্ষাকৃতি গোড়াটাতেও। আঙুল দিয়ে গোড়াটা সাফ করতে গিয়ে সে আশা করেছিল আলোর গা চোয়ানো খানিকটা ময়লা আর্দ্রতা লাগবে আঙুলে, কিন্তু তাদের শুষ্কতা মনকে আকৃষ্ট করবার মতো।

আকাশের প্রান্তে মেঘ আছে। অজস্র কালো চুলের সীমার মধ্যে চকচকে অবিশ্বাস্য টাকের মতো আকাশে গুটি কয়েক তারাও চকচক করছে। দূরের মেঘগুলির গতি দেখে সেগুলিকে কালো বর্ণের ফুটন্ত দ্রব্য বলে মনে হচ্ছে যা কিছু বাতাস মেঘের বীচিভঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে, বাধা পাচ্ছে, মেঘমুক্ত আকাশের অংশটুকু যেন আতপ্ত সৈকত মেঘের ঢেউগুলির স্নিগ্ধতা বহন করে যে বাতাসটুকু আসছে সেটুকু আতপ্ত তটভূমির স্পর্শে তপ্ত হয়ে উঠছে। রুক্ষতার একটা অনুভূতি অন্যান্য বোধগুলির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, পরিবর্তিত করেছে সেগুলিকে দুটি শ্রাবণের ঘণ্টার মধ্যে একখণ্ড ফাল্গুনের সময় এসে পড়েছে যেন।

গর্হিত অন্যায় কিছু নয়, অবাক করবার মতো, ধাক্কা দিয়ে জাগ্রত করে দেবার মতো বিষয়, ভাবলে দীপিতা। হয়তো কৌতুকের জন্যই এই বেশভূষা তবু এক-একটি ব্যাপার এমন সন্দিহান করে তোলে মনকে।

মনে প্রাণে কি আমরা উপাচার প্রয়াসী? আমাদের রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টির গভীরে, র‍্যাশন্যাল জীবনপদ্ধতির আড়ালে ইন্দুর মতো একজন লুকিয়ে আছে। সেইজন্যই কি দিনমানের উচ্ছ্বাসবৃত্তি রাত্রির অবসরে এমন প্রগলভ হয়ে ওঠে। এতটুকু ফিকে হতে দেবে না, উপাচার বাহুল্যে আস্বাদনকে পীড়িত না করে ছাড়বে না? কীটসভক্ত ইন্দুর মতো।

এত স্বাভাবিক ছিল এসব ব্যাপার যে কেউ বিচার করার কথা চিন্তা করেনি, আজ বিচার করতে হচ্ছে ঃ মালা গেঁথেছিল, ভামিনী-বৌ শাদা বেল ফুলের মালা, বিকাশের গলায় পরিয়ে দেননি ভামিনী বৌদি, লজ্জার বাধা নয় দীপিতা গেঁথেছিল, সেও পারত। বিকাশ ফিরে এসে মালা দেখে খুশি

হয়েছিল, পরে নয়। এটা খুব বড় কথা নয়, জীবনদর্শনও নয়, তবু যেন রুচি ও চিন্তাধারার প্রতীক।

দীপিতা প্রশ্ন করল, অভ্যাসের ফলেই কি এমন হয়েছিল, নতুবা ভামিনীর কি সাধ ছিল বেলফুলের মালাটা প্রিয়জনের গলায় তুলে দিয়ে প্রতীক্ষায় উর্ধ্ব-মুখী হয়ে দাঁড়াতে, পারেনি অভ্যস্ত নয় বলে।

দীপিতা জানালার কাছে উঠে গিয়ে গরাদে দেহভার রেখে দাঁড়াল। অভ্যাসের ফলে হয়েছে, ভাবতে একটু কষ্ট হল, কারণ অভ্যাসের ফল মানে অনেকদিন অভিনয় করার ফল।

বিকাশের ছেলেটি, যে শুধু ভালোবাসা কেড়ে নেবার জন্য আঙুল বাড়াতে শিখেছিল, একদিন অব্যক্ত ব্যথায় মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে নীল হয়ে কেঁদে উঠে বিদায় নিয়েছিল। সেদিন দীপিতা হাহাকার করে কেঁদে উঠতে গিয়ে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কিত হয়েছিল শোককে ছাপিয়ে উঠেছিল মানুষের মননশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা। বিকাশ ম্লান হেসে বলেছিল, 'ওকে ফুল দিয়ে সাজাবি, বরং মসলিনের নিষ্পাপ কিছু একটা পরিয়ে দে।' ভামিনী শিশু-মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা বা অশ্রুর ধারা মুছে রোজকার মতো সাজিয়ে দিলেন।

শুধু কি অভ্যস্ততা, এত বড় বেদনার মুহূর্তেও কি অভ্যাস বড় হয়ে ওঠে? দীপিতার সন্দেহ হল, সব আলো নিভিয়ে দিয়ে এল সন্দেহ, বোধহয় অনুভব ছিল না, হাহাকার করে কেঁদে উঠবার মতো প্রাণের সাড়া।

কিন্তু দীপিতা হাসল, হেসে বলতে পারল নিজেকে, দীপিতা তুমি একটি উনিশ বছরের মেয়ে মাত্র। এখনও সুস্থ সবল চিন্তাধারা তোমার নিজস্বত্বের কাঠিন্য অর্জন করতে পারেনি, অন্যান্য কারো চিন্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখন হাতে মুখে জল দিয়ে বিছানায় যাও। কপালের রগ দুটিকে মাসাজ করে দিও ঘুমিয়ে পড়বে। কাল সকালে যখন সকালের খটখটে রোদে উঠে দাঁড়াবে তখন এপস্টাইনের মর্মরের মতো বাহুল্যবর্জিতের পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পাবে তুমি।

তবু ভাবল দীপিতা ঃ এখন মনে পড়ে না ঘুমাবার আগে অর্গল খোলা ছিল কিম্বা ঘুমের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে চেয়ে তার মনে হয়েছিল ওপারে ইন্দু হয়তো হাত-দুখানা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে তার মতো, দরজার অর্গল খুলে দিয়েছিল সে।

বর্ষণক্ষান্ত আকাশের দিকে চেয়ে দীপিতা দাঁড়িয়েছিল, তখন ইন্দু এল ঘরে, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরের দৃশ্যের অংশ নিয়ে।

ইন্দু বলেছিল, 'আপনার পড়বার ঘরে ব্রাউনিং খুঁজে পেলাম না।'

ব্রাউনিং খুঁজে দিয়ে ফিরে আসবার অনুভূতি এখনও লেগে আছে গায়ে, কিন্তু আরও অদ্ভুত বোধ হয় ভাবতে গেলে। ইন্দু শুধু বলেছিল—'শুনুন', দীপিতা ঘরের প্রায় আধখানা হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুর পাশে।

ইন্দু বলেছিল, 'তোমার চুলগুলি খুলে দাও বাইরের ঐ অন্ধকারকে আরও স্নিগ্ধ করে, কথা বল না। প্রজাপতি-ডানার নিচের অন্ধকারের মতো কোমল নিরবতায় ডুবে যাও; কথা বল না, পাতার আড়ালে একটি ডানার ছায়ায় আর এক জোড়া ডানা স্বপন দেখছে চ্যুতমঞ্জরীর।'

ইন্দু কথা না বললে কি হত কে জানে, ইন্দুর কথায় দীপিতার সম্মোহন টুটে গিয়েছিল, হেসে সে বলেছিল, 'পিলিয়াস মেলিসাণ্ডার কথা বলছেন? মেটারলিংক তাহলে ভালো লাগে আপনার?'

না আঘাত দেয়নি দীপিতা। অধ্যাপকের উপস্থিতিতে সাহিত্য আলোচনা করবার মতো লঘু হাসি ছিল তার ঠোঁটে।

টিনের ঘরে ফিরে এসে মনে হয়েছিল, সিনক্রিয়েট করা হল যেন। যেন প্রেমনিবেদনভীতা ত্রস্তা কিশোরীর পলায়ন।

অতঃপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে স্বচ্ছ গলায় বলেছিল, 'ও ইন্দুবাবু আসুন, ঘুম হচ্ছে না, হয়ও না এ অবস্থায়, পোকার খেলি বরং।'

দীপিতার সলিলকি করা অভ্যাস নয়, তবু মনে হল আবার: তুমি কি চেষ্টা করে আজ ঘুমাতে পার না। ইতিমধ্যে তুমি যা নয় তা চিন্তা করতে শুরু করেছ, আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকলে নেশা মাথায় উঠবার মতো অবস্থা হবে তোমার। কাল সকালে থাকবে তা নয়, ঘুম ভালো না হলে কাল সারাদিনই মস্তিষ্ক ভালো কাজ করবে না। নেশার পরে ভোঁতা বিস্বাদ জিহ্বার মতো হয়ে থাকবে মন। কাজেই বুঝলে, কাজেই উনিশ বছরের মেয়েটির মতো বিছানায় তালগোল পাকিয়ে রৌদ্রতৃপ্ত পুষির মতো ঘুমিয়ে পড়গে।

তথাপি প্রায় কেঁদে ফেলার মতো মুখ নিয়ে চেয়ারে ফিরে এল দীপিতা ইন্দুর সেই মেটারলিংক প্রভাবিত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দুর ঘর তারই নিজেরই পড়বার ঘর, সেইদিন রাত্রির জন্য ইন্দুর ঘর হয়েছিল, ব্রাউনিং খুঁজে দিতে সবার মতো পুরুষের স্পর্শ-উদ্বেল অন্ধকার আজও ঘরে:

মনে হল: যে আগ্রহে ইন্দু কবি হয়ে ওঠে সেটা কি ভাব?

ইন্দুর উপপাদ্য একটা বিষয় মনে পড়ল—বিংশ শতকে এসে দেখছি আমরা রুক্ষ হয়ে উঠেছি, যে কূপ থেকে উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রাণরস, শুকিয়ে গেছে সেটা। বিশ্বাস নেই কিছুতে। থাকলেও স্বীকার করি না কারণ বিশ্বাস জিনিসটা মধ্যযুগের ব্যাপার, সেইজন্যই তাকে বর্জন করেছি।

খুব অন্যায় করেছি? মধ্যযুগের পোশাকটা বর্জন করবার সময়ে ন্যায় ও অন্যায়ের কোনো প্রশ্ন যেমন ওঠে না, এটার বেলাতে হলে ক্ষতি কি?

ইন্দু এরকম পরিস্থিতিতে ঠোঁট দুটি আলগা করে রাখে, বোকামির চিহ্ন নয়, কথা বলবার, তর্কের কোণ চেপে ধরবার আগ্রহাতিশয্যে, সে টপ করে বলে বসল, 'দেখুন, এই সাহিত্যিক অমিয়বাবুর কথাই ধরুন, আপনার প্রিয়জন-স্থানীয় অমিয়বাবুর, যখন ভাবের প্রসারতায় সহানুভূতিতে তাঁর চোখ

দুটি করুণায় ভরে উঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে, কলমকে অব্যাহত ছেড়ে দিলে যখন গ্রীক্ ক্লাসিকের স্বল্প পরিমিত গভীর বেদনার দু-চারটে কথা লিখে ফেলবেন মনে হচ্ছে ঠিক তখনই টপিকাল কোনো কথা উত্থাপন করে বাজে কথার অবতারণা করে নিজের ভাবাবেগকে ব্যঙ্গ করে নিজের লেখাটাকে থার্ডক্লাশ করে তুলবেন। এটা হচ্ছে একটা পোজ, যুগের ভঙ্গি। ডেমোক্রাসির রিঅ্যাকশন।'

বক্তৃতা দেবার সময়ে ইন্দুর মাংসল চোয়াল দুটি স্থূলভাবে নড়ে-চড়ে ওঠে।

দীপিতা জ্বালাময় চোখের সম্মুখে ভার্জিনিয়া উল্‌ফই খুলে বসল। হাতের কাছে পেয়ে এমন স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের কথা কে বলেছে, কোথায় এমন বর্তমানের আলোক সম্পাত ?

কিন্তু চোখে পড়ে গেল—না, না, আমরা পারছি না, প্রাচীনদের মতো কোনো মহৎ সৃষ্টি। সেই সুর, পরাজয়ের অবিশ্বাসের আজকের রাত্রির সুর। মনে হল ঃ বিশ্বাস ত্যাগ করাটা উচিত হয়নি। বিশ্বাস জিনিসটা অবিভাজ্য, প্রাচীনের প্রতি সব বিশ্বাস ত্যাগ করতে গিয়ে বর্তমানে বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব নয়।

মনে হল আশ্রয় চাই কিছু। সহসা সিগারেটের অনাস্বাদিতপূর্ব ধোঁয়ার অদম্য পিপাসা বোধ করল সে। ছেলেমানুষি করে কেনা ডাকপিওনের মতো চামড়ার কাঁধব্যাগ হাঁটকে বেরোল কয়েকদিন পূর্বে ব্রাভাডো দেখানোর জন্য সীতার কেনা বিবর্ণ এক প্যাকেট সিগারেট, যেটা দীপিতা শাসনের ভঙ্গিতে কেড়ে নিয়েছিল।

মুখে একটা তোবড়ান সিগারেট গুঁজে পুরুষের ভঙ্গিতে টেবিলের উপরে পা তুলে বসল। নেই-নেই কিছু নেই, মহৎ কোনো সম্পদ প্রাণরসের কোনো চিহ্ন, এমনি হাহাকারে শেষ হয়েছিল ভার্জিনিয়া উল্‌ফের জীবন এ কথাটাও মনে পড়ে গেল।

চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে দীপিতা, মুখে তোবড়ান সিগারেট ঝুলে আছে। হঠাৎ ঘুম এল দুর্নিবার মোহের মতো বাইরের আকাশে গুরু-গুরু শব্দে বর্ষণ নামামাত্র। বাঁদিকের বুকটায় গরাদের চাপে ব্যথা হয়ে আছে, ঘুমের ঘোরে একখানা হাত সে ব্যথাটাকে স্পর্শ করে রইল।

প্রমীলার বিয়ে

প্রমীলার বিয়ে হয়েছে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে, সেদিন বৈশাখী নির্মেঘ আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিল।

প্রমীলা ধনীর মেয়ে, কলেজে পড়েছে; গায়ের রঙ দুধে-আলতা নয়, নাক বা চোখ নয় বলবার মতো বিশিষ্ট কিছু, তবু তাকে অরূপা বললে মিথ্যা বলা হয়। এ সত্ত্বেও তার বন্ধুদের চোখে বিয়েটা নেহাত ডাল-ভাতের মতো হয়েছে। দু-পক্ষ থেকে আলাপ-আলোচনা হয়েছে অন্তত দু-পাঁচ মাস, তবে সে আলাপের মধ্যে প্রমীলা কিম্বা তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গো-বেচারা ভদ্রলোকটির কোনো অংশ ছিল না।

কয়েকদিন আগে এক রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারেনি, সেদিন ফুলের বাসর ছিল। সব মেয়ের মতো তার স্নায়ুগুলি উঁচু পর্দায় চড়ানো সেতারের মতো ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়েছিল। তার উপরে ছিল ফুলের গন্ধ আর বৈশাখী গরম। মাখন নামে এ-বাড়ির যে ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে নিমন্ত্রিতরা বিদায় নিলে অনেক রাত্রিতে সে ঘরের দরজায় এসে প্রমীলাকে দেখে থেমে দাঁড়াল। এতক্ষণ এই উৎসব-আয়োজনের অন্যতম যোগানদার হিসাবে তার অংশ মতো সে কাজ করে যাচ্ছিল, এবার সে ব্যাপারটির নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারল বোধহয়। এতক্ষণ সে চিন্তা করেনি, বস্তুত ও জিনিসটা তার চিরদিনই কম। এ বাড়ির অলিখিত প্রথা অনুসারে যে কোনো কাজে যেমন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস থাকে এ ব্যাপারটিতে তার টোপর পরে বসাকেও তেমনি সহজ করে সে নিয়েছিল। ঘরের দরজায় এসে সজ্জিত পালঙ্ক ও লজ্জিতা বধূকে দেখে লজ্জায় সে বোকা বনে গেল।

যেন কিছু দরকার এটা অনুভব করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই বউদি, শোনো, শোনো, তোয়ালেটা কোথায়? হাত পুঁছতে হবে।'

উঠানের ছত্রাকারে ছড়ানো এঁটো পাতার পাশ দিয়ে, বারান্দায় ঝুলানো লাল হয়ে আসা ডে-লাইটের তলা ঘেঁষে হলুদ-মশলা-মাখা শাড়ি-পরা মেয়েটি দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল রান্নাঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে।

মাখন পুনরপি বললে, 'ও বউদি, শোনো, শোনো, এক গ্লাস জল।' প্রত্যুত্তরে ঝনাৎ করে কোণের ঘরটির দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং বন্ধ দরজার পিছন থেকে খিল্-খিল্ করে অজস্র হাসি উপচে পড়ল।

উৎসবের রাত্রিতে এত তাড়াতাড়ি (মাখন নতুন পাওয়া-ঘড়িতে দেখলে রাত একটা বাজে) এমন আরামপ্রদ নিস্তব্ধতা আনতে তার পিছনে পরিকল্পনা থাকা দরকার ; এ রকম একটা বোধ হল মাখনের—ষড়যন্ত্রটা বউদির। কিছু করবার ছিল না। আত্মীয়-স্বজনে ঠাসা ঘরগুলির সব কটির দরজা বন্ধ। রান্নাঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। উঠানের মাটির গ্লাসগুলি মেজে তো জল খওয়া যায় না যেন সেই জন্যেই মাখন কলতলার দিকে রওনা দিল।

মাখন যখন ফিরে এল তখন তার সারা গা ভিজে, চুল দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরছে। ঘরে এসে আবার সে ফিরে যাচ্ছিল, 'ঐ যা, জল খেয়ে এলাম না।'

তখন প্রমীলা উঠল। অন্য কেউ এবং আর কোনো সময় হলে সে বলত, কি বোকা, কি নার্ভাস ; কিন্তু সে নিজেও তখন কি করা উচিত, কি বলা উচিত এ বুঝতে পারছিল না, কাজেই মাখনের কাজ ও কথার সমালোচনা করতে পারল না মনে-মনেও ; বললে, 'জল ঘরে আছে, তোয়ালেও আছে . দেব ?'

'তাহলে তো ভালোই হয়।'

প্রমীলা তোয়ালে দিয়েছিল, জল গড়িয়ে দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে মাখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর প্রমীলা জেগেছিল। রজনী-গন্ধার প্রথম ফলন এত কোথা থেকে সংগ্রহ হল এই ভাবতে-ভাবতে ভোরের দিকে যখন তার চোখ বুজে এসেছে খিল-খিল হাসির শব্দে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে প্রমীলা বেরিয়ে এসেছিল।

কালও প্রমীলার ভালো ঘুম হয়নি। কলেজে-পড়া মেয়ে হলেও প্রমীলা রাত জেগে কোনোদিন পড়া করেনি। কাজেই কোনো রাত্রিতে ঘুম না হলে তার কাছে সে রাত্রিটা বিশিষ্ট হয়ে থাকে অনেকদিন মনে রাখবার মতো। ফুলের গন্ধ নয়, মাখনের সান্নিধ্যের জন্যও নয়, ভাবতে-ভাবতে ঘুম হল না। ফুলশয্যার পরের দিন সকালের ব্যাপারগুলিতে এই ঘুম না হওয়ার অঙ্কুর ছিল। প্রমীলার মনে আছে সব। সেই কথাই বলছি।

যার খিল্-খিল্ করে উপচে পড়া হাসিতে তার ঘুম ভেঙেছিল তাকে অবলম্বন করেই দিনের আলোয় সে এ বাড়ির প্রাঙ্গণে পা বাড়াল। গত রাত্রিতে হলুদ ও মশলামাখা যে শাড়িখানা পরে এ বউটি সব কাজে হাত মিশিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আজ সেখানা পরনে নেই বটে, মুখের একপাশে নাকের কোলে হলুদের দাগ এখনও লেগে আছে। তার পিছন-পিছন কলতলায় যেতে-যেতে প্রমীলার আগ্রহ হল বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করতে। কলতলার লাগোয়া ঘরখানি সে আন্দাজেই ঠিক করে নিল সেটা রান্নাঘর। কয়েকটি শিশুর হাসি-কান্না ও খাওয়ার কথা শুনতে-শুনতে তার মনে হল : উনুনের পাশে বর্ষীয়সী একজন দুধ জ্বাল দিতে বসেছেন, শিশু কটি তাঁকে ঘিরে ছোট-ছোট পিঁড়িতে ছোট-ছোট বাটি হাতে কোলাহল করছে। প্রমীলা শিশুদের ভালোবাসে, এ বাড়িতে সে যেন দ্বিতীয় অবলম্বন খুঁজে পেল।

গায়ে জল ঢালতে-ঢালতে প্রমীলা বুঝল—রান্নাঘরে কিশোর বয়স্ক কারা এসে ঢুকল দু-তিনজন। কিশোরদের সে শিশুদের চাইতেও ভালোবাসে। এরা যদি তার দেওর হয় তবে খুব ভালো হবে। প্রমীলার ভালো লাগতে লাগল সকালবেলাটা। ওরা কি নিয়ে খুব হৈ-রৈ করে আলাপ করছে। প্রমীলা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

একজন বললে, 'আসবে না কে বলেছে ?'

ছোট একজন উত্তর করলে, 'চিঠি লিখেছে।'

'তা লিখুক। অমন কড়া কথা ও লেখে. শেষ পর্যন্ত কড়া হয়ে থাকতে পারে না কোনোদিন। আসবে দেখে নিস।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তবে তুই থাক, যাসনে। আমি স্টেশনে চললাম। কই চা হয়েছে নাকি দাও।'

ভারি মিষ্টি এদের গলা। প্রমীলার নিজের ছোট ভাইদের মতো তরল খুশিতে ভরা। কাপড় পালটাতে-পালটাতে প্রমীলা ওদের কথার দিকে কান পেতে রইল।

ওরা বোধহয় চা পেয়েছে। কে একজন বর্ষীয়সী বললেন 'অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছিস কেন ?'

প্রথম কিশোর বললে. 'বাহ্, সতরো মিনিট বাকি আছে ট্রেন আসতে. যেতে অন্তত পনরো মিনিট তো লাগবে।'

দ্বিতীয় কিশোরটি বললে, 'রোজ বলি দুধটা আগে জ্বাল দিতে তা নয় আগে চা করবে।'

বর্ষীয়সী বললেন. 'দুধ তো দিয়েছি তোকে।'

'দিয়েছ তো। এত গরম খাওয়া যায় ?'

প্রথম কিশোর বললে. 'তাড়াতাড়ি করছিস কেন ? তুই তো স্টেশনে যাবি না।'

'যাব না কেন, শুনি ?'

'তুই তো বললি আসবে না।'

প্রমীলা হেসে ফেলল ওদের কথা শুনে। হাসি মুখে চোখ তুলে সে দেখল ঝরোকার ওপাশে দাঁড়িয়ে সেই বউটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ভাব বোঝা গেল না, মনে হল সেও শুনছে ওদের কথা, দৃষ্টিতে যেন দুঃখ মিশানো আছে, তবে ওটা তার স্বাভাবিকও হতে পারে।

আর একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল রান্নাঘরে, প্রমীলার বুকের গোড়াটা টলমল করে উঠল। মাখন বললে, 'পিরিচখানা দাও।'

'তোরও তাড়াতাড়ি নাকি ?'

'তাড়াতাড়ি আবার কোথায় দেখলে ?'

'তবে ভালো হয়ে বস, হালুয়াটা নামাই। কাল রাত্রিতে খাসনি কিছু।'

'ঘুরে এসে খাব।'

'তোদের সবই অদ্ভুত। স্টেশনে যাবি বুঝি ?'

নিস্পৃহ হবার ভান করে মাখন বললে, 'যাই একবার। আসেই যদি ভাববে বিয়ে করে মাখনটা বোকা হয়েছে।

ধুপ-ধুপ করে দুটো শব্দ হল। প্রমীলা বুঝল কিশোর দুটি তপ্ত চা ও দুধ কোনো রকমে গিলে চৌকাঠ থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠানে পড়ে স্টেশনের দিকে ছুটল। পিরিচে করে চা জুড়িয়ে খেয়ে মাখনও বেরিয়ে গেল। কোনো এক বিলেতি গল্পে প্রমীলা পড়েছিল খুশি হওয়াটা বাইরের জিনিসের উপর নির্ভর করে না, খুশি হওয়া মনের একটা ক্ষমতা। প্রমীলার মনে হল এরা সকলেই খুশি হতে পারে সামান্যকে অবলম্বন করে। ভালো লাগল প্রমীলার।

নতুন জায়গায় গেলে, নতুন কাজ হাতে নিলে মানুষ নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাশা করে। বিয়েটার চাইতে নতুন কিছু নেই—বিয়ের আগের জীবন থেকে মেয়েরা শিকড়সুদ্ধ উঠে আসে যেন নতুন জমিতে, কাজেই নতুন আবহাওয়ায় তার বাধো-বাধো ঠেকলেও নতুনত্বটুকুকে সে প্রতীক্ষা করে। অভিনবত্বগুলি প্রথম শীতের আমেজের মতো শিরশিরে সোহাগে ভরে ওঠে।

স্নান সেরে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে প্রমীলা ঘরে ফিরে এল তার গাইডস্বরূপ বউটির সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে বউটি এল, হাতে একবাটি তপ্ত দুধ। প্রমীলাকে বললে, 'খাও।'

চায়ের জন্য প্রমীলার মন টলছিল, কিন্তু আজ সে কথাটা বলতে তার সঙ্কোচ হল, বললে, 'দুধ আমি খাইনে।'

'চা খাও বুঝি ? আচ্ছা নিয়ে আসি। দুধটুকু খেয়ে নাও।'

প্রমীলা জীবনে যা করেনি, হাসিমুখে তা করলে ; মুখে দুধের স্বাদ পাচ্ছিল কিনা বোঝা গেল না, তার মুখ দেখে বোঝা গেল কৌতুক ও কৌতূহলের স্বাদ পাচ্ছে।

দুধের বাটি নামিয়ে রেখে প্রমীলা মুখ তুলে দেখলে বউটি হাসছে। খুশি হয়ে প্রমীলা বললে, 'তোমরাও সবাই খাও, অনিচ্ছাতেও খাও ?'

বউটি বললে, 'ঠিক ধরতে পেরেছ, এখন অভ্যাস হয়ে এসেছে।'

প্রমীলা বিয়ের আগের দিনও কল্পনা করতে পারেনি আহার বিষয়টিতে তার মতো মেয়ের রুচির উপরে আর কারো ছায়া পড়তে পারে, কিন্তু আজ ছায়া পড়ল। বিয়ের আগে প্রমীলা হয়তো কঠিন নিঃশব্দ হাসির আড়ালে সরে যেত, আজ এই চাপিয়ে-দেওয়া অন্যের রুচি সে যেন উপভোগ করল। সে এ বাড়ির একজন হয়ে গেছে নতুবা হুকুমটি তার উপরে চলবে কেন ? প্রমীলার ভাল লাগল, একটু শ্রদ্ধা হল যেন হুকুম দেবার মতো লোকটির উপর। বললে, 'থাকগে, চা আর খাব না।'

একটু পরে প্রমীলা বললে, 'কে আসবে আজ ?'

কথাটা বলতে সে কুণ্ঠা বোধ করল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে, গ্রামের মেয়ের মতো সরল ও সঙ্কুচিতা এ বউটিকে প্রশ্ন না করলে কিছুর সঙ্গেই সে পরিচয় করিয়ে দেবে না। সব বলাও যায় একে।

'ওরা অমনি করে। কে আসবে কে জানে!'

প্রমীলার মনে হল শুনে বউটি যেন উদাসীন প্রকৃতির। তার বলতে ইচ্ছা হল: শুধু ছেলে-মানুষরাই তো নয়, মাখনও যখন এতটা উৎসাহ নিয়ে স্টেশনে গেল তখন যে আসবে সে অন্তত প্রিয়জন তো বটে।

প্রমীলার কৌতূহল বেড়ে রইল আগন্তুকটির সম্বন্ধে।

শ্বশুর খেতে বসেছেন, প্রমীলা তার গাইডের পিছনে রান্নাঘরে গিয়ে বসল। ঘোমটার আড়াল থেকে প্রমীলা এবার শ্বশুরকে দেখতে পেল। গম্ভীর প্রকাণ্ড চেহারা, যেমন মর্যাদাবান লোকের হয়ে থাকে, সম্ভ্রম আকৃষ্ট করার মতো দৃষ্টি। প্রমীলার প্রগলভতাটুকু সম্ভ্রমে গুটিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কথার সুরে প্রমীলার মনে হল বাবাকে যেমন আব্দার করে কথা বলা যায়, তেমনি বলা যাবে এঁকে। প্রমীলার বোধ হল সার্থক বিয়ে হয়েছে তার।

শ্বশুর বললেন, 'এমন দিনেও পরিষ্কার শাড়ি পাওনি, মা ?'

প্রমীলার গাইড তার আধ-ময়লা মোটা শাড়িটা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল।

শ্বশুর আবার বললেন, 'তুমি যদি এমন করে থাক তোমার ছোটজায়েরা ভাববে বউদের বড় কষ্ট এ বাড়িতে।'

গাইড খিল্-খিল্ করে হাসতে-হাসতে বলল, 'তা যদি হয় বাবা, আমি এখনই শাড়ি পাল্টে আসছি।'

শ্বশুর বললেন, 'তা তুমি পর যা ইচ্ছা হয়। শাশুড়ীর কাছে থেকে হলুদ মাখার একটানি করছ বড়গিন্নী একদিন হবে বলে, তাই বলে কিন্তু ছোট জায়েদের শিখিও না।'

প্রমীলার দিকে ফিরে বললেন, 'এটি আমার বড় মা। ওর বাপ-মা ওকে পুতুলের জ্বর হলে মাথায় জলপটি দিতে শিখিয়েছে আর খিল্-খিল্ করে হাসতে। সংসারী হতে ও পারবে না। এখনো ঝোলের কড়ায় আঁচল পড়ে যায় খুলে, রাঁধতে বসলে কড়ার কালি কপাল অবধি লেগে যায়।'

গাইড হাসি মুখে বললে, 'কপালে লাগেনি, বাবা।'

প্রমীলা মনে-মনে বললে—নাকে যে লাগে তা আমি নিজেও দেখছি।

শ্বশুরের খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে, পায়ের শব্দ করতে-করতে কিশোর দুটি ফিরে এল। রোদে মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি তোরা ?' শাশুড়ী বললেন, 'গাড়ি তো কোন সকালে চলে গেছে।'

'দেখ না, গাড়ি চলে গেল, আমি বললাম আসবে না। ছোড়দা বললে,

পরের গাড়িটা দেখে যাই, যদি কিছু কেনা-কাটা করতে গিয়ে এটা ধরতে না-পেরে থাকে।'

ছোড়দা বললে, 'তোকে তো আমি থাকতে বলিনি, চলে এলেই পারতিস।'

'রোদ মাথায় করে কারোই বসে থাকবার দরকার ছিল না। সে তো লিখেছেই আসবে না,' শাশুড়ী বললেন।

'বাহ্! বাবা যে বললেন,আসতে পারে'—একজন কিশোর প্রতিবাদ করল। 'সত্যি আসবে না কে ভাবতে পেরেছিল', শ্বশুর বললেন, 'আসা উচিত ছিল।'

'হয়তো ছুটি পায়নি।'

শ্বশুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছুটি সে পেত, আমাকে কষ্ট দেবার জন্যই আসেনি।'

ব্যাপারটিতে সকলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, শ্বশুর আহার সম্পূর্ণ না করেই উঠে গেলেন। পাতের দিকে চোখ পড়তে প্রমীলার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। কে এই লোকটি যার আসবার কথা নিয়ে এরা সমারোহ করছে, জানবার জন্য তার কৌতূহল হল। ভাবতে গিয়ে তার মনে হল—কথা বলতে গিয়ে শ্বশুরের ঠোঁটের প্রান্ত দুটি বার কয়েক কেঁপে উঠেছিল।

সকলের আহারাদি শেষ হলে বাড়ি যখন দুপুরের জন্য নিঃশব্দ হল তখন প্রমীলা ভাবল এবার তার বড়জা আসবে, কিন্তু সে যখন এল না তখন প্রমীলা আশা করেছিল মাখন হয়তো আসবে। তার ছোট ছোট দেওররাও কেউ এল না। সে ভাবল যে লোকটির আসবার জন্য এরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিল সে না-আসাতেই এরা মুষড়ে পড়েছে। নতুবা যার ফুলশয্যা হয়েছে কাল এমন একটি বউকে একা এমন সময় কাটাতে হয় না।

অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে প্রমীলা দেখলে তার ঘরটির ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাখন তার বড়জার সঙ্গে আলাপ করছে।

মাখন বললে, 'তুমি যাও বরং, মাকে থামতে বল।'

'আমার কথা কি শুনবেন? বরং প্রমীলাকে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা অন্যমনস্ক হতে পারতেন।'

'ওসবের মধ্যে বাইরের লোককে নিয়ে কি হবে?' মাখন মুখ কাচুমাচু করে বলল।

মাখনের বলবার ধরনে প্রমীলার হাসি পেল কিন্তু বড়জার সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে যেতেও তার ইচ্ছা হল। বুদ্ধিমতী প্রমীলা ধারণা করতে পেরেছে বিষয়টিতে নাটকীয় কিছু না-থাকলেও তার শ্বশুর-শাশুড়ীর দুঃখ বা অভিমানটুকু সাধারণ ঘটনার চাইতে গভীর। তার নিজের বাড়িতে এমন কিছু হলে সে-ই অনেকদিন গুমোট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রমীলার মনে হতে লাগল, ভালো গানের মাঝখানে কে কথা কয়ে উঠেছে। নিভৃত রাতের অন্তরে দুজনের কাছে নতুন-পাওয়া দুজন ছাড়া আর কিছু

থাকে না, তবু অন্য কথাই মনে হতে লাগল প্রমীলার। মাখনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল—কোথায় কি গোলমাল হয়েছে, কেন সুর কেটে গেল। একটু উসখুস করে সে নিজে থেকে মাখনের দিকে ফিরল। মাখন মশারির ছাদের দিকে অন্ধকারে চেয়ে আছে, হয়তো ভাবছে। প্রমীল, বললে, 'আজ কার আসবার কথা ছিল, দাদার?'

'হ্যাঁ। তুমি ঘুমোওনি? ছুটি পায়নি তাই আসতে পারেনি মনে হচ্ছে।'

প্রমীলার আর সাহস হল না, একটা সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল; এদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এখনই তার কথা বলাটা সমীচীন কিনা বুঝে উঠতে পারল না।

মাখনও চুপ করে রইল। গত রাত্রিতে মাখন একবার প্রশ্ন করেছিল, 'তোমার নাম পূর্ণিমা না হয়ে প্রমীলা হল কেন?' আজ সারাদিন অন্য কথার মাঝে-মাঝে প্রমীলা একটা ছোট মিষ্টি উত্তর ভেবে রেখেছিল। কেউ প্রশ্ন করল না, কেউ উত্তর দিল না।

কিন্তু জানতে প্রমীলা পারল। ছোট দেওরের কাছ থেকে নানা কথার ছলে পরের দিন দুপুরে সে আদায় করল খবরটা। সে বিস্মিত হয়ে শুনল ঘটনাটা তাকে ও তার বিয়ে নিয়ে। তার সঙ্গে মাখনের বিয়ে হয়েছে বলেই এ বাড়িতে আসেনি তাদের বড়দা।

প্রমীলার বাবা কনট্রাক্টর। টাকা তাঁর যথেষ্ট, বহুদিন থেকে, যুদ্ধের বাজারে অনেক বেড়েছে তা। পাকা ব্যবসাদার তিনি। সব কনট্রাক্টরদের মতোই তিনি যুদ্ধের বাজারে কিছু-কিছু ভেজাল চালিয়েছেন বৈকি, কিন্তু ব্যবসায় ওতো আছেই। আর ব্যবসায় মিথ্যাও থাকে। দোকানদার যদি বলে—চার-পয়সায় কিনেছি ছ-পয়সায় ছেড়ে দু-পয়সা লাভ করব, তাতে সত্যভাষণ হয়, দোকানও উঠে যায়। এ বাড়ির বড় ছেলেটি ব্যবসাদারদের, না ঘৃণা করে না, পৃথক স্তরের মানুষ মনে করে। তাদের বর্জন করতে হবে এমন কথা নেই, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে এমন কথাও নেই। রাজবংশীয় অভিজাত পুরুষ জনসাধারণের একজনকে অসম্মান করে না, তার আভিজাত্যই তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যত পরিচয়ই হোক ঐ সাধারণ লোকটির সঙ্গে সখ্য হতে পারে না বা আত্মীয়তা, রুচি এবং অনুশীলনের দুস্তর ব্যবধান থাকবেই। এ বাড়ির সঙ্গে কোনো ব্যবসাদার স্ববর্ণ হতে পারে না। প্রমীলার যেন অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে। এ বাড়ির বধূ হয়ে এসে সে যেন এদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ক্ষুণ্ন করেছে! ব্যবসাদারের ছল-প্রবণ মন যেন বা এ বাড়ির বিশুদ্ধতায় কালিমাখা হাত রেখেছে। প্রমীলার বাবা শুনলে বলতেন—ছেলেমানুষি, আর একটু বয়েস হোক।

অন্য কোনো উপলক্ষে এ সব শুনলে প্রমীলা ব্যাপারটার ভুল খুঁজে দেখবার এবং তা নিযে আলোচনা করার মতো সহিষ্ণু হওয়ার চেষ্টা করত।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম পালা এটা, করুণাহীন জীবন যুদ্ধে মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটছে অর্থ ও ক্ষমতার লক্ষ্যে। এরা কি অশরীরী, গতযুগের স্বপ্নমাত্র? স্বপ্নের মানুষের অকলঙ্ক মন যেন এদের, শুনে রেখেছে পবিত্রতা ভালো, সত্য ভালো, জীবনে সেই শুভ্র অকলঙ্কতা ফুটিয়ে রাখতে চায়।

যে অস্পৃশ্য নয় তাকে অস্পৃশ্য বললে সে অভিমান করে না, অপমানও বোধ করে না যদি তার স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকে। প্রমীলা জানে তার পিতৃবংশের সবাই ব্যবসা করেন কিন্তু তাই বলে তারা মানুষ হিসাবে অশ্রদ্ধেয় নয়।

কিন্তু বিষয়টিকে লঘু করে দেখবার জোরও সে পেল না। লোকটি বুদ্ধিহীন নয়, ক্ষেপাও নয়, নতুবা এ বাড়ির এতগুলি লোক তার মতামত নিয়ে এমনতর মাথা ঘামাত না। মাখন অন্তত হেসে উড়িয়ে দিতে পারত। কিছুক্ষণের জন্য প্রমীলার যেন সাধ হল এদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটিকে দেখতে। সত্যি যদি হয় এদের এই বস্তুনিরপেক্ষ মানবিক পবিত্রতা তাহলেও তার শক্তি কতটুকু? বিশ্বজগতের জনারণ্যের কোথায় মিশে যাবে এরা? কিন্তু প্রমীলা ভেবে কিনারা করতে পারল না। একবার হয়তো একটা মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিল—কিন্তু সে তো একটা কল্পনা—পৃথিবীর কঠিন কালো অবিনশ্বর মাটির বুকে চুলের মতো একটা ফাটল থেকে একটা অতিক্ষীণ, অতিমৃদু নীল শিখা দেখা যাচ্ছে, হয়তো ওই শিখা একদিন প্রবল আগ্নেয়গিরির রুদ্ররূপ নিয়ে ধরিত্রীকে ভেঙে গড়বে, সেইদিনের প্রতীক্ষায় এ শিখা বাতাসের মুখে নিভতে-নিভতে জ্বলতে থাকবে।

কিন্তু এ যেন ছায়াবাজী দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা, অপ্রাকৃত একটা কল্পনাকে কেন্দ্র করে নিজের ভিতরটাকে শুকিয়ে তোলা। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রমীলার হাসি পেল। দুঃস্বপ্নের কুণ্ঠায় গলা শুকিয়ে উঠলে মানুষ যতই আর্ত হোক দিনের আলোয় সে কুণ্ঠার কথা ভেবে বিচিত্র কাহিনীর মতো সেটাকে উপভোগ করে। প্রমীলা হেসে ফেলে ভাবলে, ছুটি না-পেয়ে ভদ্রলোক আসতে পারেননি। ছেলেমানুষ কি শুনতে কি শুনেছে। হারিয়ে যাওয়া মধুর পরিবেশটিকে ফিরে পেয়ে সে দু-হাতে সেটাকে আঁকড়ে ধরল। বড়জাকে কলতলায় ধরে সে প্রশ্ন করল, 'আমার ভাসুর কবে আসছেন, ঠিক করে বল তো, দিদি।'

তার ধারণাই সত্য হতে চলল। সেদিন বেলা অনেকদূর গড়িয়ে যাবার আগেই এ বাড়ির বড় ছেলে এল। যাকে কোনোদিন দেখেনি, যার কথা কেউ তাকে বলেনি এমন লোককে কল্পনা করা যায় না। কাল রাত্রিতে ঘুমের সঙ্গে জড়িয়ে প্রমীলা তাকে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করেছিল। বার বার তার মনে হয়েছিল—ফরসা দৃঢ়কায় একটি পুরুষের কথা, যার গলায় শাদা ওড়না, শাদা পৈতে, কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে যা বলছে এ বাড়ির সবাই প্রাণপণে তাই করছে।

সাড়া পেয়ে উঠানে সবাই যখন কোলাহল করে উঠল তখন প্রমীলাও জানলার পাশে সরে গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখল তাকে। ধরা পড়লে গর্হিত কিছু করার অখ্যাতি রটবে এ বুঝেও সে কৌতূহল চাপতে পারল না। কিন্তু তার কল্পনায় সঙ্গে কিছুমাত্র যদি মেলে। মাখনের মতোই চেহারা, গাল দুটো শুকিয়ে যাওয়ায় চোখ দুটি একটু বড় হয়েছে এই যা। মাখনের চাইতে বরং একটু রোগা, বরং যেন সামনের দিকে নুয়ে পড়া, আধময়লা খাদির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ছেলে মানুষদের সঙ্গে হড় হড় করে কথা বলছে।

বাড়ির গুমোট কোথায় কেটে গেল। আজ মাখনের গলা শোনা যাচ্ছে। তার বিরাট বুকের জোরাল ফুসফুসের ভরাট শব্দ বাড়িখানাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে: 'শোনো দাদা, শোনো বউদি…'

আজ সন্ধ্যায় প্রমীলা রান্না করতে বসেছে। হলুদের ছোপ লাগা শাড়ি-পরা বউটিকে নিয়ে শাশুড়ী উঠে পড়ে লেগেছেন। তার রুক্ষ চুলগুলি হয়তো বেণীতে গোছানো যাচ্ছে না, তার আঙুলের ডগায় জমে-থাকা হলুদ আর মশলার দাগ হয়তো বা সাবান দিয়েও উঠছে না। প্রমীলা উনুনের আগুনের দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসতে লাগল।

এমন কি মাখন একবার রান্নাঘরের দরজায় এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রমীলার সঙ্গে কথা কয়ে গেল। ওপাশের ঘরখানা থেকে কিশোরদের গলা শোনা যাচ্ছে। তারা বিয়ের গল্প থেকে আনন্দের টুকরোগুলো উদ্ধার করছে। প্রমীলার মনে হল আজ সে মাখনকে বলবে—একজনের নাম পূর্ণিমা না হয়ে প্রমীলা কেন হয়েছে।

রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রমীলা ঘরে এসে বসেছে। আকাশের একফালি চাঁদ উঠানের ডানদিকের আমগাছটার পিছন থেকে খানিকটা আলো দিচ্ছে। ঝিরঝির একটা বাতাস উঠছে, মুকুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে গাছটা থেকে। বড়জা প্রমীলার ঘরে পান রেখে চলে গেল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে প্রমীলা বিছানায় গিয়ে বসেছে। উঠানে পায়চারি করতে-করতে মাখন আর তার দাদা কথা বলছে।

একটু শুনে প্রমীলার মনে হল ওরা যেন বিয়ের কথাই বলছে। মাখন বলছে আর তার দাদা চুপ করে শুনছে।

প্রমীলা শুনতে পেল মাখন বলছে, 'আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি।'

কথাটাকে জোরালো করার চেষ্টায় একটা ঢোক গিলে মাখন আবার বলল, 'তোমার হয়তো মনে হবে কিছু একটা আড়াল করার জন্যে আমি বলছি, কিন্তু তা নয়, সত্যি আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ওকে না পেলে আমার চলত না।'

পৃথিবীতে সব চাইতে মধুর—মিথ্যা হলেও যা মধুর, সে কথাটি এমন আচমকা আঘাত দিতে পারে এ কে জানত? প্রমীলা বিস্মিত হল। মাখন

যদি অস্পষ্ট কণ্ঠে অসংলগ্নভাবে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলত কথাগুলি অবিশ্বাস্য হলেও প্রমীলার কাছে সব চাইতে বড় সত্য হত সেটা। আর যাখন এখন স্পষ্ট অকুণ্ঠ হয়ে বলছে তবু তার মন মিথ্যা গ্লানিতে সংকীর্ণ হয়ে গেল।

প্রমীলার মনে পড়ল এ বাড়ির গুমোটের কথা; মনে হল তাকে এরা সবটুকু মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারছে না। তারপরে দৃষ্টি আবিল হয়ে প্রমীলার দু'চোখ বেয়ে ধারা নেমে এল।

সে রাত্রিতেও প্রমীলার ভালো ঘুম হয়নি।

কলঙ্ক

রাত্রিতে লীলা-সুধীরের ব্যাপারটা দাম্পত্যকলহের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

ব্যাপারটার মূলীভূত সুসি। সে যখন গাড়ি থেকে নামল তখন লীলা তার জানালা থেকে লক্ষ্য করেছিল তার পরনের শাড়ি ওড়না মাত্র হয়ে উঠেছে, ভাগ্যে স্কার্ট পরা ছিল। সিঁড়িতে সুসি-সুধীরের জোড়া হাসি টাল খেতে-খেতে জড়া-জড়ি করে উঠছে, এও শুনেছিল লীলা। স্বামীর আহার্য সম্মুখে নিয়ে রাত জেগে বসেছিল সে। রাতজাগা মানে রাত দশটা। তা হোক, জীবনে প্রথম এই শোবার ঘরে স্বামীর আহার্য নিয়ে অপেক্ষা করার অভিজ্ঞতা, কাজেই সুধীর যখন বলল—বাইরে সে খেয়ে এসেছে তখন লীলা অপমানিত বোধ করল।

কলহের এক সময়ে উত্তেজিত সুধীর বলেছিল, 'কথা বল না. ফাঁকি দেবার লজ্জায় মিশে যাও।'

লীলা পুরনো ব্যথায় আঘাত পেয়ে জ্বলে উঠল, 'আমি গাইতে জানতাম কিনা এ খোঁজ নেবার প্রয়োজন কোনোদিনই বাবার হয়নি, এ পুরনো যুক্তি তুলব না। কিন্তু যদি বাঈজিদের মতোও জানতাম, একটা মাতালকে ভুলিয়ে রাখতে হবে জানলে আমার বাবা বলতেন—গান জানে মেয়ে, বিয়ে দেব না।'

'কি বললে?—ছি ছি কি কেলেঙ্কারি!'

'কলঙ্কের নয়।'

'নিজের মনের তুলনাতেই সুসিকে অত সস্তা ভেবেছ।'

'কি বললে?' এবার লীলার পালা।

সকালের দিকে জেগে সুধীরের মনে হল ঘরে কেউ হাঁটছে। সিঁদুরে বেডলাইট। লীলার সব পছন্দ গাঢ় রঙের। তেমনি একটি মেয়ে সে যাকে গভীর রঙের সিল্কে মানায়, একগলা জড়োয়ার ভিতর থেকেও যার গ্রীবাটাই প্রধান হয়ে থাকে। সুধীর দেখল—লীলা তার শয্যা-উপকরণ গোছাচ্ছে, কোথাও যেন যাবে।

সে বলল, 'কেলেঙ্কারি বাড়িও না।'

লীলা ফিরে দাঁড়াল। সাপের মতো দৃষ্টি। কিন্তু এক-একটি রূপ থাকে ভীষণ হলেই যা পূর্ণ হয়। লাল আলোয় স্বল্পবাস লীলাকে কাঁচকড়ার স্বচ্ছপাত্রে নিষিদ্ধ পানীয়র মতো দেখাল।

কিন্তু সুধীর অনুভব করল—হাত বাড়াতে নেই। তাহলে আলো নিভে যাবে, দরজা খুলে ছেলে কোলে করে লীলা শীতের সকালে বেরিয়ে পড়বে। রাত্রির কলহটাকে গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন ক'রে দেয়া যাবে না, দিনের তীব্রতায় ঝকঝক ক'রে উঠবে।

সুধীরের মা মলিনা অন্যদিনের চাইতে আজ সকালে উঠেছেন। বাড়িতে ননদ-ননদাই, না উঠে উপায় কি। রাত্রির অবিন্যস্ত চুলের সিঁথিতে সিঁদুর পরে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চাবির গোছাটা হাতে ছিল, আঁচলে বাঁধলেন। বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন উঠোনের একটেরে ঝিরা কাজে লেগেছে।

ঘুম থেকে উঠে সিঁদুর পরা, আঁচলে চাবি বাঁধা, ঝুঁকে পড়ে ঝিদের খবর নেয়া এ কাজগুলি তাঁর শাশুড়ীই তাঁর মনে ক্রমাগত উপদেশে কষে বসিয়ে দিয়েছেন। কাজেই রোজ সকালের মতো এ কাজগুলি করতে-করতে শাশুড়ীর কথা মনে হল।

শাশুড়ীর ঘরে যাবার সিঁড়ির পাশের ঘরখানি সুধীরের শোবার। চারিদিকে চেয়ে দেখে একটা কেলেংকারি করে বসলেন মলিনা। সুধীরের দরজায় কান রাখলেন, চোখ রাখলেন চাবির ছ্যাঁদায়। সুধীর-লীলার কলহ কাল কানে গিয়েছিল তাঁর। কিন্তু ঝগড়া ওরা মিটিয়ে নিল কিনা এ জানবার কৌতূহল যতই স্নেহাতুর হোক ছেলে-বউ-এর শোবার ঘরে আড়িপাতার লজ্জাটা তিনি অনুভব করলেন। পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

এ রকম সব কেলেংকারি অনৈচ্ছিকভাবে ঘটে যায় মলিনার।

শাশুড়ীর নাম চম্পাবতী। নামটা পঞ্চাশ বছরে চাপা পড়ে গিয়েছে। বড্ড যেন যৌবন-ঘেঁষা নাম। মনে হলে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করে মলিনার। বাড়ির খুব কম লোকেই জানে এ নাম। জমি-জমা সংক্রান্ত কাগজে সই নিতে এসে নায়েব মশাইয়ের মনে হয়ে যায় এঁর নাম চম্পাবতী মৌলিক। জড়ানো-জড়ানো কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে লেখা নামটি। পঞ্চাশ বছর আগে এঁর দিকে চেয়ে এ নামটা কতখানি সার্থক বোধ হত এ ভাবতে কৌতুক বোধ হয়। কিন্তু আর সকলে ভুলে গেলেও জমিদারির কাগজে সই দেবার বেলায় যেমন দু-একজনের চোখে পড়ে যায় নামটি, তেমনি স্বল্পপ্রকাশিত হয়ে পড়ে সে নামের স্বার্থকতা এঁর বার্ধকালোল মুখাবয়বে হঠাৎ কোন এক মুহূর্তে। এঁর জমিদারিটাও তেমনি সব সময়ে নজরে পড়ে না। ক্ষয় হয়নি সেটা, নগণ্যও নয়, তবু তা বর্তমান সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য নয়। জাহাজী ব্যবসায়ের লাখের হিসাবে যে সংসার চলছে তার একপাশে পড়ে থাকে তাঁর জমিদারির সেহারোকর। যেমন সংসারের মেরুদন্ড জাহাজী কারবারের সেক্রেটারিয়াটের পাশে তাঁর বুড়ো নায়েবের ফরাস-বিছানো সেরেস্তা। যেমন তাঁর নাম, যেমন তাঁর জমিদারি, তেমনি তার অস্তিত্ব: আছেন অথচ কার্যকরী

ভাবে আটপহুরে সংসারিকতায় জড়িয়ে নেই। তিনি এবং তাঁর জমিদারির লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সিঁদুর মাখানো আকবরি মোহর।

চাঁপাবতীর সঙ্গে আজকাল সাংসারিক পরামর্শ হয় না, কিন্তু শুধু প্রণাম করে ফিরে গেলেও চলে না, দাঁড়িয়ে খানিকটা আলাপ করে যেতে হয়। নতুবা হয়তো আধঘণ্টা পরেই ভুলে যাবেন—মলিনা এসেছিলেন কিনা, কেমন দেখাচ্ছিল তাঁকে হয়তো ক্রমাগত লোক পাঠিয়ে খবর করতে থাকবেন মলিনার স্বাস্থ্যের, বাড়িভরা লোকজনের সম্মুখে সেটা কম লজ্জার ব্যাপার নয়।

সেজন্যই মলিনা বললেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, 'সুনীস এসেছিল?'

'হ্যাঁ, দেখা করে গেছে।'

'কি রকম লাগল?'

'বেশ মেয়ে বউমা। কথাবার্তায় বেশ চুলবুলে। কিন্তু একটু যেন রুক্ষ। আমাদের কালই যেন ফিরে আসছে। অবশ্য আমরা পাউডার দিয়ে চুল রুক্ষ করতাম, ওদের যেন আপনা আপনি হয়েছে। জানো বউমা তোমার শ্বশুরদের মান রাখবার জন্য আমাদেরও স্কার্ট পরতে হত কখনো-কখনো, কিন্তু ওদের স্কার্টগুলো যেন বড় বেশি উঁচু।'

শাশুড়ীর সঙ্গে এরকম আলাপ করতে মলিনা পারেন না। যেন শাশুড়ীর মর্যাদা তরল হয়ে যায়। তা ছাড়া সুনীসকে আলোচনা করাটাই তো আলাপের উদ্দেশ্য নয়। অভ্যস্ত কৌশলে কথার মোড় ফিরিয়ে শাশুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে মলিনা সংসারের দিকে চললেন।

একতলার বারান্দায় সুনীস একটা ধূমায়মান পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে হাঁটছে! তার এরকম পায়চারি করা হত না নতুন, এ বাড়ির পক্ষে তার চাইতেও অভিনব তার পেয়ালাটি। মলিনা নিঃসংশয়ে বলতে পারেন সেটা সুনীসর আমদানি—একটা বিয়ার-মগ্। ফায়ারপ্লেসের নিভন্ত আঁচে তাতিয়ে নেয়া যায় এমনি সব মগের কথা ইংরেজী উপন্যাসে পড়া গেছে।

সুনীস বলল, 'তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুন, মামিমা।'

'কেন, বলো তো?'

'এই সকালে দুধটুকু না পেলে মাথা তুলতে পারতাম না, এত মাথা ধরেছিল। তোমার ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ।'

মলিনা হাসিমুখে বললেন, 'অমন পেয়ালাটা পেলে কোথায়?'

সুনীস একবার হাতের পাত্রটার দিকে, একবার মলিনার দিকে চেয়ে অবশেষে হেসে বলল, 'আমার স্বীকার না করে উপায় নেই, অভ্যাস বেমওকায় ফেলেছে।'

'বেশ করেছ।' মলিনা হাসিমুখে রান্নার মহলে চললেন।

মলিনা ভাবলেন : যাকে বারো থেকে বাইশ বছর য়ুরোপে কাটাতে হয়েছে তার পোশাকের শালীনতার মান ভারতীয় হতে পারে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে নিজের রুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া, তাহলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা থেকে যায়,

নতুন গ্রহণ করা পোশাকের রীতিটিও মানিয়ে যায়। তাই হয়েছে সুসির ক্ষেত্রে। কিন্তু তবু অন্তর সায় দেয় না। বোম্বাই শহরে সুসিকে এতটুকু বেমানান বোধ হত না, কলকাতার বাঙালীর সমাজে চোখে লাগে। আলোচনাই করে হয়তো চাকররা ওর পায়ের গঠন নিয়ে। আর ওই বিয়ারমগ্‌! কিছু দরকার ছিল না ওটা ব্যবহার করার। দৃশ্যটা কটু।

কিন্তু মলিনাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। সুধীর সিগারেট খায়, বাটারফ্লাই গোঁফ রাখে—সেগুলি মলিনাকে সহ্য করতে হয়, সুসির এগুলিও চোখ বুজে উপেক্ষা করতে হবে।

ভৃত্যের হাতে চায়ের উপকরণ দিয়ে মলিনা এরপরে ননদাই মহীন্দ্রর ঘরে গেলেন। কয়েক বছর থেকে, তা প্রায় দশ বছর হবে, মহীন্দ্র দু-চার বছরে একবার আসেন। মহীন্দ্র মুটিয়ে গেছেন, টাক পড়েছে। তাঁর চাকরির বদলি এখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে হয়। অম্বিকাকে (মলিনার ননদ) তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে যান কোনো-কোনো বার। গত পাঁচ বছর য়ুরোপ ছাড়েননি, বার্লিন থেকে রোমা, রোমা থেকে প্রাহা করেছেন। এবার বোধহয় কানবারা কিংবা টোকিও।

চা গুছিয়ে মলিনা বললেন, 'এরা এখনও তেমনি সেকেলে থেকে গেল। টেবিলে বসার অভ্যাস হল না। কি কেলেঙ্কারি বলুন তো'।

মহীন্দ্র বললেন, 'পানাহার ব্যাপারটার সময়ে মানুষের মুখের চেহারা এমন কিছু সুদৃশ্য হয় না যে দলবদ্ধ হয়ে ও কাজটা করতে হবে।'

মহীন্দ্র চায়ে বসলেন হাসিমুখে। এমনি চমকে দেয়ার মতো কথা বলাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। খুশি হলেন মলিনা, বললেন, 'এবার কিন্তু কিছুদিন থেকে যেতে হবে। মায়ের বয়স হয়েছে। এখন কিছুদিন দিদির কাছে থাকা উচিত।'

'নিশ্চয়।'

'এ উত্তর বহুদিনের পুরনো, বরং যদি একটু চিন্তা করে বলতেন, আশা হত।'

'কেন, আপনার ননদ কি থাকতে রাজী হবেন না ?'

অনেক দিনের পুরনো রসিকতা। মহীন্দ্র যেবার ডিপ্লোম্যাটিক চাকরি নিয়ে ভারতের বাইরে যান সেবার থেকেই উৎপত্তি। মলিনা জানেন ও চাকরির বেতন একজনের নামে পাওয়া গেলেও ঘরে বাইরে দুজনকেই কাজে নামতে হয়।

মলিনা বললেন, 'তাই বলে চাকরি এবং আমার ননদেরই শুধু দোষ নয় চৌধুরীমশাই।'

'কে বলেছে!' মহীন্দ্র চমৎকার বিস্ময়ের ভান করলেন।

অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসতে পেরেছেন অম্বিকা। বাথরুমে স্নান না করে বাগানের ঝিলটায় গিয়েছিলেন নাইতে। ঠাণ্ডায় এবং খানিকটা

বোধহয় অবয়সোচিত সাঁতারের পরিশ্রমে মুখ চোখ লাল করে ফিরছিলেন, মলিনার সঙ্গে দেখা হল উঠোনে।

'সে কি, এই ঠাণ্ডায় কোথায় গিয়েছিলে নাইতে, দিদি?'

অম্বিকা বললেন, 'বেশ জল, কিন্তু বড্ড জোঁক।'

মলিনা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপের বাড়ির জোঁকগুলিও মিষ্টি, এমনি বটে মেয়েমানুষ।'

অম্বিকা বললেন, 'তুমি যে কবে থেকে বেটাছেলে হয়েছ দাদাকে জিজ্ঞেস করব।'

অম্বিকার রসিকতা সুরু হলে ছেলেমেয়ে ঝি-চাকর মানে না, মলিনা পালাই-পালাই করতে লাগলেন।

হাসিমুখে চলে যেতে যেতে অম্বিকা ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কথাটা বলা দরকার, বউদি, কিন্তু দাদাকে বা মাকে বলা যাচ্ছে না।'

মলিনা চেয়ে দেখলেন, এ যেন অন্য কোনো অম্বিকা, মুখে রঙ নেই রস নেই। মলিনার মন অসাধারণ কিছু শোনার ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। হয়তো সুসি সম্বন্ধেই কোনো কথা হবে।

অম্বিকা বললেন, 'তুমি ব্যবস্থা করে দাও, কাল পরশুর মধ্যে আমরা চলে যাব।'

কিন্তু এতে বিবর্ণ হওয়ার কি আছে! অম্বিকারা দুদিন বাদেই চলে যাবে এতো এ বাড়ির নগণ্যতম প্রাণীটিও জানে। বিদায়োন্মুখ মেয়ে-জামাইএর সম্মানের ব্যবস্থা করার কথা কি মলিনাকে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে? মলিনার অনির্দিষ্ট একটা লজ্জাবোধ হল, কোনো ত্রুটি কি মহীন্দ্রর চোখে পড়েছে এবার, আর বাপের বাড়ির ত্রুটিটা ঢাকবার চেষ্টা করছে অম্বিকা?

মলিনা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম কিছু কিছুদিন ধরে রাখব তোমাদের।'

অম্বিকা একটু দ্বিধা করলেন, কিন্তু কি একটা বলার সাহস হল না বলেই যেন না-বলে চলে গেলেন।

কাজে-অকাজে মলিনার অম্বিকার কথা মনে হতে থাকল।

সংসারের প্রথম তদারক পর্ব শেষ করে মলিনা তখন বাজার দেখে রান্নার ফর্দ করে দিতে বসেছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলেন লীলা ছেলেকে কোলে নিয়ে দুর্ভাবনায় মুখ ভরে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। পৌত্রে অভ্যর্থনা সাংসারিক ব্যস্ততায় স্মিতহাসি হয়ে ফুটল। কিন্তু পৌত্র যে! বামনঠাকরুনদের তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য বললেন, 'তাহলে ঠিক হয়েছে? বাকিটুকু কালকের মতো হোক।' তারা চলে গেলে লীলার চিন্তাক্লিষ্ট ভ্রূ মলিনার চোখে পড়ল। আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'অসুখবিসুখ নয় তো, লীলা?' সে কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে আধ ঘুমন্ত পৌত্রকে কোলে নিয়ে গালে গাল

ঠেকিয়ে উত্তাপ অনুভব করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'এ তোমাদের কোন দিশি ব্যাভার বাপু, বাড়ির কর্তাকে কোলে করে চলেছ, অথচ মুখে হাসি নেই।'

লীলা তথাপি নিরুত্তর। এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। লীলা-সুধীরের গত রাত্রির কলহ মলিনার মনে পড়ল।

লীলা বলল গম্ভীর মুখে, 'আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, মা।'

প্রস্তাবটা আকস্মিক, তার ভাষাটা তদপেক্ষা। সুধীর-লীলার কলহ যদি অজানা থাকত মলিনা নির্বাক উপেক্ষায় আকস্মিকতা ও দুষ্ট ভাষাকে দগ্ধ করতেন। তাঁর অনুভব হল: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেটা-বউ যখন এসে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি চায় তার অর্থ নিজেরা কলহের নিষ্পত্তি করতে না-পেরে অন্য কথায় বলছে, আমরা ভাব করার পথ পাচ্ছিনা, তুমি মিলিয়ে দাও। কিন্তু শাশুড়ীদের এরকম অবস্থায় গম্ভীর মুখেই কথাবার্তা বলতে হয়।

মলিনা বললেন, 'ভেবে দেখি।'

লীলা বলল, 'আমি ফোন করেছিলাম, দাদা আসবেন দুপুরের পরে নিতে।'

মলিনা চিন্তিত হলেন, লীলা ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে দিয়েছে। তিরস্কারের উদ্যোগটা চেপে তিনি বললেন, 'এস তো আমার সঙ্গে।'

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে মলিনা প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে?'

এ প্রশ্নের উত্তর লীলার প্রস্তুত ছিল না। আবেগে তার বুক ওঠাপড়া করতে লাগল। কিছু বলবে না ভাবতে-ভাবতে সে বলে ফেলল, 'সুসি আমার সব মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে।'

মলিনার মুখ বিবর্ণ হল। তাঁর পায়ের তলায় ঘরের মেঝে টলে উঠল। কাল রাত্রিতে হোটেলে খেয়েছে সুধীর, হয় তো নাইট ক্লাবে হৈ-চৈ করেছে। সুসি শুধু বোন নয়, বন্ধুও বটে। কিন্তু একটি মেয়ে যখন অপরের মুখ পুড়িয়ে দেয় আর তাতে একজনের স্বামী জড়িয়ে থাকে···

বেদনায়, ক্রোধে, চোখে জল আসার উপক্রম হল মলিনার। কিন্তু যারা বলে মলিনা সংসারে ডুবে তাঁর প্রতিভার অপচয় করেছেন তারা আধখানা মাত্র জানে। মলিনার প্রতিভা আছে—এটুকুই তাদের আধখানা মাত্র জানা, তার অপচয় হয়েছে—এটুকু তাদের অজ্ঞতা।

মলিনা বললেন, 'আমার জন্যে অপেক্ষা কর এই ঘরে, আমি না-আসা পর্যন্ত কোথাও যেয়ো না।'

লীলা বুঝল দুর্গে বন্দিনী হল সে। এ ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ অধিকার আছে সুধীরের আর হয়েছিল তার নিজের। লীলা বুঝতে পারল, এখন তার নিজের কিছু করা শেষ হল, মলিনার সময় ও সুযোগের মুখ চেয়ে থাকতে হবে।

একটা কেলেঙ্কারিকে দ্বার রুদ্ধ করে মলিনা ত্বরিত গতিতে নেমে এলেন। কিছুই ঘটেনি এমনি মুখের চেহারা করতে-করতে তাঁর মনে হল: সুধীর

সাধারণত অন্যায় করে না। অবশ্য পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে এমন দুর্দমতা আছে বটে অনেক বিষয়ে। প্রকৃতিটা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হবে, না তার বর্তমান ভবিষ্যৎ জোড়া সর্বস্ব? দেখা যাক, অবশেষে ভাবলেন তিনি, শাস্তি যদি দিতে হয়, তবে সেটা গোপনে, দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চেপে।

এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়ে নেবার পর মলিনার প্রয়োজন হয় স্বামীকে। পরামর্শ করার জন্য নয়, অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য ঃ নতুবা ঘটনাটা বুকে চেপে বসে, ঘটনার দিনটা অনন্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

হেড়ম্বপ্রসাদকে পাওয়া গেল তাঁর ষ্টাডিতে।

মলিনা হেসে বলল, 'কাজ নেই হাতে?'

'না। হঠাৎ?'

'এমনি এলাম খবর করতে।'

হেড়ম্বপ্রসাদ স্ত্রীর উপস্থিতি অনুভব করে তৃপ্ত হলেন। গভীর রাজনৈতিক খবর দেবার সুরে বললেন, 'খবর শুনেছ? মা আবার উইল করবেন বলে পাঠিয়েছেন।'

মলিনা হাসলেন, 'আজই আসবে নাকি এটর্ণি, কবার হল?'

'মায়ের সেরেস্তাদার বলছিল চতুর্থ। প্রথমবারে শুনেছি আমি সব পেয়েছিলাম, দ্বিতীয়বারে সব অম্বিকা, তৃতীয়বার আমি আর অম্বিকা সমান-সমান।' দুজনেই হাসলেন। ছেলেমানুষি দেখে নিজেরাও নামতে পারে উপভোগের আশায় তাদের মতো হাসি।

'তোমার খবর কি?'

মলিনার মুখে ছায়া পড়ল একবার, তারপর বললেন, 'কিছু না।' মনকে খানিকটা হাল্কা করে মলিনা সংসারের পাশে দাঁড়ালেন আবার।

আহারে বসে কিন্তু অম্বিকা বললেন কথাটা, বলতে গিয়ে চোখে জল এল তাঁর। স্বামীর চাকরীর অসুবিধায় কাঁদবার মেয়ে নয় অম্বিকা, তার চাইতে অনেক বড় বেদনা মহীন্দ্রর এই কলঙ্ক।

অম্বিকা স্বর নিচু করে বললেন, 'অথচ ওঁর কাজের বিচার শেষ পর্যন্ত করবে ইতিহাস।'

মলিনা বললেন, 'যে সব রাজনীতিওয়ালারা সমালোচনা করছে তারা কি চুক্তিটার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না?'

'তাঁরা বলছেন দুই দেশের বিদ্বেষটার স্থান আছে শুধু ওঁর কল্পনাতেই। উদ্দেশ্য ছিল আর এক ধাপ উপরে ওঠার জন্যে নিজের দিকে দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। একটা কাগজ বলছে, এটা নাকি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নাম বার করার কৌশল।'

'ছি-ছি!'

'আরও কি বলছে জানো? উনি নাকি কিছু অর্থ পেয়েছেন এর ফলে।

এদেশের মহাজনরা আর ওদের মন্ত্রীরা নাকি সে অর্থ দিয়েছে।' কথা খুঁজে না-পেয়ে আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মলিনা। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তাঁর কানের পাশটা যেখানে দু-একটা পাকা চুল চিক্‌চিক্‌ করছে।

অম্বিকা বললেন, 'ভবানীপুরের বাড়িটাতে আজকালের মধ্যে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, বউদি। সেখানে নির্জনে উনি নিজের চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবেন।'

মলিনা নিজের শোবার ঘরে এসে দেখলেন পৌত্র তাঁর বিছানায় ঘুমুচ্ছে। মেঝেতে লীলা পাথরের মতো বসে। মলিনা পৌত্রের কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিলেন, কপালে মৃদু চুমু খেলেন। লীলাকে কিছু একটা বলবেন মনে হল, কিন্তু খানিকটা সময় তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলেন, তারপরে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক কোনদিকে যাবেন ঠিক করতে না পেরেও হাঁটতে লাগলেন। ভাবলেন, তোমার পরিচয় শুধু সুধীরের স্ত্রী নয়, লীলা। তুমি এ-বাড়ির একটা ছেলের মাও বটে। ভেবে দেখো, সময় নাও। প্রকাশটাই কলঙ্ক. কলঙ্ক হিসাবে ছড়িয়ে না দিয়েও অপরাধকে শাস্তি দেওয়া চলে।

অসময়ে দেখা হল হেড়ম্বপ্রসাদের সঙ্গে। এ সময়ে হেড়ম্বপ্রসাদ অন্দরে আসেন না। মলিনা বিস্মিত হলেন, কিন্তু তখনও তিনি অন্যদিনের মতো চেহারা নিয়ে আসা এ দিনটার পরিণতি দেখতে পাননি।

হেড়ম্বপ্রসাদ বললেন, 'তোমাকে খুঁজছিলাম, বিপদ হয়েছে।'

বিপদ! সুধীর-লীলার সামাজিক কলঙ্ক, সুসির অসামাজিক কলঙ্ক, মহীন্দ্রর ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারি, তার তুলনায় একটা বিপদ অনেক বেশি সুসহ।

মলিনা বললেন, 'কি হয়েছে ?'

'মহীন এসেছিল, বললে ভবানীপুরের বাড়িটাতে এখন থাকবে। কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ?'

'ওঁদের যাওয়াই তো ভালো। এখনও কর্মচারীদের আত্মীয়দের জানতে বাকি আছে ব্যাপারটা।' বললেন মলিনা।

'কি হয়েছে ?'

মলিনা তখন মহীন্দ্রর কথা বললেন।

হেড়ম্বপ্রসাদ তিক্ত হেসে বললেন, 'এ রকম আশঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা আমার হাতে নেই।'

'সে কি!' মলিনার বিস্ময় বেদনাবোধে পর্যবসিত হল। 'কি বলছ তুমি ?'

'হ্যাঁ। বিক্রি করতে হয়েছিল সেবার। ওরা তো কখনো থাকে না। দশ বছরের মধ্যে একদিনও না।'

'তাই বলে—' মলিনা কথা শেষ করতে পারলেন না।

'বাণিজ্যমন্ত্রীর এক নিকট আত্মীয়র খুব পছন্দ হল কিনা। দেখো বাণিজ্যিক আভিজাত্যের নিচতলাটা কি। কিন্তু শোনো এলগিন রোডেই একটা বাড়ি পাচ্ছি, কথাও চলছে।'

তথাপি মলিনা নিরুত্তর। এবার ব্যবসায়ী হেড়ম্বপ্রসাদ বললেন, 'তা ছাড়া বাড়িটা যে অম্বিকাদেরই ছিল—'

মলিনার মনে হল স্বামীর ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে তাঁর কথা বন্ধ করবেন। একথা বলা, বাড়ি বিক্রির চাইতেও বড় কলঙ্ক। স্বত্তসাব্যস্ত করা, যার পরে আসে মামলা, কোর্টে গিয়ে হলপ পড়ে সাক্ষী দেওয়া। যে বাড়িতে অম্বিকা এতবার থেকেছে কলকাতায় মহীন্দ্রর বাড়ি নেই বলে, সেটা প্রকৃতপক্ষে কার তাই নিয়ে কথা তোলা। এরপরে তাঁর ননদের এ-বাড়িতে থাকার অর্থ হবে দখল নেবার জন্য মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা, আর তাঁদের থাকতে বলার অর্থ দাঁড়াবে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। যেটা ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মিলন সেটা কি কদর্যই না হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু অম্বিকাকে ধরে রাখতে হবে। আর যাই হোক কেলেঙ্কারির মতো তীব্র হয়ে উঠতে দিলে চলবে না ব্যাপারটিকে। সময়ের সঙ্গে থিতিয়ে যাক, ভোঁতা হয়ে যাক।

মলিনা সেলাই ঘরে ঢুকলেন। উল আর কাঁটা ছিল পাশাপাশি। সেগুলি নিয়ে অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্যাঁচালো একটা ছক তুলতে বসলেন। আঙুলের গতি দেখে মনে হল প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তিনি কাউকে পিছনে ফেলে দৌড়বার চেষ্টা করছেন।

পড়ন্ত বিকেলে তাঁর কানে এল পাশের ঘরে সুধীর ও সুসি কথা বলছে। সুধীর বলল, 'তা আমি জানি না। তুমি বৈজ্ঞানিক, উপায়টা তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

সুসি বলল, 'ঝগড়া করেছ ?'

'হ্যাঁ, তাকে দাম্পত্য কলহ বলে না, বিশ্রী একটা ব্যাপার করে বসেছি। হাসির ব্যাপার নয়, সুসি, কাল আমার নেশা হয়েছিল। তোমার সঙ্গে ও ছাই খেতে বসে দস্যুর মতো খাওয়াই হয়েছে। পুরুষের দম্ভ না করাই উচিত। ও বিষয়ে তুমি আমার গুরুজন।'

'লীলা কোথায় ?'

'খুঁজে পাচ্ছি না।'

এই প্রকৃত সুধীর। কঠিন কথাগুলোও যে হাসির মতো করে প্রকাশ করে।

ওদের কথাবার্তার শ্লথ গতি মলিনার আড়ষ্ট কঠিন মনকে নমনীয় করে দিতে লাগল। এ পথে লীলাদের ব্যাপারটার নিরসন হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না. এটা অন্তত জানা যাচ্ছে সুধীর-সুসির কলঙ্ক এমন নয় যে লীলাকে আত্মসম্মান খোয়াতে হবে ফিরতে গেলে, নতুবা সুধীর সুসিকে এমনতর অনুরোধ করত না লীলাকে ফিরিয়ে আনতে।

মলিনার ব্যাথা ধরে আসা আঙুলগুলি থামল। চেয়ারের পিঠে হেলে বসেই একটু বিশ্রাম নেবেন এমন মনে হল। একটা কলঙ্ক যেমন ফিকে হয়ে যাচ্ছে সবগুলি যদি তেমন হত।

কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। এখনও অম্বিকাকে থাকতে বলার প্রায় অসাধ্য কর্তব্যটা করা হয়নি।

সন্ধ্যার শব্দগুলিতে সজাগ হয়ে মলিনা উঠে দাঁড়ালেন। অম্বিকার কাছে যেতে হবে, কিন্তু তারও আগে শাশুড়ীর সঙ্গে নৈমিত্তিক সাক্ষাৎটা করে আসতে হবে। সৌভাগ্য এই এতক্ষণ পর্যন্ত কলঙ্কগুলি ছড়িয়ে পড়েনি অন্তত। যদি চাপা পড়ে নাও যায় তবু একসঙ্গে সবগুলির প্রকাশ না হয় যদি, তাও ভালো। একটা দিনের পক্ষে এতগুলোর চাপ দুঃসহের চাইতেও বেশি।

শাশুড়ীর ঘরের দরজায় মলিনা থামলেন। ভিতরে মহীন্দ্রর গলা শোনা গেল আর বোধ হয় এটর্নি মিত্তিরের। রাষ্ট্রনীতির পুরনো একটা সংবাদের ভিতর-পিঠের আলোচনা করছেন তাঁরা। এ আলোচনাব জন্য তাঁরা এখানে এসে বসেছেন এটা সম্ভব নয়। দৃশ্যতই তাঁরা কারো প্রতীক্ষা করছেন।

অবগুন্ঠনকে রুচিপূর্ণ করার অভ্যস্ত টানটা দিয়ে মলিনা ঘরে ঢুকলেন। মহীন্দ্র বললেন, 'আসুন, বউঠান, আপনার খোঁজে সরমি আর শতদল গিয়েছে ?'

ঝিদের পক্ষে খুঁজে না-পাওয়া আশ্চর্য নয়, লীলার বিয়ের পর থেকে সেলাই-ঘরে তিনি কদাচিৎ গেছেন।

এটর্ণি বললেন, তিনি যে মনোমত একটা উইলও খাড়া করতে পারছেন না। এই লজ্জা তাঁর স্বরে, 'আমি আবার এসেছি, এবার মায়ের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উইল করতে হবে।'

চম্পাবতী বললেন, 'বস, বউমা, আমার পাশে এখানটায়। আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। শুধু সাক্ষী হলেই হবে না, ভাষাও যোগাতে হবে।'

মলিনা বসতেই তিনি আবার বললেন, 'কে পাবে সে আমার ঠিক হয়ে গেছে। সুসি ম্যুনেং থেকে বিজ্ঞানে ডক্টর হয়েছে, অবশ্যি জার্মেনিরা "K" দিয়ে ডক্টর লেখে আর সুসি M.SC. না পড়েই ডক্টর হয়েছে। তা হোক সে বিয়ে-থা করবে না, বিজ্ঞান নিয়ে থাকবে। আমার নগদ টাকা যা আছে এবং সুসির জীবদ্দশায় আমার জমিদারির যা আয় হবে সব সে পাবে। তার পরে আমার জমিদারির

আয় ফিরবে সুধীরের ছেলেতে। আর আমার বাড়িগুলি আমার পরে অম্বিকা ও হেড়ম্ব দুজনে ভাগ করে নেবে, সে ব্যবস্থাও করেছি।'

মহীন্দ্র বা মিত্তির কথা বললেন না। বাড়ির কথায় মলিনার ভিতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল, তিনিও মুখ নিচু করে রাখলেন।

চম্পাবতী বললেন, 'আমি হেড়ম্বকে সর্বস্ব দিয়ে উইল করেছি, অম্বিকার বেলাতেও তাই, কিন্তু কোনোবারই মনের ধোঁকা আমার যায়নি। উইলও বদলাতে হয়েছে। কেন এমন হল, শোনো। তার পরে তুমি আর মহীন সাক্ষীর জায়গায় সই করে দিও। আমি বুঝে উঠতে পারি না ওদের মধ্যে কার দাবী বেশি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের হাতে তুলে দিলাম।

তিনি একটু জল খেলেন, একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন যেন। তার চোয়ালের নিচে ঝুলে-পড়া পেশীগুলো গলার শিরাগুলোর সঙ্গে কাঁপতে লাগল।

চম্পাবতী বললেন, 'তোমরা জানো আমার অম্বিকা ও হেড়ম্ব যমজ। ওদের গায়ের রঙ, মুখের চেহারায় তফাত আছে। মিলও কম নেই। কিন্তু এ দিয়ে এ বিষয়ে কিছু নির্ধারণ করা যাবে না। ড্যাসিঁলিয়েফ বলেন (এখানে একটু হাসলেন চম্পাবতী) এর চাইতে কম মিলের যমজও দেখা গেছে। তার চাইতেও বড় কথা ওদের দুজনকে বিছানায় পাশাপাশি নিদ্রিত রেখে আমি মিলগুলো দেখেছি, পার্থক্যগুলো দেখছি, তাতেও এর সমাধান হয়নি, তোমরা কি ক'রে পারবে বল? প্রায় তিন দিনের ছোট-বড় ওরা কিন্তু কে বড় কে ছোট আমিও জানি না। হেড়ম্ব দৈহিক শক্তির প্রাধান্যে দাদা হয়ে বসেছে। এরা ছোটবেলায় এ ওর গুরুজন হবার জন্য মারামারি করত।'

শেষ কথাটা বলে চম্পাবতী হাসলেন।

'ওদের দুজনের একজন, কে তা বলার উপায় নেই আমার, ভূমিষ্ঠ হবার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় তিন দিন পরে জ্ঞান হল, তারও প্রায় এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার আমাকে প্রথম সন্তান স্পর্শ করতে দিলেন। ওরা আমার কোলে এনে দিল অম্বিকাকে। তখন তখনই কথাটা আমার মনে পড়েনি। আরও এক সপ্তাহ যাবার পরে এক দিন হঠাৎ মনে পড়ল: জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে কে যেন বলেছিল আমার ছেলে হয়েছে। মহীন্দ্র, তুমি কিছু মনে কোর না বাপু, মায়েদের কেন যে প্রথম সন্তানকে পুত্র পেতে লোভ হয়, এ আমি বলতে পারব না। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; তিনিও স্বীকার করেছিলেন, ছেলের উপরেই তাঁরও লোভ ছিল। তাই বলে অম্বিকা আমার হেড়ম্বর চাইতে কম নয়, ভগবান জানেন।

তখন আমাদের ভয়ানক বিপদ। তোমাদের শ্বশুর তখন সেসনসের বিচারে পাশের জেলায় গেছেন। আমার অমন অবস্থার খবরটাও তাঁর কাছে সময়মতো পৌঁছায়নি। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে আমার দেওর ছোটজাকে

পেঁাছে দিয়েছিলেন আমার সেবা শুশ্রূষার জন্যে কিন্তু স্ত্রীকে রেখেই চলে গেলেন তাঁর রাজনৈতিক সভা করতে। দেখো, এই জন্যেই আমি সরকারি চাকরি আর রাজনীতিকে কোনো দিনই ভালো চোখে দেখতে পারলাম না। আমার দেওর বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের মধ্যেও সব চাইতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অধ্যাপক ছিলেন। আমার ছোট জাকে যখন তিনি আমার সেবা করতে আনলেন তখন তারও সময় পূর্ণ হয়েছে। আমার অবস্থা দেখে আতঙ্কে হোক কিম্বা অন্য যে কোনো কারণে হোক আমার দু-দিনের মধ্যে তারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। আমার ও তার সন্তান দুটিকে দুপাশে রেখে সে কয়েকদিন বাঁচিয়ে রাখল। তারপর ওরা আমার কাছে নিয়ে এল অম্বিকাকে।

'মা!' মলিনা ব্যাকুল হয়ে এতদিনের গোপনে রাখা কঠোর সত্যটাকে প্রকাশ করতে নিষেধ করার চেষ্টা করলেন।

চম্পাবতী বললেন, 'অত সহজ ব্যাপার নয়, বউমা। জ্ঞান হবার পর এসব শুনলাম, দেখলাম। মনে হল এ কদিনেই বাসার সবাই আমার ছোট জায়ের বশংবদ হয়ে গেছে। আমার বোকা আয়াটাই দেখছি শুধু কড়ায় করে আগুন নিয়ে এ ঘর ও ঘর করছে। এই সময়েই আমার মনে পড়ল—যেন কে বলেছে আমার ছেলে হয়েছে। এটা সত্যি কেউ বলেছিল কিনা আজও আমার সন্দেহ হয় কিন্তু মনঃস্থির করতে আমার পাঁচ-সাত দিন গেল। তারপর একদিন আমার ছোট জায়ের ঘরে গিয়ে বদলে আনলাম। মেয়ের বদলে ছেলে। সে তখন ঘুমিয়েছিল। ভেবেছিল এটা হয়তো রসিকতা। চার-পাঁচ দিন হেড়ম্ব আমার কাছে রইল। একদিন এসে সে রাগ করে বলেছিল—সে কি দিদি, ছেলে দাও। না-হয় ছেলেমেয়ে দুই-ই দাও।—না আর বলতে ভালো লাগে না।

একটু থেমে চম্পাবতী আবার বললেন, 'আমার জা আমার চাইতে শিক্ষিতা ছিলেন, আমার তুলনায় ধনী ছিল তাঁর পিতৃকুল। তবু কি রকম একটা কম্‌প্লেক্স ছিল তাঁর—তাঁর একটা ধারণা জন্মাচ্ছিল বাড়িতে সে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না আমার তুলনায়। জেদ বেড়ে যাচ্ছিল তার। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে শুনলাম আমার আয়াটা চেঁচামেচি করছে। আমার জাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেঁদে-কেঁদে অম্বিকার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এরপরে কোনোদিনই আর আমার জায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তখন আমরা গোপালপুরের বাড়িতে। সমুদ্রটাও যেন তখন আরো কাছে ছিল বাড়িটার। খবর পেয়ে সবাই এল, আমরাও গোপালপুর ছাড়লাম। ছেলে আর মেয়ের কে আমার তা আমি ঠাহর করতে পারিনি, আর সে চলে যাবার পর প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছাও হয়নি প্রমাণ খুঁজবার।

খানিকটা চুপ করে থেকে চম্পাবতী বললেন, 'হ্যাঁ সই কর এবার। তখন আমরা কেন কি করেছিলাম তা বলা যাবে না আজ। আজকালকার সব ডাক্তারই জানে প্রসূতির অনেক সময়ে সাময়িক গোলযোগও হয় মস্তিষ্কের।

উইলে সই করে মলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বহুক্ষণস্থায়ী সিনেমা-ছবি দেখার পর বেরিয়ে যেমন চোখে ধোঁয়াটে বোধ হয় সামনের সিঁড়িটাও তেমনি হল মলিনার। বিবর্ণ মখমলের খাপ থেকে হিংস্রধার কৃপাণের মতো লোলদেহ-গ্রন্থির নির্মোক থেকে ক্ষণেকের জন্য বাইশ বছরের চম্পাবতী তার সন্তানক্ষুধার আদিম বর্বরতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে। সে লোলুপতা একজনের মৃত্যুর নিমিত্ত হয়েছিল বললে তাকে যেন সীমাবদ্ধ করা হয় মাত্র। কিন্তু কি দরকার ছিল এটিকে এতদিন পরে প্রকাশ করার? উইল সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের সমর্থন? শুধু কি তাই।

কয়েক পা যাবার পর সুসির দরজা। চম্পাবতীর উপাখ্যান থেকে পালাবার জন্য মন ব্যগ্র ছিল। সুসির সঙ্গে কথা বলবেন ভেবে দাঁড়াতে গিয়ে মলিনা দেখলেন, আধভেজানো দরজার আড়ালে কিমোনো পরা সুসি টেবিলে সদ্য ঢালা এক মগ বিয়ার, ফেনাগুলো গড়িয়ে পড়ছে টেবিলে: তার এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অন্য হাতে সে কপাল টিপে ধরেছে।

দরজাটা বন্ধ করে দিলেও হত, প্রায় কান্নার কাছে গিয়ে ভাবলেন মলিনা। অন্তঃপুরে এই প্রথম প্রবেশ লাভ করল।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পুরনো কলঙ্ক যেন অন্য সবগুলোকে ছাপিয়ে উঠল।

সুনীতি

লেখকের মন্তব্য 'গল্পটি অশ্লীল। যারা অশ্লীলের কাদা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সরোজ উপহার দিতে পারেন শেষের লাইন-পঞ্চকে তাঁদের মতো কোনো উদ্দেশ্য নেই আমার। কিছুর প্রমাণ নয়, কোনো প্রস্তাবও নয়, শুধু বর্ণনা। এর বেশি আমার দাবী নেই।'

আমি প্রথম স্তবক শুনে মন্তব্য করলাম : 'তাহলে যতটা সফেন হয়েছিল, উর্মিল হয়েছিল, আসলে গভীরতা ততটা ছিল না বিষয়টিতে? সময় নিলেও এক সময়ে থিতিয়ে গেল সেটা, দেখা গেল সুনীতি তলিয়ে যায়নি এই তো?'

'তা সত্যি। কিন্তু কেন হল?'

'কত শত কারণ থাকতে পারে। শুধু উপমায় নয়, ঘটনাটিতেও প্রত্যক্ষত তুমুল জলধারার সংযোগ ছিল হয়তো। হয়তো বা শ্রাবণ মাসের সারাদিনের বর্ষণোন্মুখতা ভাসকল্পিত কাজলবর্ষণে পরিণত হল রাত দশটায়। বাতাসের ফুৎকারে তড়িৎকম্প মৃৎপ্রদীপের শিখার মতো কাঁপতে লাগল। সিমেণ্ট ও ইঁটের দৃঢ় আশ্রয়ে থেকেও মানুষদের মনে হল আদিযুগের গাছতলায় অসহায় হয়ে রয়েছে তারা। হয়তো সুনীতি দ্বিজুবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে বলেছিল, —কি রকম শব্দ, এরই মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন? বসবার ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দিতে এলাম ; ছাট আসছে।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ, বাইরের জলধারা তাদের রক্তকে উত্তাল করে তুলেছিল?'

'তার কোনো প্রমাণ নেই বোধহয়। হয়তো সেটা ছিল চৈত্রের কোনো রাত। অস্পষ্ট আলো ছিল আকাশে। সারা পৃথিবীতে বাতাস ছিল না। নিঃশব্দ পুকুরের জলের মতো নিঃস্ব রাত্রি থৈ-থৈ করছিল, পাতা পড়লে শব্দ হবে এমন, অদ্ভুত উত্তাপ ছিল চরাচরে। বারান্দায় পায়চারী করতে-করতে সুনীতি আর দ্বিজুবাবুর দেখা হল। কার্নিশের উপরে একটা পায়রার কাছে আর একটা সরে গেল, এ রকম কোমল শব্দ এল কিনা কানে কে জানে। সুনীতি সম্ভবত আস্তে-আস্তে বলেছিল—অদ্ভুত রাত্রি।'

'হতে পারে,' স্ত্রী বললেন, 'সুনীতির নিজেরই মনে নেই আর কি কি কথা হয়েছিল। চূড়ান্ততায় গিয়ে পৌঁছানোর কি-কি সোপান ছিল। আমার মনে হয় কোনো যুক্তি কোনো কারণই ছিল না।'

'তারপরে কি হল, বল। কেনই বা এমন গোপন কথাটা অনুপমকে বলে দিল সুনীতি ?'

'অনুপম দু-তিনদিন পরে ফিরল। আদর করার সময়ে সুনীতিকে কাছে নিয়ে বলল অন্য অনেক কথার মধ্যে, রাত জেগে থাকতে বুঝি ? রোগা হয়ে গেছ যেন।...রয়ে গেছে,—প্রায় চিরাচরিত চটুল সুরে বলেছিল সুনীতি। অনুপম বলেছিল—ওকি আর গোপন থাকে ? নিশি জাগরণ মসী আঁকা আছে কলঙ্কী নয়নে। মেয়েদের প্রেমবৃত্তিটা অতি ভয়ানক, গোপনের কোনো উপায়ই নেই।'

'এবার বুঝতে পেরেছি,' বললাম আমি, 'কেন সুনীতি প্রকাশ করে ফেলেছিল ব্যাপারটা অনুপমের কাছে। আমি যেন মেয়েটিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। একটি দীঘল গড়নের মেয়ে, তাই নয় ? উচ্চতার মাপযন্ত্রে দাঁড় করালে দেখা যাবে বাংলা দেশের সাধারণ পুরুষের চাইতে উচ্চতায় সে খাটো তবু উচ্চতার ভুল ধারণাটা হয়। এটা হেঁয়ালি নয়, মেয়েদের বেলায় এমন ভুল হয় : এর জন্য দায়ী তাদের বিভিন্ন অঙ্গের একটা অনুপাত যেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু তারই ফলে তাকে শুঁটকি না বলে বলতে হয় দীঘল। অবক্তব্য শোনালেও সত্য, এদের নিরাবরণ দেহের ছবি আঁকা যায়, আর সে ছবি হয় অপ্রগল্‌ভ বাংলার পট। এরকম একটা মেয়ে যদি হয় সুনীতি তবে তার মনে হতে লাগল, (সেটা যে তার নিছক কল্পনা এ কিছুতেই সে বুঝতে পারল না), অনুপম দুচোখ মেলে তার মুখে তীব্র দৃষ্টিতে কি খুঁজছে। প্রথম রাত্রিটা গোপন করে থাকা গেল। দ্বিতীয় দিন সারাক্ষণ আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুনীতি ভাবল, তার চোখের কোণে চরিত্রহীনার দাগ পড়েছে, উপন্যাসে যেমন থাকে। নিজেকে লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে রাত্রিতে সে বলে ফেলেছিল, 'আমাকে ছুঁয়ো না।'

স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনুতাপ নয় ? অনুতপ্ত হয়েই বলেনি তাহলে স্বামীকে ?'

'শেষ অবধি না শুনে বলা যাবে না। গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাও।'

'এরপরে সর্বনাশকে অবিশ্বাস করে হেসে উড়িয়ে দিতে কি-কি বলেছিল অনুপম, কতটা কাঁদল সুনীতি, কিম্বা আদৌ কান্নাকাটি ছিল কিনা ব্যাপারটায় এ জানা যায়নি। কোর্টে নালিশ করে না অনুপম, সন্ন্যাসী হয় না, রিভলবার হাতে ভয় পর্যন্ত দেখায় না। বরং যেন সহৃদয়তার চূড়ান্ত করল। সুনীতির নামে বাড়ি লিখে ছিল, ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা একটা অঙ্ক। দ্বিজুবাবুকে বলল সে—সুনীতির পক্ষে একা একটা বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, তোমাকেই তার বাড়িতে থাকতে হবে। হয়তো দ্বিজুবাবুর অসহ্য বোধ হতে বলল সে,—শোন অনুপম, তুমি নিরুপম ব্যবস্থা করেছ, কিন্তু মামলাটায় তোমার রায় আমি মানব না, কোর্টে চল। অনুপম বলেছিল,—

ভদ্রঘরের মেয়েছেলেকে স্পর্শ করলে দায়িত্ব এড়ানো যায় না কোনোক্রমে।… সুনীতির বাপের বাড়ির লোকরা জানল, শ্বশুর বাড়ির লোকরা জানল। ছি-ছি-ছি। পাড়ার পরিচিতরা হৈ-হৈ করল ; কিন্তু যতটা হতে পারত হল না। ঢেউটা থিতিয়ে গেল। তা যাক, কিন্তু সুনীতি সান্ত্বনা পেল কি করে? এ অবস্থায় কি কেউ পায় সান্ত্বনা কোনোদিন?'

'এ তো বোঝাই গেল সুনীতি শক্ত জাতের মেয়ে ছিল। তার সম্বন্ধে কল্পনা করা কঠিন নয়। ধর, প্রথম সন্ধ্যায় দ্বিজুবাবু বলেছিল—সুনীতি তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। সুনীতি বলেছিল—আমি উপন্যাসের নায়িকা নই, বিষয়টিও লজ্জার।…কিন্তু শেষের দিকে সেই সুনীতিই হয়তো একদিন দ্বিজুবাবুকে বলল—বেঁচে থাকার প্রয়োজন তোমারও আছে। কেন মরবে বল, কি গুরুতর অন্যায় তুমি করেছ?…… আসলে গল্পের ও জীবনের পরিধি সমান বিস্তৃত নয়। গল্পে ঘটনাকে পুঞ্জীভূত করতে হয়, সংহত করতে হয়, পাঠককে একমুখী করে রাখতে হয় সুনীতির প্রেমের দিকে। কিন্তু সে তো মানুষ। ওরই মধ্যে কি করে সে দৈনন্দিন খবরের কাগজটা পড়ত, সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে চোখ রাখত, পা ছড়িয়ে বসে হিসাব লিখত সংসারের, এসব বেরঙা ব্যাপার নিয়েও দ্বিজুবাবুর সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করত। আর শুনতে তোমার অবাক লাগলেও একথা সত্যি সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে দুজনে হেসেও ফেলত এক সঙ্গে। হাসা খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু দুজনে এক সঙ্গে হাসা যে কোনো বিষয় নিয়ে মানে কতখানি কাছাকাছি যাওয়া এ তো সহজেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু এমন ঘেন্নার ব্যাপারেও? সুনীতি বুঝতে পেরেছিল তার জীবনের কুগ্রহ এই দ্বিজুবাবু, তবু? কত বড় শান্তি, সুখ ও প্রতিষ্ঠা থেকে এই দ্বিজুবাবু তাকে বঞ্চিত করেছে।'

'এ যদি মেনে নিতে হয় তাহলে তো সুনীতির চরিত্র বুঝেই ফেলা গেল। তার এ রকম বোধ হয়েছিল মানে অনুতাপ গ্রাস করেছিল! তাই কি মনে হয় তোমার?'

'আমার মনে হয়,' স্ত্রী বললেন, 'ও পোড়ামুখী সবই পারে। ও দ্বিজু-বাবুকে বলে উঠেছিল একদিন—আমাকে আর দূরে রাখবার কি যুক্তি তোমার? বিয়ে কর, বিয়ে করলে যদি ভালোবাসা যায় ; যে কোনো একটা নামমাত্র দেশাচার হোক, ভালোবেসে বাঁচি।'

'আশ্চর্য নয়! জাহাজ ডাঙ্গায় মার খেলে মানচিত্রে অলিখিত দ্বীপের নির্জনতায় দুটি নাবিকের এমন হয়ই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, কিম্বা এ উপমা ছাড়াও হত। বিবাহের প্রথম রাত্রি প্রভাত হলে বরকনের মধ্যে প্রেমের স্মৃতিও থাকে না, সুনীতিদের ব্যাপারে তার চাইতে অগভীরতা ছিল না এ বাড়িতে অন্তরীণ হবার আগে।'

বললাম আমি, 'সুনীতির একটি মেয়ে ছিল ?'

'ছিল, এ বাড়িতে এসে পেয়েছিল সে।'

'তাহলে এটাই তার স্থিরতার কারণ, আর স্থিরতা থেকে শান্তি অনেক সময়েই পাওয়া যায়। মেয়েরা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ভয়গুলোকে দূর করার ফন্দি ফিকির করতে করতে বাকি দিন কয়েকটি এরকম ক্ষেত্রে কাটিয়ে দেয় দেখা যায়।'

'যায় হয়তো। পারল না সুনীতি। আবারও পদস্খলন হল তার। আর সেটা হল অনুপমকে জড়িয়ে। আমি বলতে গিয়েছিলাম এটা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল গল্পের গোড়াতেই নতুবা অনুপম যে ব্যবস্থা করেছিল, সেটা করত না। কিন্তু ভেবে দেখলাম তার উল্টোটাও খুব সম্ভাব্য। যারা হৈ-চৈ করে, চেঁচামেচি করে, নিজেকে উপহাসের লক্ষ্য করে তোলে তাদের আসক্তিটা যে তাদের মনের অন্যান্য বৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে এ বোঝা যায়। কিন্তু অনুপমের গোড়ার কাজগুলো দেখে তো সে রকম মনে হয়নি।'

কিন্তু স্ত্রী যা বললেন, সেটাই বলি ঃ

একদিন দ্বিজুবাবু বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল, 'অনুপম তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সুনীতি।'

'আমার সঙ্গে ? কেন! কি বলব তাকে ?'

বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে আবার একদিন তার মনের কাছে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহের সর্তটি ভেঙে যাবার পর দেখা হলে কি করে তারা ? এ তো মান-অভিমানের বিচ্ছেদ নয়, বিবাহের পূর্বের প্রেমাস্পদকে দেখাও নয়।

সেদিনই সন্ধ্যার পর অনুপম এল। চাকর এসে খবর দিল বাইরে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে।

'বসতে বল গে। তোমাদের বাবু বাড়ি নেই ?'

সুনীতি যখন বাইরে এল ঝকঝক করছে সে। আটপৌরের মধ্যে একটু বিশেষ যেটা সেটা তার পরনে। কপালে সিঁদুর দগদগ করছে। চুড়িগুলোর পাশে বিয়ের রাতে পরা ঘড়িটি অবধি। অনুপম উঠে দাঁড়াল, মাথা নিচু করে বলল, 'তোমার কাছে এলাম, সুনীতি, একটা দরকার আছে।'

'বলুন', সুনীতি অভ্যর্থনাসূচক হাসল ঠোঁট দুটি একটু তির্যক হতে আলো ঠিকরে পড়ল।

'বসতে বললে না ?'

'বাহ, বসুন !'

অনুপম বসল, সিগারেট ধরাল, কিন্তু কথা খুঁজে পেল না। তবু হয়তো কথা বলত সে। সুনীতির মুখে ব্যবধানসূচক 'আপনি' ও অনুপমবাবু শুনবার পরও সাহস ছিল তার। শেষের দিকে একরাশ ফেনার মতো সাদা ফ্রকের ভেঙ্গে

পড়া ঢেউয়ের মধ্যে সুনীতির মেয়ে দরজার কাছে চাকরের হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। একটু যেন লজ্জার লক্ষণ দেখা দিল সুনীতির মুখে।

'আমার মেয়ে।'

'খবর দাও নি তো, বললে অনুপম।

দেয়া যেত হয়তো ; ভাবল সুনীতি এই কথাটা বলে।

কিন্তু একদিন সকালে অনুপমের বাড়িতে যেতে হল তাকে। অনুপম চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল।

'কি ব্যাপার ?'

বস, খুব একটা জরুরী দরকারে ডেকে পাঠিয়েছি।'

অনুপম উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করল, দরজা বন্ধ করে দিল, খুলল ; তারপরে এক সময়ে বললে, 'আমার ভরাডুবি হয়েছে, নীতি।'

'কি হয়েছে ?' (পুরনো সম্বোধনে মনের বিকার হয় নাকি ?)

'ব্যবসায় ফেল করেছি। আমি মদও খাইনি, তোমার পরিবর্তও খুঁজে বেড়াইনি। তবু ফেল করলাম। (একটু হাসল অনুপম) বোধহয় আমেরিয়ানায় পেয়েছিল, একেবার তলিয়ে গেল মধুকর। ব্যাঙ্কের টাকা ওভারড্রাফট্ করতে করতে কোথাও আর কিছু নেই। নিজের ব্যাঙ্কের টাকা ওভাবে ফুরিয়ে দিলে লোকে কি বলে জানো ? তাই বলছে।'

'এ সব আমাকে বলছেন কেন ? কি করতে পারি আমি ?'

'দান করার মতো কিছু সম্পত্তি আছে তোমার। সেইটি—'

সুনীতি দানপত্র লিখে দিয়ে এসেছিল। লিখে দেবার সময়ে অনুপমের মুখে সে শুনেছিল এ সম্পত্তিটা সুনীতিকে দিয়েছিল তার শ্বশুর বিবাহ রাত্রির আশীর্ব্বাদ হিসাবে। সুনীতি কলমটা হাতে পেতেই ঘসঘস করে সই করে দিল।

কয়েকদিন পরে সুনীতি চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে অনুপমকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

অনুপম এলে বলল, 'হোটেলে খাচ্ছ বোধ হয় আজকাল ?'

'কি করে জানলে ?'

'আন্দাজে। কেউ ভাত নিয়ে বসে থাকবে না, স্নান কর, খাও, গড়িয়ে নাও।'

'তারপর ?'

'আমার সঙ্গে একটু ব্যাঙ্কে যেতে হবে, টাকা তুলব।'

'সঙ্গে যেতে হবে কেন ?'

'অনেক টাকার দরকার হয়েছে, ওভারড্রাফট্ও করতে হতে পারে।' হাসল সুনীতি।

সুনীতি কাছে বসে খাওয়াল অনুপমকে। ভাত নামতে চায় না অনুপমের গলায়। সুনীতি বললে, 'কষ্ট হচ্ছে খেতে, ওঠ, ঘরে গিয়ে বসবে। বেরিয়ে হোটেলে খেয়ে নেবে।' অনুপম লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলার মতো মুখ করে বসে রইল।

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ-করে, ব্যাঙ্ক-বাড়ির বাঁধানো চত্বরটুকু দ্রুতগতিতে পার হয়ে এসে হাতব্যাগটা সিটের উপরে ছুঁড়ে দিয়ে ভেঙে একেবারে পড়ল যেন সুনীতি সিটের গভীরতায়। অনুপম কথা বলতে গেলে সে বলল, 'এখন নয়, বাড়ি গিয়ে শুনব।'

বাড়িতে ফিরে অনুপম বললো 'এখন আমাকে যেতে হবে। মনে হচ্ছে কাজটা বিবেচনা করলে না। অবশ্য একটু দাঁড়িয়ে গেলে তোমার সব টাকাই ফিরে পাবে।

আঙুলে কপাল চেপে ধরে সুনীতি বললে—(ব্যাঙ্কে যে অস্বাভাবিক তরল সুরে কথা বলছিল সেটা এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে) 'একটা কথা তুমি বুঝতে পারনি। তোমার দারিদ্র্যের পাশে আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকাটা একটা অশ্লীল স্থূলতা, মদের মহাজনের ঐশ্বর্যের মতো।

অনুপমের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য জানা ছিল সুনীতির, এক-রোখা ছেলেদের নিজের বেদনার কথা কাউকে না বলার মতো, ঠিক তা নয় অবশ্য। কি রকম চরিত্রের লোক এ বলার চাইতে অনুভব করা অনেক সহজ। যদি বলা যেত মনের অন্তঃস্থলে সুনীতিই তার একান্ত আত্মীয়, যার জন্য এই পাঁচ বছরের পাহাড়ের ব্যবধানের পরও পরম দুঃখের সময়ে অনুপম সুনীতির কাছেই এসেছিল? কিন্তু এরকম ভাবালুতা অনুপমে আরোপ করা যায় না। এ যেন ব্যর্থপ্রেমে ছবি আঁকছে সে সুনীতির কিম্বা হুইস্কির বিলাসে জড়িয়ে-জড়িয়ে বিলাপ করছে—এ সব বলারই সামিল, অন্তত তার চাইতে কম অসহ্য ছি-ছির ব্যাপার নয়।

শুধু টাকার জন্যই অনুপম আসতে পেরেছে এটাই যেন আকর্ষণীয়, এই একান্ত বস্তুতান্ত্রিকতা, উপন্যাসে যাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় নায়করা। এই স্বার্থপরতার নজিরই যেন তাকে বেশি জীবন্ত করেছে।

কিন্তু এসব চিন্তারই বা কি সার্থকতা ভাবতে গিয়ে সুনীতি অনুপমের পাশে গিয়ে বসল। ছি-ছি অতটা ভাবপ্রবণ হয়ো না বলে অনুপমের কপালে হাত রাখল। জোর করে রহস্যের সুর এনে বললে, 'তোমরা পুরুষরা অর্থনীতির চাকায় বেঁধে সমাজ চালাবে। স্ত্রী আর তার সন্তানদের জন্য বাড়ি তুলবে। সেই ব্লুপ্রিন্টে চোখ বাঁধা তোমাদের, আর কিছুর খোঁজ নিও না। এতদিন কত লোকের সঙ্গে কত লেনদেনের ব্যবসা করেছ এও তেমনি! দেখলে কি রকম বকবক করছি? বড্ড বকা আমার স্বভাব হল যেন।'

এরপরে সহসা চোখের দৃষ্টি আর্ত হল সুনীতির, বলল সে, 'মুখ তোল··· মনে কর সে সব নৈকট্য, সে সব আলিঙ্গন কোনো পুরুষ বন্ধুর। পুরুষ বন্ধু তো বিয়ে করে, তারপরেও তো তাকে কাছে আনা যায়।'

স্ত্রী থামলেন।

আমি বললাম, 'এর পরে কি কথা হয়েছিল সেটা বলা কঠিন নয়? কিন্তু এমন একটি অনন্য বাক্য যে গড়ে তুলতে পারে আবার পদস্খলন হল তার?'

'হ্যাঁ হল। একদিন বঙ্কিমের লরেন্স ফষ্টরের গল্প পড়েছিল সুনীতি ঘুমানোর আগে। স্বপ্ন দেখেছিল, বজরায় চলেছে সে অনুপম-নামা এক দুর্ধর্ষ জমিদারের সঙ্গে নিশীথ রাতে যে বন্দুকের আওয়াজে ঘুমন্ত জলচর পাখিদের শুধু ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে না, রক্তাক্ত মৃত্যুও এনে দিচ্ছে। এ রকম স্বপ্নাবেশ দিয়েই কি বিশ্লেষণ হয় সুনীতির এই দ্বিতীয়বার আছড়ে পড়ার? অনুপমের হয়তো এক ধরনের রুক্ষ পৌরুষ ছিল। তার আকর্ষণ কি দুর্বার? আর ভাব দেখি, এর চাইতে অন্য কারো মোহে ঘর ছাড়া কি অনেক সুসহ হত না? এটা কি নিলাজ অশ্লীলতার চমক নয় এই পূর্ব-পরিত্যক্ত স্বামীকে গোপনে আবার গ্রহণ করা?'

'নিলাজ বৈকি। সমর্থন করার যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিজুবাবু ও অনুপমের চরিত্র উল্টেপাল্টে দেখেও না। তাদের চরিত্র আছে বলেই মনে হয় না। বাহ্যত সুনীতির জীবনে তারা প্রভাব বিস্তার করলেও মনে হয় সুনীতি নিজেই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে নিচ্ছে। সংসারে একরকমের মেয়ে থাকে যাদের কাপড়-চোপড় এটায় ওটায় বেধে গিয়ে বিভ্রাট ঘটায়। এ অভ্যাস অনেক দুঃখেও তাদের যায় না। নতুবা সুনীতি আবার কেন অনুপমের মোহে জড়িয়ে পড়বে!'

স্ত্রী বললেন, 'তারপরে কি হল বলতে পার?'

'শান্তি পাওয়া মুশকিল হল এবার?'

'না। আবার পদস্খলন হল। এই তৃতীয়বার।'

'উঃ, অসহ্য।'

স্ত্রী বললেনঃ রাখাল তার নাম। বয়সে সে সুনীতির চাইতে পাঁচ বছরেরই ছোট হবে।

অনেকদিন পরে ছেলেটি এসে দাঁড়াল। একটু বা টেরা, কিন্তু সেটা এত সামান্য যে বিরস বোধ হয় না। একটু বা রোগা-রোগা। গোঁফ উঠেছে। আজ বড়-বড় রাখে, কাল কেটে বাদ দেয়, পরীক্ষা চলছে এখনও। মোটা টুইলের সার্ট হাতা গুটিয়ে পরা। হাসতে গেলে ঠোঁটের মাঝখানটায় উঁচু হয়ে ওঠে।

প্রথমটায় খানিকটা অপমান বোধ হয়েছিল সুনীতির রাখালের কথাবার্তায়, রসিকতায়। কিন্তু রাখাল চলে গেলে কৌতুক বোধ হল। পুরুষরা যে

মাঝে-মাঝে কি পরিমাণ বোকা হতে পারে, ভাবল সে। মুখে যা বলতে আটকায়, কি করে সে সব লেখে চিঠিতে? কিন্তু কি মনে করে চিঠিখানা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে না ফেলে আলোর সামনে খুলে বসল সুনীতি।

লেপাফা খুলে ভালোবাসার কথা বেরুলে যতটা ছেলেমানুষ বোধ হত তার চাইতেও ছেলেমানুষ রাখাল। মাত্রাহীন রসিকতা করেছে সে। চিঠিতে শুধু হিজিবিজি আঁকা, কিন্তু পড়তে-পড়তেই সহসা একাগ্র হল সুনীতির দৃষ্টি। কে যেন কাকে হুকুম করছে রেল লাইন উপড়ে ফেলার, ব্রিজ উড়িয়ে দেবার, সমাজের সর্বাঙ্গীন ধংসের প্ল্যান! সুনীতি উঠে গিয়ে তখনই বাক্স খুলে গোপন করে রেখে দিল কাগজটা।

হঠাৎ যেন করুণা এল তার, কি বোকা, কি অসাবধান।

মাঝে-মাঝে গভীর রাতে আসত রাখাল, মেলোড্রামার সুরে কথাও বলত। চাওয়ার তার শেষ নেই। নেই বললে বলে, গলার হারটা খুলে দাও। শিউরে ওঠে গা কথা শুনে, না দিলে নাকি গভীর রাত্রিতে এসে চুরি করে নিয়ে যাবে।

এরই মধ্যে একদিন রাখাল এসে বলল, 'একটা দামী স্যুট দিতে পার?'

'কোথায় পাব?'

'তুমি যে শ্ল্যাক্‌স্‌ পর না তা আমি জানি, বোকা মেয়ে। মাপ রেখে যাচ্ছি, পরশুর মধ্যে বানিয়ে রাখবে, খেলো না হয়।'

'কেন?'

'অত শত জবাবদিহি যদি করতে হয় চাই না তোমার প্যাণ্ট আর কোট।'

একদিন দুপুরে রাখাল কাঁদল সুনীতির ঘরে বসে। সোফাটায় বসে আছে রাখাল, সুনীতির মেয়েটা তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বকবক করছে আর রাখালের চোখ থেকে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সুনীতি বলেছিল, 'স্যুট নিতে এলে না কেন?'

'দরকার হল না।'

'প্ল্যান বদলে গেল?'

'যার জন্যে, গুলিতে ঘায়েল হয়ে গেল সে।'

দুপুরের রোদে চা চেয়েছিল রাখাল, চা নিয়ে ফিরে এসে দেখল সুনীতি তাকে কাঁদতে।

কিন্তু অনেকদিন পরে হঠাৎ যেদিন এল রাখাল, সেকথা বলি।

'কি খবর?'

'জেলে যাবার ইচ্ছা ছিল না, কাজও এগোল না। দেখি এবার ডাক্তার হতে পারি কিনা।'

'পড়ছ তাহলে আবার?'

'ইচ্ছা আছে, ঘটে উঠলে হয়।'

'মন বসছে না?'

'খুব বসছে, বসালে না বসে কে? বইগুলি বেচে খেয়েছি এখন সেটা বুঝতে পারছি।'

'টাকা চাই তো?'

'তার ভূমিকা এতসব, এ কী করে বুঝলে?' রাখাল মেয়েদের মতো হেসে উঠল।

টাকা নিয়ে সে ফিরে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর যুদ্ধের সাজে রাখাল এসে উপস্থিত, কাঁধের দুপাশ থেকে দুটি ঝোলা ঝুলিয়ে।

'এ বেশে আবার?'

'এলাম তোমার কাছে।'

'তা বেশ করেছ।'

'শোবারঘর দেখিয়ে দাও।'

'সে কি!'

রাখাল যা বললে তার অর্থ, সে পড়তে চাইলেও তারা পড়তে দিচ্ছে না। তাদের নাকি নিয়ম একবার নাম লেখালে আমরণ দল ছাড়া যায় না। তার কাঁধে ঝোলানো ঝুলিতে বোমাও নেই, ডাণ্ডাও নেই। একটায় কিছু হাড় আছে মানুষের, অপরটিতে গুটি কয়েক বই। সুনীতি যদি তাকে মুরগী-মায়ের মতো ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে পরীক্ষাটা সে দিতে পারে হয়তো।

কিন্তু তাই বলে বাড়িতে তো আর রাখা যায় না।

প্রায় দু-তিনমাস আবার রাখালের খবর নেই। চাকরের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে সুনীতির মেয়ে একদিন আবিষ্কার করল রেল লাইনের ওপারে টালির ছোট একটা ঘরে থাকে রাখাল।

দুপুরে একদিন রাখালের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সুনীতি।

'কি করছ?'

রাখাল ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল, বললে, এ এক রকমের খেলা। মনের জড়তা টিকটিকি পুলিসের মতো পিছু নিয়েছে, বাঁকাচোরা পথে চলে তাকে বিপথে বে-নিশান ফেলে পালাবার চেষ্টা চলছে।'

'বড্ড রোগা দেখাচ্ছে যেন, অসুখ-বিসুখ নয় তো?'

'এ বয়সে ও রকম হয়। আমাদের বয়েসের হরিণ দেখনি? শরীর হাল্কা রাখার জন্য গাছে গুঁতিয়ে বছরে দুবার শিং ভেঙে ফেলে দেয় তারা।'

কিন্তু রসিকতার সুর ধরে রাখতে পারল না রাখাল। বললে, 'কি হয়েছে জানি না, ঘুমুতে পারছি না। রাত্রিতেও পায়চারি করে বেড়াতে হয়। বড় একলা বোধ হয়, ভয়-ভয় করে। বোধ হয় দল ছাড়ার অভিশাপ।'

'নিজেকে কাপুরুষ মনে করার ভূত বুঝি?'

'হাসির কথা নয়, দিদি, মনে হয় যদি তুমি কাছে থাকতে কোথাও হয়তো ঘুমুতে পারতাম। তোমার ঘরের পাশে একটু জায়গা হয় না?'

কথা দিয়ে অনুভব মাপা যায় না। অনুভব পরিবহনের জন্য নীরবতা সৃষ্টি করতে হয়।

সুনীতি বলল, 'এদিকে এস, ঘুমাও তুমি, আমি বসে থাকব।'

প্রস্তাবটির আকস্মিকতা, অসম্ভাব্যতা, নিজেদের বয়সের বস্তুজ্ঞান, এ সবের দ্বন্দ্ব কাটাতে সময় লাগল রাখালের; কিন্তু এক সময়ে এসে সুনীতির কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল, ডান হাতখানা দিয়ে সুনীতির একটা বাহুও জড়িয়ে ধরল।

ঘুম যখন ভাঙল তার রাত হয়েছে। বলল, 'চল এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সেই রাখালের অসুখের খবর পাওয়া গেছে কয়েকদিন হয়। রাত্রিতে উঠে ঘরের জানালার গরাদ ধরে ভাবল সুনীতি। নেমে এসে সদর দরজার পাইকগুলি ধরে দাঁড়িয়ে আর একটু ভেবে হাসিমুখে অন্ধকার পথে সে বেরিয়ে এল। স্নিগ্ধ জলে-ভেজা হাওয়ার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সুনীতি এগিয়ে চলল ভাবতে-ভাবতে।

হয়তো বা আবার সে কোলে মাথা রেখেই ঘুমুতে চাইবে। হয়তো সে এতক্ষণ ক্লান্ত চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। গভীর রাত এখন, কাল রাত্রিতেও হয়তো ঘুম হয়নি তার। চোখের তলে খোলা বই, আলোটা লাল হয়ে আসছে। না পারছে ঘুমুতে, না পারছে বইয়ে মন দিতে। তার মনের মধ্যে কি আশা নেই, খুব ক্ষীণ একটা আশা, একখানি স্নিগ্ধ হাতের? কিন্তু কি ছেলেমানুষ ওরা, কি বিপদ যে এ রকম আসায় মেয়েদের তা কল্পনাও করতে পারে না। শুধু নিজের নীরব দাবি জানিয়ে খালাস।

সুনীতি মনে-মনে হাসল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একসময় দলছাড়া হয়ে পড়েছে এমন একটা শিশু। পাগলামি কর না বলে হাসতে-হাসতে যাদের চারিদিকে দু-বাহু বাঁধা যায় তেমনি।

একটা কিছু আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না ওরা। অত যে শক্ত ওদের চেহারা তার পেছনেও আছে কোনো না কোনো মেয়ের নিজেকে ভুলে যাওয়া আত্মোৎসর্গ। মায়ের মতো একজন ওদের চাই শেষদিন অবধি। সব অভাব পূর্ণ করতে পারে এমন একজন সাথী, ময়নামতীর মতো কোনো মেয়ে শিশু-স্বামীকে বুকে করে মানুষ করেছিল যে গভীর অরণ্যে।

এই ছবিটি মনে হতেই সুনীতির মন থমকে দাঁড়াল নিজের মুখোমুখি।

—আচ্ছা, বলতো, সুনীতি, এসব চিন্তা কেন হচ্ছে অসুস্থ একটা ছেলেকে দেখতে যেতে। রাত্রি বলে? দিনের আলোর অভাব, তাই? নিজেকে সমর্থনের এ চেষ্টা কেন? রোগীকে সাহায্য করা, একটি শিশুকে মানুষ করে

তোলা এত ভালো কাজ যে তুমি নিজেকে সমর্থন না করলেও ক্ষতি নেই, পৃথিবীর সবাই করবে।

কি দরকার তার চিন্তার তাহলে, এই স্থির করে দ্রুতপদে হেঁটে চলল সুনীতি। কিন্তু নিজেকে সমর্থন করা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এ যে বলেছিল তার কথা তখনও শেষ হয়নি।

স্ত্রী বললেন, 'আহা মনের দ্বৈত অবস্থা কি এমন হয়? এ পক্ষ যা চিন্তা করছে সেটা অপর পক্ষের কাছে সম্পূর্ণ অজানা থাকে?—এমন অজানা যে কি কথার পর কি কথা সে বলবে এ পক্ষ তা জানতে পারে না কথাটি উচ্চারণ হওয়ার আগে।'

'সুনীতির মনে খুব একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল?'

'তাই স্বাভাবিক নয়? সুনীতির মনে যে চিন্তাগুলোর উদয় হয়েছিল আমার তো মনে হয় সেগুলো দুপক্ষের তর্কাতর্কির মতো। ও পক্ষ বলে উঠল,—নিজেকে সমর্থনের চেষ্টায় কি পায়ের কাছে যে বাধা জমা হয়েছে সেগুলোকে দূর করে দেয়ার ইচ্ছা নেই! এ সব বিশ্লেষণ শুধু সেজনাই। নতুবা এ সব কথা মনে আসার কি যুক্তি? অন্য কথা ছেড়ে দাও, তোমার বুকের কাছে যে অনুভবটা তার দরুনই তো তোমার তুলনাটা মনে পড়েছে নতুবা পুরনো গ্রাম্য কবিতার তুমি এত ভক্ত পাঠক নও যে হামেশা মনে হয় সেগুলি। ঐ ময়নামতীর কথা। ওটা কি অপূর্ব ও অসাধারণ অনুভব নয়? স্বামী ও সন্তান একত্রে এক দেহে বুকে রাখার আনন্দ নয়, বলছ? ছি ছি সুনীতি। কত ছেলেমানুষ রাখাল, কত অনভিজ্ঞ সে। মনে মানুষের অনেক কিছুই হয়—এই যেন সুনীতির নিজের বক্তব্য। কিন্তু ও পক্ষ ততক্ষণে স্কুলমিস্ট্রেসের মতো থাবা দিয়ে তার দুকাঁধ চেপে ধরেছে। অনেক অভিজ্ঞতায় কঠিন সে, তার সামনে কোমল প্রাণ একটা মেয়ের চোখের জলের প্রত্যুত্তর দেয়া ছাড়া আর কি করার আছে। ও পক্ষ বললে—মানুষের মনে অনেক দুর্বল মুহূর্তে অনেক অলস কল্পনা জড়ো হয়, কিন্তু তুমি কি অতটা বিশ্বাস কর নিজেকে? বলো না হয়, তাই বলো।'

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সুনীতি। গুমটি ঘরের ভেতর থেকে তার সে ফোঁপানো কান্না নাকি শুনতে পেয়েছিল রেলের গেট-পাহারাওয়ালা।

সুনীতির পায়ের তলায় রেলওয়ে শ্লিপার জুড়ে তৈরি ক্রসিং একটা। এদিক ওদিক থেকে অনেক জোড়া রেললাইন এই ক্রসিংটার কাছে এসে মিলেছে, পৃথক হয়েছে পথ বদলে। ঝকঝক শব্দে একটা আলো এগিয়ে আসছে। দিনের আলোর মতো আলো হয়ে উঠেছে ক্রসিং-এর কাঠগুলি। সুনীতির শাড়িটা

বোধ হয় সিল্কের। আঁচলাটা কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের এক পাশ দিয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। বাতাস লেগে দুলছে আঁচলটা, চুলগুলিও।

গাড়ি একটা তীব্রধ্বনি করে উঠল।

যেন বা দিনের আলোয় নেমে এল সুনীতি। এই সেই ক্রসিং যাকে এ অঞ্চলের লোকেরা বলে স্যুই-সাইডিং। একের পর এক অনেক হতভাগ্যের রক্তে লাল হয়ে গেছে এই কাঠগুলি : গাড়ির সময়ে এখানে এসে দাঁড়ালে নাকি নিরাপদ জায়গায় আর ফিরে যাওয়া যায় না। ধাঁধার পথের মতো লাইনগুলি, ঠিক বিপদটিতে গিয়ে পেঁছায় হতভাগ্য।

সুনীতি শিউরে উঠল। হঠাৎ যেন মেয়েটার কথা মনে পড়ল সুনীতির, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে সে। দ্বিজু ভালোবাসে মেয়েকে, অনুপমও ভালোবাসে, রাখালও। যে কেউ একজন তাকে লালিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

সুনীতি চোখ তুলল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। রাখালের ঘরে খোলা জানালায় আলোর পাশে বইয়ের (ঠিক ঠাহর করা গেল না, আন্দাজ করা গেল) উপরে ঝুঁকে পড়ে আছে রাখাল।

ক্রসিংটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। গাড়িটা এবার সুতীব্র আর্তনাদ করে উঠল। শাড়ির আঁচলটা উড়ছিল বাতাসে। সিগন্যালের তার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আঁকশির মতো গলাবাঁকানো ছোট-ছোট লোহার খোঁটা থাকে লাইনের পাশে, তার একটায় আটকে গেছে আঁচল। নিচু হয়ে আঁচলাটা খুলতে গিয়ে ফেঁসে গেল সেটা। ভারি জরির কাজ-করা অনেকটা চওড়া আঁচলা।

গরম বাতাসের হল্কা লাগছে গায়ে।

রাখালের খোলা জানাটার দিকে চাইল সে। চিবুকটি একটু উত্তোলিত। একটা হাসি ফুটে উঠল সুনীতির মুখে : দুরন্ত ছেলে অভিমান করে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে মা যেমন হাসেন, স্বামী অভিমান করে টেবিলের কাজে ডুবে গিয়ে অভিমান ভুলে গেলে, পেছনে এসে দাঁড়িয়ে স্ত্রী যেমন নিঃশব্দে হাসে, কতকটা মেশানো হাসি।

গল্প শেষ হল। সিগারেট ধরালাম।

স্ত্রী বললেন, 'তোমার কি মনে হয় আত্মহত্যা করেছিল সুনীতি দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে ?'

উত্তর প্রতীক্ষার স্বাভাবিক সময়টা চুপ করে রইলাম।

পরে সারাদিন ধরে মনে হতে থাকল—অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে সুনীতি সারা জীবন।

পদ্মিনী

একডালা শহরটি কোলকাতার তিনশো মাইলের মধ্যে হলেও এখানকার ঋতু-বৈচিত্র্য কোলকাতায় দেখা যায় না। বর্ষায় এখানে একবেলায় ছ-সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়াটা অভূতপূর্ব কিছু নয়। শীতে এখানে বরফ পড়ে না বটে তাহলেও কোলকাতার শীতকে শুধু বাড়ালেই এ শীতের তুলনা হয় না। আর আছে কুয়াশা। বিকেলের কিছু পরে দেখে মনে হয় যেন সেটা কোলকাতার সান্ধ্য ধোঁয়া, রাত দশটায় পথের আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়, সকালে মনে হয় পৃথিবীতে এক আমিই আছি আর সব লোপ হয়ে গেছে। শহরের পুকুরগুলোর ধারে এবং নদীর বাঁধে এটা বিশেষ দর্শনীয়।

এ শহরে এসে আমার ধারণা হয়েছিল স্বাস্থ্যটা ভালো করা যেতে পারে। সে জন্য আমি নদীর বাঁধে কুয়াশা গ্রহণ করতে যেতাম এবং ছটা থেকে নটা পর্যন্ত বাঁধে ঘোরা- ফেরা করতাম।

বাঁধে যাওয়ার যে রাস্তাটা আমি ব্যবহার করতাম সেটা যেখানে বাঁধে উঠেছে তার কাছাকাছি একটা পার্ক আছে। কুয়াশাটা নিচে থেকে গুটিয়ে তোলা পর্দার মতো উঠে যায়। সে জন্য বাঁধে এবং রাস্তায় খুব সকালে প্রথমে শুধু নেপথ্যের মতো পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তারপর বুট ও ট্রাউজারের পা। ক্রমশ কাছের মানুষগুলির কাঁধ পর্যন্ত চোখে পড়ে, মাথার কাছে তখনও হাল্কা নিশ্বাসের মতো কুয়াশা লেগে থাকে। চারিদিকে তাকিয়ে ইয়োরোপীয় পোশাক-পরা পুরুষদের দেখতে পাওয়া যায়। তখন এ জায়গাটাকে ভারতের বাইরে কোনো শহর বলে মনে হয়। কিছু পরে অবশ্য শাড়ির উপরে ওভারকোট-পরা মহিলাদের দেখে মনে হয় কোনো শৈলাবাসে আছি। তখন পার্কটাও ভালো করে চোখে পড়ে। ত্রিভুজাকৃতি পার্ক—ত্রিভুজের এক-একটি বাহু পঞ্চাশ গজ পরিমাণ। ত্রিভুজটির জমি ঘাসে ঢাকা। দুটি-একটি ফার্ন গাছ আছে। একটি মাত্র সবুজ রঙ-করা পিঠতোলা লোহার বেঞ্চ আছে। আর ফার্ন গাছ-গুলির মাঝখানে একটি প্রস্তর মূর্তির লাল লোহা-পাথরের পাদপীঠ দেখতে পাওয়া যায়। পার্কে দু-একটি করে ছেলে মেয়ে এসে তখন ঘুরে বেড়ায়। তারপর কুয়াশার পর্দা আর একটু গুটিয়ে উঠলে খানিকটা হলুদে রোদ যখন ত্রিভুজের ভিজে ঘাসে এসে পড়ে এবং প্রস্তর মূর্তিটার পায়ের দিকটা দৃশ্য হতে শুরু করে, একটি বৃদ্ধ একটি রিকশা থেকে নেমে পাকিয়ে লাঠি-করা ছাতাটা

দুলিয়ে-দুলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। চিমসে পাকানো বুড়ো। মাফলার দিয়ে মাথা দিয়ে কান গলা সযত্নে ঢাকা। ছাইরঙের প্যান্টটা জুতো থেকে খানিকটা উঁচু। পায়ে জড়ানো খাকি ফ্লানেলের পট্টিটা চোখে পড়ে। বুড়ো ছাতাটা কখনো ঘাড়ে নেয়, কখনো ঝুলিয়ে রাখে কিন্তু ডানদিকে একটু কাৎ হয়ে ঘড়ির কলের মতো অবিরত হাঁটতে থাকে। প্রায় দশ মিনিট পরে আর একটি বৃদ্ধ আসে পুরনো মভ্ রঙের ঝরঝরে মোটরে। একটি চাকর এসে তার জন্যে একটা রবারের কুশন পাতে বেঞ্চটার উপরে, তার উপরে একটা কম্বলের আসন। তার উপরে দ্বিতীয় বৃদ্ধ উঠে বসে। পুরনো ওভারকোটটা দিয়ে যতদূর নিজেকে ঢাকা যায় ঢেকে নেয়।

আমি তখন পার্কের বিপরীত দিকে একটা অত্যন্ত নিচু চায়ের দোকানে বসে দেখতে পাই প্রস্তর মূর্তিটা ততক্ষণে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মূর্তিটার বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত ছোট ছোট শহরে সেই শহরের কোনো কৃতকর্মা পুরুষের মূর্তি থাকে, কিংবা কোনো লাট-বেলাটের। এটা কিন্তু তা নয়। একটি মেয়ে মাথায় এক ঝুড়ি মাটির ডেলা কিংবা পাথর এবং হাতে একটি ছোট কোদাল নিয়ে যেন অত্যন্ত দ্রুত কোথাও যাচ্ছে। এটা কারো মূর্তি নয়। একটা কাল্পনিক কিছু।

এমন একটি ছোট পার্ক যা শহরের মাঝখানেও নয় তাতে একটা ভাস্কর্য স্থাপন করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন চায়ের দোকানদার গল্পটা বলল ঃ বিশ বৎসর আগেকার ব্যাপার। নদীটা তখন এমন সংকীর্ণ ছিল না, আসল স্রোতটা ছিল এই শহরের পাশ দিয়ে। এবং এই একডালা শহর তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সেটা তো এই সেদিনের ব্যাপার। যুদ্ধের সময়ে এই শহরে একটা আমেরিক্যান হসপিট্যাল হয়েছিল। সেই আমেরিক্যান আহত এবং রুগ্নদের জন্য শহরটা দেখ-দেখ করে এক পণ্যশালায় পরিবর্তিত হয়েছিল। সেই পণ্যশালার চাকচিক্য যুদ্ধ থামার পরে সরকারকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই আমেরিক্যানরা নেই। দু-পাঁচজন সন্দেহজনক সাদারঙের বাঙালী ছেলে-মেয়ে, প্যান্টকোট পরার রেওয়াজটা আছে। তার অনেক আগে, বিশ বছর তো হবেই, নদীর পুরনো বাঁধ এই জায়গায় ধ্বসে যাচ্ছিল, শহরে জল ঢুকতে শুরু করেছিল। ছোট্ট মিউনিসিপ্যালিটি লোকজন নিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। বাঁধের এপারেও তখন এক কোমর কাদা জল। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটি হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বহু দূরস্থিত এক সরকারকে তার করতে লাগল। তখন স্কুল কলেজের ছাত্র ছেলে-মেয়ে ঝুড়ি-কোদাল, ইট-পাথর, কুড়ুল নিয়ে এগিয়ে এল। দিন রাত কামাই নেই। পালা করে তারা সারা-রাত ডে-লাইটের আলো জ্বালিয়ে কাজ করত। মিউনিসিপ্যালিটি ভরসা পেয়ে এগোল। অনেক পরে সরকার থেকে একজন পরিদর্শক ইঞ্জিনিয়ার

এসেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রাত বারোটায় সাত আটজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দল কাজে এসেছিল। ভোর রাতে নতুন দল আসবে। ভোর রাতের দল এসে দেখল বাঁধের মুখে যে জায়গাটায় কাজ হচ্ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর; নদীর জল হু-হু করে ঢুকছে, পাক খাচ্ছে। স্বেচ্ছা-শ্রমিকরা একজনও নেই। তাদের স্মৃতির জন্যই এই প্রতিমূর্তি।

গল্প শুনে মনটা পবিত্র হল।

এরপরে একদিন মূর্তিটিকে দেখবার জন্য পার্কে গিয়ে দাঁড়ালাম। মূর্তিটা দেখলাম আমার মতো অন্য লোককেও আকৃষ্ট করে। আমি যখন ট্যাবলেটে লেখা সন তারিখ মূর্তির নাম, শিল্পীর নাম প্রভৃতি পড়ছি আমার পাশে একটি ছোট ছেলে এবং তার বয়েসের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তাদের বেশভূষায় ধনাঢ্যতা আছে এবং তাদের পিতা-মাতার ঠাণ্ডা সম্বন্ধে সতর্কতার চিহ্ন আছে। তারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জুতোর মাথায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সম্ভবত মূর্তিটার মুখ কিংবা তার মাথার ঝুড়িতে কি আছে, কিছু আছে কি-না দেখবার চেষ্টা করছে।

এমন দুটি ছেলে-মেয়ে—দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

ছেলেটি চকোলেটের বড় একটা টুকরো মুখ থেকে বার করে বলল, 'আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?'

আমি মাস্টারমশাই নয়, আমার পোশাক দেখে হয়তো এদের ধারণা হয়েছে যে আমি তেমন কেউ। সে যাই হোক আলাপের সূত্রপাতে খুশি হলাম।

'কি দেখতে পাব ?'

'দড়ির দাগ।' মেয়েটি বলল।

'সে কি ?'

ছেলেটি বোকার মতো মুখ করে বলল, 'ফাঁসি হয়েছিল কিনা।'

আমি আর কথা না বলে ওদের থেকে সরে এসে বেঞ্চটায় বসলাম। সকালটার গলায় ফাঁস লেগে গেল।

কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। শুনতে পেলাম ওরা তখনও আলাপ করছে। ছেলেটি বলল, 'ফাঁসির সময়ে গায়ের জামা-কাপড় থাকে না। একটা কাপড়ের খোল পরিয়ে দেয় ?'

'তা আর হয় না।'

'হয়।'

'মেয়েদের বেলাতেও ?' অতটুকু মেয়ে কিন্তু এ ব্যাপারে বেশ হুঁশ হয়েছে।

ছেলেমেয়ে দুটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হলাম। অভিভাবক স্থানীয় কারো আলাপ-আলোচনা থেকেই এদের এত তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু ফাঁসির সঙ্গে এমন একটি শহীদ-মূর্তির যোগাযোগ জন্মেছে শিশুদের মনে, এটা আমাকে বিমর্ষ করে দিল।

কিছু পরে যখন ভাবছি ওপারের চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাব কিংবা এখানেই একটা সিগারেট ধরাব, এমন সময়ে সেই পাকানো-চিমসে বুড়োটি এল।

বুড়ো আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু হেসে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, এখানে? বেড়াতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা বেশ। দুয়ের চাইতে তিন ভালো। কিন্তু চারে ঝামেলা। দেখবেন যেন সঙ্গী সাথী আনবেন না।'

'সে রকম ইচ্ছা নেই'—একথা অস্ফুট স্বরে বললাম।

লোকটি তার প্রাত্যহিক ভ্রমণ শুরু করে দিল। কিছু পরে সে আমার সামনে একটু থেমে বলল, 'এ জায়গাটা বেশ নির্জন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও। এ রকম থাকার কারণ আমার ছেলেই এখন মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ্‌ অফিসার। কিন্তু নির্জনতার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'তা বটে। ছেলেমেয়েরা আসছে দেখলাম।'

'ওরা মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু পালিয়েও যায়।'

'কেন?'

'আর এক বুড়ো এখানে বসে থাকে দেখেছেন তো? সেই বুড়োর ভয়ে আসে না। শিশু মহলে ওর নাম মাছি-খাওয়া বুড়ো। খুব ভয় পায় ওকে এ শহরের ছেলেমেয়েরা। প্রকৃতপক্ষে ওর ভয়েই গত সাত-আট বছর ধরে এ পার্কটুকুতে ওদের উপদ্রব নেই সকালবেলায়।'

সেই নোংরা মভ রঙের মোটরটা এসে থামল, এবং সভৃত্য দ্বিতীয় বৃদ্ধ এল। তাকে ঠিক মতো বসিয়ে দিয়ে চাকর চলে গেল। বৃদ্ধ আমার দিকে কয়েকবার আড় চোখে চেয়ে নিয়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসল। শুধু তার গলাটা পলিত-কেশ মাথা সমেত শরীরটা থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে রইল। চোখ দুটি ঘোলাটে, দৃষ্টিশক্তি নেই বলে মনে হয়। ফুসফুসে বোধ হয় কিছু জমে আছে, নাক দিয়ে যে বাতাসটুকু যায় তা যথেষ্ট নয়। মাঝে-মাঝে ঠোঁট দুটি মেলে খপ্‌-খপ্‌ করে বাতাস নিতে হয় তাকে। আমার হাসি পেল—এই ব্যাপারটাকেই ছেলেরা মাছি-ধরা বলে।

প্রথম বৃদ্ধ এসে দ্বিতীয়টিকে বলল, 'দেখো দাদা, এই ভদ্রলোককে বলছিলাম আমরা নির্জনতা পছন্দ করি।'

'তা করি।'

'আর বললাম, মাছি-ধরা বুড়ো আছে বলেই ছেলেমেয়েদের উপদ্রব নেই।'

দ্বিতীয়-বৃদ্ধ বেশ তৃপ্তি সহকারে কিন্তু নীরবে হাসল।

'তুমি তো পাহারাদার।'

'তা বৈকি। দ্বিতীয় বৃদ্ধ গ্যাড়-গেড়ে গলায় বলল।

কিছুকাল নীরবতায় কাটল। প্রথম বৃদ্ধ পাক খেতে লাগল, মাপা পথ, মাপা সময়। দ্বিতীয় বৃদ্ধ একরকমের পাখির মতো গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে খপ্‌-খপ্‌।

অবশেষে আমি বললাম, 'একটা কথা কি জানেন, এখানে তারা যেমন আপনার ভয়ে আসে না, তেমনি কোনো-কোনো চিন্তা যদি তাদের মনে না-আসত কারো-কারো ভয়ে, ভালো ছিল। এমন একটি শহীদ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যখন মন পবিত্র জীবনবোধে পূর্ণ হওয়া উচিত তখন যদি ছেলে-মেয়েরা ফাঁসির কথা ভাবে, সেটা ভালো হয় না।'

'হুম্‌।' প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'ওঁকে বলুন, দাদাকে বলুন।'

প্রথম বৃদ্ধ আবার পাক খেতে চলে গেল। দ্বিতীয়জন কিছু না বলে অদৃশ্য মাছি ধরার চেষ্টা করল কয়েকবার।

প্রথম বৃদ্ধ ফিরে এসে বলল, 'তা হলে আর বলছি কি মশাই, বিশ বছর আগে ফাঁসি হল, এই মূর্তিটি যে দিন স্থাপিত হল ঠিক তার সাতদিন পরে। এখনও ছেলে মেয়েরা আলোচনা করে। বড়োরা নতুন কিছু পায় না। বাচ্চারা তো মশাই প্রথম শোনে জ্ঞান হবার পর, আর প্রত্যেকের বেলাতেই এই প্রথম শোনার বিস্ময়টা লাগে।'

'ফাঁসিটা কি কোনো স্ত্রীলোকের হয়েছিল ?'

'তা বৈকি।' দ্বিতীয় বৃদ্ধ গর্বিত বিনয়ের ঢঙে বলল।

আমার মনে হল ছেলেমেয়েদের মনে ফাঁসির সঙ্গে এই প্রতিমূর্তি জড়িয়ে যাওয়ার কারণটা যেন বুঝতে পারলাম। একই সময়ের বলেই তারা দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ কল্পনা করেছে। ইতিহাসের ব্যাপারে এরকম ভুল আমাদের প্রায়ই হয়।

প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'উনি বলছেন ফাঁসি দেয়াটা অন্যায় হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'ঠিক তা বলিনি বটে তবে আমার মনে হয় ওটা রদ করাই উচিত।'

'হুঃ।' দ্বিতীয় বৃদ্ধ বিস্মিত হল।

প্রথম বৃদ্ধ বলল, 'ভেবে দেখতে গেলে তা বলা যায়। অন্তত এ ক্ষেত্রে অন্যায়ই হয়েছিল।'

দ্বিতীয় বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি সরকারী উকিল ছিলাম না ? বলো ছিলাম কিনা ?'

'তা ছিলে।'

'তবে ? আর কে আমার চাইতে বেশি জানে ?'

'কিন্তু আমিও মামলাটার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি আসামী পক্ষের উকিলের মুহুরী ছিলাম।'

'তা ছিলে।'

'তবে আমিও কিছু কিছু জানি।' এই বলে দ্বিতীয় বৃদ্ধ কতকটা যন্ত্র-চালিতের মতো একটা পাক ঘুরে এসে বলল, 'ওটাকে এখনও আমি সন্দেহজনক বলে মনে করি।'

সরকারী উকিল বলল, 'রাত দুটোয় আর্টিস্টের ঘরে ঢুকে রিভলবার দিয়ে তাকে হত্যা করা হল। তবু বিশ বছর ধরে তুমি এই কথাই বলছ।'

'তা বলছি। কিন্তু তোমার প্রধান সাক্ষী যে অন্য মেয়েটি, সে কি বলেছিল?'

'বলেছিল আর্টিস্ট আর মারগারেট লাহিড়ী ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল। আর্টিস্ট দেবনাথ রিভলবার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

'তুমিই বলেছ যে তুমি সেই মেয়েটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলে।'

'তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়া বলে না। সেই অন্য মেয়েটি দুর্ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ঘটনাগুলির কোনো অর্থ করতে পারছিল না। সব ঘটনার অর্থ কি সকলে করতে পারে? ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাকে আমার মতটা বলেছিলাম। তা ছাড়া একে আত্মহত্যার চেষ্টা কেউ মনে করবে না।' সরকারী উকিল আমার দিকে ফিরে বলল, 'মশাই চিরকাল ধরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে রাত দুটোয় কেউ পাশের ফ্ল্যাটে যায় না।'

যুক্তিটা যে অকাট্য এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না।

কিন্তু উকিলের মুহুরীও কম যায় না। সে বলল, 'তোমার সেই অন্য মেয়েটি কি করে রাত দুটোয় সাক্ষী হওয়ার জন্যে অকৃতদার একজন আর্টিস্টের ঘরে থাকে?'

'তোমার উকিল যে এমন প্রশ্ন তুলবে তা কি আর আমি আন্দাজ করতে পারিনি? সেই জন্যেই আমি প্রমাণ করেছিলাম সেই মেয়েটির সঙ্গে আর্টিস্টের বিবাহ স্থির হয়েছিল।'

'তাতে সেই মেয়েটিকে খুব সচ্চরিত্র বলে মনে করা যায় না।'

সরকারী উকিল হেসে বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু রাত দুটোয় রিভলভার নিয়ে প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে ঢুকবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটাই তো বলতে পারেনি তোমার উকিল।'

'তা পারেনি। কিন্তু আমি পারি।'

'বেশতো আমাকে শুনিয়ে কি হবে। এই ভদ্রলোককেই বলো না হয়।'

'তা পারি বৈকি। বুঝলেন মশাই আসলে সেটা মারগারেট লাহিড়ীর ফ্ল্যাটই ছিল।'

'প্রমাণ?'

'মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় পাশাপাশি দুখানা ফ্ল্যাটের ভাড়াটে হিসেবেই মারগারেট লাহিড়ীর নাম লেখা আছে। মিউনিসিপ্যালিটির ফ্ল্যাট। ভাড়া

ট্যাক্স মারগারেটই দিত দুর্ঘটনার তিন বৎসর আগে থেকে। এমন কি তার ফাঁসি হয়ে যাবার পরের মাসেও তারই নামে বিল করেছিল মিউনিসিপ্যালিটি।'

'এ কথা তোমার উকিল বললেই পারত।'

'বলা উচিত ছিল।'

'লাভ হত না। ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতাম,' বলে সরকারী উকিল হাসল। মামলা পরিচালনার সময়ে যদি সে এ রকম হাসি হেসে থাকে তবে তাতেই আসামী পক্ষের সাক্ষীদের গুলিয়ে যাওয়ার কথা।

সরকারী উকিল বলল, 'বড়লোকরা বাগানবাড়ি কিনে দেয়, মেয়েছেলের নামে ফ্ল্যাট ভাড়া করে?'

'করে।'

উকিলের মুহুরী কিছুকাল দমে রইল, যেন কোনো একটি অভ্যস্ত যুক্তি হারিয়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে অঙুল দিয়ে কপাল ঠুকলে দু-একবার তারপর বলল, 'বড়লোকে দেয়, কিন্তু আর্টিস্ট অত্যন্ত গরীব ছিল।'

সরকারী উকিল একটু স্তম্ভিত হল, মুহূর্তকাল পরে বলল, 'ইট্ ইজ নট ইন দি এভিডেন্স মাই লর্ড।'

'কি বললেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সরকারী উকিল বলল, 'আর্টিস্ট যে গরীব তা প্রমাণিত করা হয় নি।'

সরকারী উকিল যে এই জায়গায় এসে যুক্তিতে এবং ঘটনায় নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে আইনের কূট কৌশলে আশ্রয় নিল এটা বুঝতে পারলাম।

কিন্তু ততক্ষণে আমাদের পার্কটায় রোদ উঠে পড়েছে, চরাচর স্পষ্ট হয়েছে। জেলেরা আদুড় গায়ে মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে পার্কের পাশ দিয়ে ছুটছে। রিক্শা প্যাঁক-প্যাঁক করে ছুটছে। কতগুলি মজুর হেঁয়ো-হেঁয়ো করে কি একটা ঠেলা গাড়ি করে ঠেনে আনছে। আমি উঠে পড়লাম। ওরাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাসায় ফিরে ভাবলাম কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার! বিশ বছর আগে একটি ফাঁসি হয়ে গেছে তাই নিয়ে একটি ছোট ছেলে সমবয়স্কা একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করছে বলে খারাপ লেগেছিল, কিন্তু সকালের আবহাওয়াটাকে গরম একটি আদালতে পরিণত করছে শহরের বৃদ্ধতম দুটি লোক, এটাই বা কি রকম ব্যাপার। এ যেন স্মৃতির পীড়নে দগ্ধ হওয়া।

কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে বিস্ময় বোধ হচ্ছে পরদিন সকালে অভ্যস্ত পথে না বেরিয়ে আমি যেন গল্পটার বাকিটুকু শুনবার জন্যই পার্কে গিয়েছিলাম। কৈশোর এবং বার্ধক্যের মতো আমার প্রৌঢ়ত্বকেও খুন-অপরাধ-ফাঁসি একটি লোভের মতো টেনেছিল।

আবহাওয়াটা আগের দিনের মতোই। উকিলের মুহুরী পাক খাচ্ছিল সে বলল, 'সরকারী উকিলের কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন?'

'অন্তত একটা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। আর্টিস্টের পক্ষে কারো জন্যে দুখানা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আর্টিস্টরা সাধারণতই গরীব।'

'অবশ্য এ ক্ষেত্রে আর্টিস্টকে টাকা দেয়া হয়েছিল, একসঙ্গে পাঁচ হাজার। কিন্তু সেটা তাঁর মৃত্যুর পরে। টাকাটা মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছিল। কিন্তু আর্টিস্টের কোনো ওয়ারিশ ছিল না বলে পাঁচ বছর টাকাটা পড়েছিল, অবশেষে স্থির হয় এই পার্কটা করা হবে, বাকি টাকায় এই মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হবে। সেটাই যথোপযুক্ত ব্যয়। কারণ এটা সেই আর্টিস্টেরই তৈরি এবং বলা যায় মাস্টারপিস। এবং তার মাস্টারপিসকে রক্ষা করার চাইতে তাকে অন্য আর কোনো উপায়ে সম্মান করা যায় ?'

মূর্তিটার একটা নতুন অর্থ আমার চোখে ধরা পড়ল। আমি বিশ বছরের আগে মৃত আর্টিস্টের জন্য দুঃখবোধও করলাম।

এই মূর্তি সেই আর্টিস্টের তৈরি ?'

'হ্যাঁ। বেচারা। যেদিন এই মূর্তিটি শেষ করে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে সঁপে দেয় সেই রাত্রিতে মারা যায় সে।'

'আহা !'

'ব্যাপারটা দুঃখের। জীবিত অবস্থায় আর্টিস্ট দেবনাথ এমন কিছু সম্মান পায়নি। এখন কোলকাতার দু-একজন তাকে আর্টিস্ট বলে স্বীকার করছে ঃ আসলে পদ্মিনীর ঘটনাই দুঃখের।'

'পদ্মিনী।'

'হ্যাঁ, তার নাম পদ্মিনী মার্গারেট লাহিড়ী বলে আমি জানতাম। কিন্তু আর কেউ তা মানতে রাজী নয়। ফাঁসি দেয়ার আগে ওরা তার নাম দিয়েছিল পলিন মার্গারেট লাহিড়ী। সরকারী উকিল শুনলে রীতিমতো বিদ্রূপ করেন। কিন্তু বাঙালীর মেয়ের নাম পদ্মিনী হলে দোষ কোথায় ?'

'ক্রিশ্চান তো ?'

'ক্রিশ্চান তো বটেই। এমন কি লোকে বলত ওর বাবা কিংবা মা কেউ ব্রিটিশ ছিল। এত ফরসা এবং এত পরিষ্কার নাক-মুখ ছিল তার। কিন্তু তাই বলে তার নাম পদ্মিনী হতে আটকায় কোথায় ?

উকিলের মুহুরি আজ এত উত্তেজিত হয়েছে যে তার নৈমিত্তিক পাক খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'সরকারের উকিলের বক্তৃতা শুনবার আগে, স্যার, আমার আর্গুমেন্টটা শুনুন।' যেন সে কোনো আদালতে বক্তৃতা দেবে এমনি একটা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে গলগল করে বলে গেল ;

পদ্মিনীই তার নাম ছিল এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি তখন এই পাশের গাঁয়ের স্কুলের ফুটবল ক্যাপ্টেন। টুর্ণামেন্টে ফাইনাল খেলায় আমাদের স্কুলের সঙ্গে একডালা টাউন ক্লাবের খেলা ছিল। সে সময় একডালা

টাউন ক্লাব সারা জেলার সেরা টিম। সারা জেলাকে হারিয়ে এসে কোলের কাছে এক নাবালক দলের কাছে হারবে? সেদিন সারা শহর মাঠে ভেঙ্গে পড়েছিল। আর আমাদের সেই গেঁয়ো স্কুল জিতল। আমাদের দলের জন পঁচিশেক দর্শক আর দশজন খেলোয়াড় শীল্ড নিয়ে গেল। শহরের এলাকায় তারা চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু গ্রামে গিয়ে তারা আনন্দ করবে এ তো নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু, ইয়োর অনার, লক্ষ্য করেছেন আমি দশজন খেলোয়াড়ের কথা বলেছি। ঠিক বলেছি, ওটা আমার ভুল নয়, কারণ দলের ক্যাপ্টেন আমি একখানি ফ্র্যাকচারড হাঁটু নিয়ে পড়ে রইলাম। শহরের জনতা ঘিরে ধরবার আগে ওদের পালাতে বলে দিয়ে গড়াতে গড়াতে একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। যখন জ্ঞান হল দেখলাম আমি হসপিটালে। দুঃসহ জ্বর। ততোধিক অসহ্য বেদনা। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্য করতাম একটা শুভ্র করতল আমার বুকে কপালে সস্নেহ স্পর্শ দিচ্ছে। আমার দুচোখে জল ভরে উঠত। নার্স, নার্সই তো। কিন্তু এই মফঃস্বল শহরের এই হসপিটালেও একাধিক নার্স আছে। কিন্তু অন্য নার্স চোখের সম্মুখে ঘুরে বেড়ালেও দিনরাত্রিতে পাঁচ সাত ঘণ্টা যেন অন্য রোগীকে অবহেলা করে এই শুভ্রকরতল বিশিষ্ঠ নার্সটি আমার জন্যই রয়ে গেছে।

প্রায় মাসাধিককাল পরে আমার ছুটি হল হসপিটাল থেকে। যেদিন আমার বাড়ি থেকে লোক আসবার কথা তার আগের দিনই আমি বললাম —নার্স, আমি আজই যাব।

—হেঁটে যাবে কি করে?

—এই তো গ্রাম, কেন পারব না।

নার্স কিছু ভাবল তারপর বলল—তা তুমি পারবে। পারাই ভালো।

বিকেলে হসপিটাল থেকে বেরিয়েছি। আমার গায়ে খেলার পোশাক। যেন এতদিন পরে শীল্ড জেতার অধিনায়ক বাড়ি যাচ্ছে। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেলাম। দেখি নার্স। তখনও তার মাথায় বনেট বাঁধা। সাদা পোশাকে তাকে যে কি অপূর্ব বোধ হল তা যেন সবটুকু অনুভব ধরা যায় না।

—চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

একখানা মাঠ, একটি ছোট খাল, তারপরই আমাদের গ্রাম। পাশাপাশি দুজনে হাঁটছি। তখন আমার বয়স হদ্দ সতেরো আর তার বয়স আঠারো উনিশ। সহসা শূন্য আকাশ থেকে ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল। আমার খেলার পোশাক ঝক্‌ঝকে করে কাচা ছিল ভিজে যেতে ভালোই লাগল। ফুটবলের পোশাকে জল-কাদা না থাকাই ব্যর্থতা। তার পোশাক ভিজল। সাদা মসলিনের পোশাক ভিজে উঠতেই আমার মনে হল তার সেই আঠার বছর থেকে পদ্মগন্ধ পেতে লাগলাম।'

মুহুরীমশাই একটু থেমে, কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলল, 'ভাগো এখন

সরকারী উকিল নেই। অন্যদিনের চাইতে আপনার সঙ্গে আগে দেখা হল বলে বলতে পারলাম। সরকারী উকিল হেসে বলে—ও নাকি আমার বয়সের ভুল।'

'তা হবে কেন? ওরকম কোনো পাউডার থাকতে পারে যার হাল্কা গন্ধ হসপিটালের তীব্র এণ্টিসেপ্‌টিকের গন্ধে ডুবে থাকে। জলে ভিজে গন্ধটা প্রকাশ পেয়েছিল।'

মুহুরী থেমে চিন্তা করে বলল, 'এ রকম সম্ভাবনা আমার মনে হয়নি, ভেবে দেখব। কিন্তু তাকে আমি পরবর্তী জীবনে পদ্মিনী বলে সম্বোধন করেছি এবং সাড়া পেয়েছি। সাড়া পাওয়াটা বোধ হয় ঠিক কথা হল না। বরং সে-ই পথে যেতে-যেতে মোটর গাড়ী থামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। পথ যদি একই হত সে মোটর দাঁড় করাতোই। কেমন আছি, বউ কেমন, ছেলেপিলে কেমন আছে এ খবর সে নিতো। তখন অবশ্য সে হসপিট্যালের মেট্রন।

'কিন্তু মেয়েটার কপাল ভালো ছিল না। ছোট শহর, মেয়েদের স্বাধীন উপজীবিকাই আলোচনার কারণ হতে পারে। তার উপরে সে খৃষ্টান। অত্যন্ত রূপসী। একা-একা মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টার্সে একটি ঝি-র ভরসায় বাস করে। কাজেই সে যাই করত সেটা শহরের সর্বত্র আলোচনার মতো ছড়িয়ে পড়ত। কিছুই সে গোপন রাখতে পারত না। কিছুই গোপন থাকত না।

'একবার এই শহরের অদূরে একটি এরোপ্লেন বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে। চালক ছাড়া আর একজন মাত্র আরোহী ছিল। চালক সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায় কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিকে হসপিট্যালে আনা হল। তাকে সেবা করতে শুরু করল পদ্মিনী। সে কি সেবা। প্রথম-প্রথম লোকে বলত প্রেমে পড়েছে। হসপিটালের ডিউটির সময়টুকু ছাড়াও দিনরাত্রিতে পদ্মিনীর বিশ্রাম ছিল না। সে যেন কোনো তপস্যায় নিরত। তার চেহারা শুকিয়ে গেল। শেষ দিকে দেখলে মনে হত সেই রোগী। কিন্তু প্রেমে পড়ার ঘটনাটা লোকে আর বলতে পারল না। বিষাক্ত দুর্গন্ধ ক্ষতের সেবা করতে-করতে প্রেম জন্মায় না এটা লোকে বুঝতে পারল। তখন পদ্মিনীর প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। পৃথিবীর হিসাব নিকাশ করার বুদ্ধি হয়েছে তার। তবুও যারা প্রেমের কথা বলত তারা কেউ কেউ অতি বুদ্ধিমানের মতো বলতে শুরু করেছিল—এতদিনে তোমরা পদ্মিনীর স্বামীকেই দেখতে পেয়েছ। একে ফেলেই চলে এসেছিল সে, এখন অনুশোচনায় এত করছে। লোকের কিরকম মতি হতে পারে অন্যের সম্বন্ধে গল্প করার ব্যাপারে তারই পরিচয় এটা।'

আমাদের বিস্মিত হতে হল। সরকারী উকিল কখন এসে যোগ দিয়েছে বুঝতে পারিনি। সে কেশে বলল, 'কাগজপত্র ভালো করে ঘেঁটে এলাম হে। তা শোনো, তোমার এই গল্পের উত্তর দিতে আজ আমি পারব। রাত্রিতে এটা ভেবে রেখেছি। এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এই: মারগারেটের স্বামী এমনি কোনো এক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিল এবং মারগারেট তার সেবা করতে পারেনি।

কাজেই এই বৈমানিকটার সেবার মধ্যে দিয়ে সে স্বামীকে সেবা করার তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করছিল।'

শুধু মুহুরী নয়, সরকারী উকিলের এই বিশ্লেষণে আমি বোকার মতো তার দিকে চেয়ে রইলাম।

'আপনি কি বলেন ?' দুজনে সমস্বরে প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'একজনে অপরজনের ব্যক্তিত্ব এমন করে আরোপ করা যায় কিনা এটা চিন্তার বিষয়।'

মুহুরী বিচলিত হয়েছিল। সে এই নীরবতার অবসরে এক পাক চক্কর মেরে এল।

সে আমাদের সম্মুখে এসে বলল, 'আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ড খুব খাঁটি কথা বলছেন এতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হচ্ছে।'

'কি রকম ?'

'আমরা সবাই এতদিনে জানতে পেরেছি সেই বৈমানিকটি পদ্মিনীর স্বামী নয়, স্বামীর বন্ধুও নয়। এবং তাকে যখন পদ্মিনী সেবা করেছিল তখন পদ্মিনীর বিবাহ হয়নি। অথচ তাকে স্বামীর মতো সেবা করেছিল। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি স্বামী বলতে পদ্মিনীর কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেটা সেই বৈমানিকের মধ্যে ছিল। পরে এটা আরও স্পষ্ট হল যখন পদ্মিনী সার্কাসের সেই লোকটিকে বিবাহ করল। সার্কাসের লোকটি, বৈমানিক এবং একটি পা-ভাঙ্গা ফুটবল ক্যাপ্টেনের মধ্যে যা সাধারণ গুণ তার কাছেই পদ্মিনী আত্মদান করতে পারে দেখা যাচ্ছে। কি সেটা ?'

আমি বলালম, 'পদ্মিনী বিবাহ করেছিল ?'

'হ্যাঁ। শীতকালে সেবার রিংলিং সার্কাস এই শহরে এসেছিল। সেই দলে একটি লোক ছিল যার কাজ ছিল পেশী প্রদর্শন করা। তারা আসবার পাঁচ সাতদিন পরে একথাটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে, পদ্মিনী তাকে বিয়ে করছে। মিউনিসিপ্যালিটি, দশজন ইতর ভদ্র, স্কুল-কলেজের ছাত্র আপত্তি করবে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিল। আত্মীয়রা একটা অনুপযুক্ত বিবাহে যেমন আপত্তি করতে পারে তেমনি সকলে আপত্তি করবে বলে মনে হল। কিন্তু পদ্মিনী কারো কথাই গ্রাহ্য করল না। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, খপ্ করে বিয়ে করে বসল।'

সরকারী উকিল বলল, 'এর থেকেই বুঝতে পারছ কি তার রুচি।'

'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। কিন্তু সার্কাসওয়ালা ম্যাট্রিক পরীক্ষাও পাশ করতে পারেনি। বংশ ইত্যাদির খবর কেউ নেয়নি। বিবাহের পাত্র হিসাবে পদ্মিনীর পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত। কিন্তু তার একটি সম্পদ ছিল যা আমাদের এই শহরে তখন ছিল না এখনও নেই।'

'সেটা কি বীরত্ব ?'

'তা না হোক। শক্তি, স্বাস্থ্য কিংবা পদ্মিনী যাকে পুরুষোচিত মনে করত তেমন কিছু। তার তো অর্থের অভাব ছিল না। নিজে সে তখন হসপিট্যালের মেট্রন। মোটর চড়ে বেড়ায়। বাজে ব্যয় না করে টাকা জমিয়েছে। স্বামী উপার্জন করে খাওয়াবে তার যেমন দরকার ছিল না, তেমনি ছিল না স্বামীর পরিচয়ে পরিচয় দেয়ার তাগিদ। সমাজের কোনো মানদণ্ড অনুসারে নিজের রুচিকে বাঁকানো তোবড়ানোরও দরকার ছিল না।'

সরকারী উকিল বলল, 'স্বামী কি শুধু দেহমাত্র?'

'তুমি এরকম কথাই জজকে বলেছিলে। কিন্তু তুমি কি মনে কর স্কুল কলেজে না পড়লেই মন বলে কিছু থাকে না।'

'অপরিণত মন থাকে।'

'কিংবা অন্য কথায় বলো সরল মন থাকে। সে যাই হোক সেটা তো চিরস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সার্কাস এখানে একমাস ছিল, এবং দল চলে যাওয়ার পর লোকটি আর একমাস ছুটি নিয়ে পদ্মিনীর ফ্ল্যাটটায় বাস করেছিল।'

'তারপরেই সম্বন্ধ ফুরালো। যাদের এত সহজে সম্বন্ধ হয়, এত সহজে সেটা ফুরোয়, তাদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?' বলে সরকারী উকিল আমার দিকে চাইল। এবং আমার উত্তরের আশায় অপেক্ষা করতে সে খপ্-খপ্ করে নিশ্বাস নিতে লাগল।

'সম্বন্ধ ফুরালো এ তুমি কি করে বলছ?'

'নতুবা আর্টিস্ট দেবনাথ আসছে কি করে।'

'তা এসেছিল কিন্তু পদ্মিনী মৃত্যুর আগে তার সব কিছু সম্পত্তি ট্রাস্ট করে দিয়ে গেছে। এবং ট্রাস্টিদের একজন হিসাবে আমি জানি আরও পাঁচ বছর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে সেই সার্কাসের লোকটির জন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে অর্থাৎ তার মৃত্যুর--'

'ফাঁসি বলো।'

'মৃত্যু কিংবা ফাঁসি। তার পঁচিশ বছরের মধ্যে সেই সার্কাসওয়ালা না ফিরলে সব সম্পত্তি হসপিট্যালকে দেওয়া হবে।'

'তাহলেই বোঝ। ওদিকে নামে এবং আইনতঃ স্বামী রইল আর একজন। সার্কাসওয়ালাকে যদি সে ডাইভোর্স করত তাহলেও না হয় বলা যেত খৃষ্টান সমাজ অনুসারে সে এমন কিছু করেনি।'

সওয়ালে নিজের কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এরকম মুখভঙ্গী হল মুহুরীর। সে মুখে একটা নির্লিপ্ততা আনার চেষ্টা করতে করতে তার দৈনন্দিন পাক খেতে শুরু করল।

কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই তার চিন্তাকে সে বোধ হয় গুছিয়ে তুলল। আমাদের দখল করা বেঞ্চটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বেশ তো তার ফাঁসির পাঁচ বছরের আগেকার কথাই ধরো না!'

'তা ধরো। তবে মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে না হলেও মার্গারেট তখনও সেই সার্কাসওয়ালার স্ত্রী।'

'পদ্মিনী-মার্গারেট কারো স্ত্রী ছিল কিনা এটা আদৌ বক্তব্য নয় আমার। আমি দেবনাথের কথাই বলছি। সেরেস্তাদারের ছেলে দেবনাথ। তার বাবা বদলী হয়ে গেল কিন্তু সে এই শহরেই থাকল। আঠারো থেকে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত। তারপর মদ-গুলির আড্ডায় ঘুরতে লাগল।'

'তা লাগল। তুমি কি বলতে চাও যে এরকম একটা লোককে খুন করে মার্গারেট কোনো অন্যায়ই করেনি?'

'না আমার বক্তব্য শেষ পাঁচ বছর। তখন পদ্মিনী তার পাশের ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে এবং সেই ফ্ল্যাটে দেবনাথ থাকে। সত্যের খাতিরে এ কথা বলতে হবে দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসার পথ ছিল। এবং দুজনে প্রকৃতপক্ষে একই ফ্ল্যাটে বাস করলেও বাইরে থেকে লোকের তা বুঝবার উপায় ছিল না। যেবার মদের দোকানদার বাকি শোধ করার জন্য দেবনাথের মাথায় ডাণ্ডা মেরেছিল সেই থেকে দুজনের পরিচয়। দেবনাথ আহত অবস্থায় হসপিট্যালের মেট্রনের চোখে পড়েছিল।'

'এবং তারপরে দেবনাথ কিড্‌ন্যাপড্‌ হল।'

'কিন্তু দেবনাথ তো শহরের সর্বত্রই ঘুরে বেড়াত।'

'গুম করা মানে কি মানুষকে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা?' সরকারী উকিল হাসল। 'মনে রাখতে হবে সাঁইত্রিশ বছরেও মার্গারেটের তুল্য সুন্দরী তখন এ শহরে কেউ ছিল না।'

'কিন্তু একথা তো স্বীকার করবে তুমি, দেবনাথ সেই পাঁচ বছর কোনো মদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি করেনি।'

'তা করেনি। কারণ ঘরেই পেতো।'

'তা পেতো। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দেবনাথ আর কিছু করেছিল। তার মৃত্যুর পর পুলিশ তার ঘরে অনেক ছবি পেয়েছিল, অনেক ভাস্কর্যের মূর্তি।

'সেগুলি কি অশ্লীল নয়? যে মেয়ে নিজের অমন অশ্লীল ছবি অন্য কাউকে আঁকতে দেয় তার দুবার ফাঁসি হওয়া উচিত।'

'কোলকাতার সমঝদাররা এখন তা বলছে না।'

'সেই ছবিগুলি যাকে দেখে আঁকা হয়েছিল সে তো রক্তেমাংসে তাদের সামনে ঘুরে বেড়ায়নি তাদের কাছে ছবি তো অমন হাল্কা হাওয়ায় তৈরি বলেই মনে হবে।'

কথাটার সত্যতা বোধহয় মুহুরী মশাই মেনে নিতে বাধ্য হল।

সরকারী উকিল যেন আসামীর প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখাবে বলে মনে হল। সে বলল, 'অবশ্য দেবনাথের পক্ষেও কাজটা ভালো হয়নি, অন্তত সুবিবেচনার কাজ হয়নি। এত সবের পরও ওভাবে বাগদত্তাকে বাড়িতে নিয়ে

যাওয়াটা মূর্খতাই হয়েছিল। আমি দেবনাথকে ভালো লোক বলি না। এবং একে আমি সাডেন এ্যাণ্ড গ্রেভ্ প্রভোকেশন মনে করতে পারতাম; তাতে মার্গারেটের গুরুত্বও কম হত, যদি মার্গারেট দেবনাথের সাধ্বী স্ত্রী হত।'

মুহুরীমশাই পাক খেতে লাগল।

এক সময়ে আবার সে বলল, 'অবশ্য আমাদের পক্ষের বক্তব্য এটা আত্মহত্যার চেষ্টাই ছিল। এবং দেবনাথের ঘরে যাওয়ার কারণ আত্মহত্যার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি দেবনাথের মনে কোনো অনুশোচনা জাগিয়ে তাকে ফেরানো যায়।'

'আইনে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা থাকে না।'

মুহুরী মশাই বলল, 'কিন্তু একটা ঘটনা মামলার সময়ে কোনো পক্ষই উত্থাপন করেনি।'

'মার্গারেট তার কয়েকদিন আগে থেকেই শহরের শিক্ষিত লোকদের কাছে দেবনাথের ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করত—সেই কথা তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঘটনাটা না বলে ভালোই হয়েছে। তোমার উকিল গোপন করে ভালোই করেছে। তাতে প্রমাণ হত মার্গারেট তাকে হত্যা করার আগেই তার দুর্নাম করে বেড়াচ্ছিল। বিদ্বেষ আগেই তৈরি হয়েছিল এটাই প্রমাণ হত।'

'তা হত না। কারণ যত বিদ্বেষ থাক এই শহীদ-মূর্তিটার জন্য তখনও মার্গারেট দেবনাথের সম্মুখে সিটিং দিচ্ছে।'

'তা দিচ্ছে এবং বলে বেড়াচ্ছে দেবনাথের ছবি বা মূর্তি কিছুই নয়।'

'সে নিজে কতদূর বলেছিল তা আমি জানি না। তবে একথাটা ঠিক শহরের পণ্ডিত ব্যক্তিরা সবাই বলেছিল দেবনাথের ছবির এক পয়সাও দাম নেই।'

কথার মাঝখানে আমি কথা বললাম। বললাম, 'কিন্তু তখন এই মূর্তিটা তৈরি করার জন্যে দেবনাথ, মিউনিসিপ্যালিটির অর্ডার পেয়েছিল। তাহলেই তো তাকে স্বীকার করা হল।'

মুহুরীমশাই আর যাই হোক উকিল নয়। অনেকক্ষণ ধরে গল্পের ধারা ঠিক রেখে কথা বলে যাবে এ বোধহয় সে পারে না।

হঠাৎ সে গল্পের অন্যত্র গিয়ে বলল, 'আমার দু-রকমই মনে হয় আজকাল। কখনো মনে হয় আত্মহত্যা করতেই গিয়েছিল সে, কখনো মনে হয় খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল!'

'তাহলে?' সার্থকতার আনন্দে সরকারী উকিলের কথাটা তার লম্বা গলার উপরে কাঁপতে লাগল।

মুহুরীমশাই বলল, 'কিন্তু সে যাই হোক ঘটনার মূলে যে সেই অন্য মেয়েটির প্রতি বিদ্বেষ এ আমি মানতে পারি না সব সময়ে।'

'স্ত্রীলোকের এরকম বিদ্বেষ থাকে।'

'কিন্তু যখন মামলা চলছে তখন এই মেয়েটির কথা তুলতে পদ্মিনী খুব সহজ ভাবে বলেছিল—ওটা একটা সাধারণ মেয়ে। ও কিছুই নয়। বড় একটা ক্যানভাস শেষ করলে দেবনাথ ও রকম মাৎলামো করত দু-একদিন।'

'তুমি কি সন্দেহ করো অন্য মেয়েটার বাগদত্তা হওয়ার কথাটা মিথ্যা।'

'সে রকম সন্দেহ আমার বরাবর আছে। এই মূর্তিটা শেষ করেছিল দেবনাথ মৃত্যুর আগের দিন। এবং এটাকে নেয়া হবে কি হবে না এই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনাররা তর্ক শুরু করেছে। মূর্তিটা শহীদ হওয়ার পক্ষে একটু নির্লজ্জ। আমরা সকলে মূর্তিটার দিকে চাইলাম। এখন আর নির্লজ্জ মনে হয় না বরং রমণীত্ব এমন পরিস্ফুট না হলে এমন করুণ মনে হত না।'

মুহুরী বলল, 'এত বড় একটা পাথুরে কাজ শেষ করে দেবনাথের মাৎলামোটা একটু বেশীই প্রকাশ পেয়েছিল সেই রাত্রিতে।'

'কিন্তু তাহলে হত্যা বা আত্মহত্যার কারণটা কি?' সরকারী উকিল অবিশ্বাসের ঢঙে প্রশ্ন করল।

মুহুরীমশাই-এর কষের দুপাশে কথা বলতে বলতে ফেনা জমেছিল। একটা ময়লা রুমালে ফেনা মুছে সে বলল, ফাঁসির দিন পনর আগে জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। হাইকোর্টে আপিল কিংবা ভাইসরয়ের কাছে দয়াভিক্ষা কোনোটাতেই রাজী হয়নি পদ্মিনী। তবু শুধু আলাপ করার জন্যেই গিয়েছিলাম। দেয়া নেয়ার কোনো খবরই ছিল না।

'চুপ করে থাকতে-থাকতে বলেছিলাম—শুনেছ, পদ্মিনী, দেবনাথের সেই শহীদ-মূর্তিটা ওরা নেবে। পাঁচ হাজার টাকাও ওরা মঞ্জুর করেছে।

'—কি বললে? আবার বলো। বলল পদ্মিনী।

'আবার বললাম আমি।

'শুনে কি যে ভাবল। সামান্য একটু হাসল। তারপর বলল—পাগল। তারপর গলায় যে ছোট্ট সোনা আর এবনিতে তৈরি ক্রশটা ছিল সেটা খুলে আমার হাতে দিল যেন আমায় এতদিনকার কাজের বকশিশ দিচ্ছে।

'আমি চলে আসার আগের মুহূর্তে বললাম, দয়া ভিক্ষা করার প্রস্তুত হও।

'অন্যান্য দিন পদ্মিনী দৃঢ়স্বরে বলে—না। আজ যেন দ্বিধায় দুলতে লাগল। একটু পরে অতি মৃদুস্বরে বলল—না থাক গে। দরকার নেই। কি হবে আর।

'তারপর যে কয়েকদিন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে শুধু শুনতে চাইত দেবনাথকে অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটি পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছে কিনা।

'আর দুটি কথা আমার সঙ্গে হয়েছিল।

'একদিন সে সলজ্জ হেসে বলেছিল—ক্যাপ্টেন, তোমার পদ্মগন্ধ পাওয়াটা কি এখন ভুল বলে মনে হয় ?

'আর একদিন সে বলেছিল—দেবনাথের অন্যান্য ছবিগুলিও কি ওরা নেবে ?

'একটু হেসে আবার বলল—দেবনাথ তা হলে আর্টিস্ট কি বলো ?'

চড়চড় করে রোদ উঠে পড়ল। এতক্ষণ যে ধীরে-ধীরে রোদ এগোচ্ছিল তা লক্ষ্য করিনি। একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ থেকে গেছে সেটা ঐ আত্মহত্যা কিংবা হত্যা ঘটনাটার কারণ সম্বন্ধে। কারণ দ্বিতীয় দিনের পর এই ফাঁসির গল্পের ভয়ে আমি ঐ পার্কে আর যাইনি।

এখন এই গলপটা বলতে বসে মনে হচ্ছে, হয়তো পদ্মিনী অনুভব করেছিল দেবনাথ পদ্মগন্ধ সম্বন্ধে একেবারেই উৎসুক ছিল না। সে অনুপ্রাণিত হয়নি —এই ধারণাই হয়েছিল মার্গারেটের, কিংবা পদ্মিনী পলিনা মার্গারেট যে নামেই তাকে অভিহিত কর। তার হয়তো একটা অপচয়ের অনুশোচনা হয়েছিল। দেবনাথ শিলপী হিসাবে স্বীকৃতি পেলে এরকম হত না।

সে যাই হোক, সেই কুয়াশায় বুড়োরা থাক আর না থাক, বড় ঘরের দু-একটি অকালপক্ক ছেলেমেয়ে ফাঁসি সম্বন্ধে যে আলোচনাই করুক শহীদ মূর্তিটা হয়তো বা এখনও আছে অবশ্য যদি নদী আবার বাঁধ ভেঙে না থাকে।

রানি ইন্দুমতী

কোলকাতা শহরেই বটে ট্র্যামলাইন নেই এমন একটা রাস্তার দু'পারের বাড়িগুলোর প্রাচীরে বসে দাঁড়কাক ডাকছে। ভিস্তিওয়ালা এখনও রাস্তা ধুতে আসেনি। দাঁড়কাকগুলোর ডাকা-ডাকির শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে কখনো বা একটা চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ ভেসে আসছে। সেটা সকালের প্রথম ট্র্যামের যা ওদিকের ওই বড় রাস্তাটা দিয়ে ছুটছে।

কমলালেবু রঙের প্রাচীরের উপরে তারের জাল, সেই জাল বেয়ে যে লতা উঠেছিল তার কঙ্কাল চোখে পড়ছে। কোনো-কোনো ক্লাবের টেনিস কোর্টের পাশে এরকম উঁচু পর্দা থাকে। আমরা জানি এই পর্দার পিছনে রানি ইন্দুমতীর শোবার ঘর। রাত্রিতে এদিকের জানলাটা খোলা ছিল। প্রায় মাঝরাতে শাদা আলোর পরিবর্তে নীল আলো জ্বলেছিল, এখন আবার এই প্রত্যুষে শাদা আলো জ্বলছে।

রানি ইন্দুমতী জেগেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারিকা সোহাগি মধ্য কোলকাতা থেকে রাত চারটের ট্র্যাম ধরে এসে গেছে। সে এখন ইন্দুমতীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রানি ইন্দুমতী শয্যার উপরে বসে আছেন—তাঁর এক পা সামনের দিকে ছড়ানো, অন্যটি কোলের কাছে গুটানো? তাঁর ডান হাতে একটা ওয়াইন কাপে হুইস্কি। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। অনামিকার আংটিতে নীলা। অত্যন্ত নিচু করে কাটা ব্লাউজের গলার কাছে মুক্তার যে নীলাভতা সেটাই যেন প্রধান রঙ। এই ছবিকে নীল নায়িকা বলে উল্লেখ করা চলে।

এই সকালে হুইস্কি!

বিছানা থেকে নেমে ইন্দুমতী একটা ডিভানে গিয়ে বসলেন। সোহাগি অ্যাসট্রে এগিয়ে দিল, তার প্রাত্যহিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সে বাথরুমে যাবার ঘাসের চটি, তোয়ালে, কাপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে লাগলো পাশের ঘরে গিয়ে।

ইন্দুমতী বললেন, সোহাগি, তুমি বাছা ফেকুর মায়ের মতো প্রভুভক্ত নও। সন্ধ্যা হলেই তুমি বাড়ি ফেরার জন্য আনচান কর। তবু তো তোমার ছেলেপুলে নেই।'

সোহাগির নাম শুনে এবং তাঁর চাকরির সংবাদে প্রৌঢ়া একটি ঝি বলে মনে হতে পারে তাকে। তা নয়।

ফিরে এসে সোহাগি জানালার পর্দা সরিয়ে দিল দুপাশে। দিনের আলো বাড়লো কি না বাড়লো, ঠাণ্ডা একটা বাতাস এসে পেঁছিল। সে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল। সে জানে সন্ধ্যা হলেই তার বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা আসল আলোচ্য বিষয় নয়, ফেকুর মায়ের কথাই মনে পড়েছে ইন্দুমতীর তার থেকেই এই তুলনা। কিছু না বলে অথচ অগ্রাহ্য না-করার সুন্দর একটা ভঙ্গি করে কাপড় তোয়ালে চটি ইত্যাদি বাথরুমে গুছিয়ে রাখবার জন্য সে চলে গেল।

সোহাগি ফিরে এলে ইন্দুমতী বললেন, 'কাল থেকে, সোহাগি, ড্রিঙ্ক আর সিগারেট দুই-ই কমিয়ে দেব ভাবছি।'

সোহাগি জানে রানির এটা স্বগতোক্তি। নিজেকে কেন্দ্র করে এমন সব আকাঙ্ক্ষামূলক চিন্তা করেন তিনি। হয়তো বা একই চিন্তাধারার দুইটি স্তরে ফেকুর মায়ের কথা এবং তাঁর নিজের ড্রিঙ্কের কথা মনে হয়েছে। মাঝখানের চিন্তাগুলো অনুক্ত থাকায় তাঁর বক্তব্য অসংলগ্ন শোনচ্ছে। কিন্তু একটা জরুরী কর্তব্য ছিল তার। সে বাথরুমে গিয়ে দেখে এসেছে গরম জলের শাওয়ারটায় এখনও জল আসেনি। কিছুদিন হল গরমজলের নলটা কোথায় বিগড়েছে। সেটাকে ঠিক করতে হলে বাড়ির অনেক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। কথা আছে ইন্দুমতী এবার গরমে যখন শৈলাবাসে যাবেন তখন মেরামত হাতে নেওয়া হবে। ততদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আছে ঃ রান্নার মহলে বয়লারে জল গরম হচ্ছে, পাম্প করে-করে প্রধান বাথরুমগুলোর ট্যাঙ্কে পাঠানো হচ্ছে। সোহাগি আসছি বলে রান্নার মহলে গরম জলের তদারক করতে গেল।

ইন্দুমতী সিঁড়ি বেয়ে নামলেন তাঁর শাশুড়ীর মহলে। শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট একটা খাবার ঘর। এ ঘরেরই একান্তে স্টোভ আছে, দেয়ালে আলমারিতে বাসনকোসন। টেবিলের ধারে প্রত্যুষের আহারের প্রতীক্ষায় সেন-বুড়ি ও ফেকুর মা বসেছে। একই টেবিলে বসাটা লক্ষ্যণীয়। (সেনবুড়ির নামের আগে এককালে রানি কথাটা ব্যবহার করা হত। এখন কাগজকলমে তিনি রাজমাতা।) স্টোভের প্লাগ লাগিয়ে জলগরম করে সোহাগিই সেনবুড়ি এবং ফেকুর মাকে হর্লিক্‌স্ করে দিল। ততক্ষণে এ মহলের বাসিপাট সারবার জন্য ঝিও এসে কাজে লেগেছে।

সেনবুড়ি তাঁর স্তিমিতপ্রায় গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আজ কারো জন্মদিন নয়?'

ঝি হর্লিক্‌সের বাসনগুলো ধুয়ে এনেছে। সোহাগি সেগুলোকে মুছে দেয়াল আলমারিতে তুলে চাবি দিচ্ছে। চাবি দেওয়ার ব্যবস্থাটা হালের। কিছু রুপো আছে, কিন্তু তা হারাবার ভয়েই নয়। আলমারির গায়েই আগে চাবি থাকতো। আলমারি খোলা পেয়ে হর্লিক্‌সের শুকনো গুঁড়ো খেয়ে সেনবুড়ি এবং ফেকুর মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কিছুদিন আগে। তারপর থেকেই এই ব্যবস্থা।

ইন্দুমতী শাশুড়ীর কাঁপা-কাঁপা সুরের প্রশ্নটা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেন। শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে একটা ছদ্ম-গাম্ভীর্য ব্যবহারে আনেন তিনি। শাশুড়ীর মর্যাদা রাখার এটা এক রকমের চেষ্টা।

ইন্দুমতী বললেন, 'জন্মদিন! ও জন্মদিন? হ্যাঁ, তা বৈ কি।'

ঝিকে দু-গ্লাস জল গড়িয়ে দিতে বলে ইন্দুমতী নিজেই আলমারি খুললেন। একটা বড় কৌটোর ঢাকনা সরালেন তিনি। এটায় থার্মোফ্লাস্কের মতো কি একটি কৌশল আছে—মিষ্টি দু-চারদিন অবিকৃত থাকে। দুটি প্লেটে গোনা দুখানা সন্দেশ ইন্দুমতী সেনবুড়ি ও ফেকুর মায়ের সম্মুখে এগিয়ে দিলেন। ডাক্তারি মাপ।

সন্দেশ দুটি শেষ হতে মিনিট পনেরো লাগবে। ততক্ষণ এ মহলে থাকতে হবে তাঁকে। সে সময়ে তিনি এ মহলের ঘরগুলি পরিদর্শন করতে বেরুলেন। দেয়ালের কোনো-কোনো জায়গায় লোনা ধরেছে যেন, অন্তত রঙ ঘামছে বলে মনে হল। সিলিং-এর আস্তর কোথাও-কোথাও ফেঁপে উঠেছে—খসে পড়ার আগেকার অবস্থা। গত বছর যখন মেরামতের জন্য লোক লেগেছিল তখন সেন-বুড়ির শান্তি ব্যাহত করার ভয়ে এদিকে আসেনি তারা। এবারে হাত দিতে হবে।

ইন্দুমতী ফিরে এসে দেখলেন এদের সন্দেশ খাওয়া শেষ হয়েছে, সোহাগি টেবিল সাফ করছে তিনি শাশুড়ীর পাশে একটা চেয়ারে বসলেন।

সেনবুড়ি বললেন, 'কার জন্মদিন, বৌমা?'

যা তা, মুখে যা আসে তা বলে দেওয়া চলবে না। মাঝে-মাঝে দু-এক মিনিটের জন্য পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠা একটি মন থেকে সেনবুড়ি অদ্ভুতভাবে সত্যিকারের একটি প্রশ্ন করে বসেন। তখন অন্যের কথায় অযৌক্তিক প্রবোধ বাক্য থাকলে তা ধরা পড়ে যায় তাঁর কাছে।

এক্ষেত্রে সেনবুড়ির প্রত্যক্ষ স্মৃতির বাইরে বিষয়টিকে রাখবার জন্য ইন্দুমতী বললেন, 'আমার ভাইয়ের এক ছেলের জন্মদিন।'

সন্দেশ-প্রাপ্ত সেনবুড়ির মনে কোনো প্রশ্নের উদয় হল না। তিনি ফেকুর মায়ের দিকে ফিরে প্রফুল্লমুখে বললেন, 'দেখলে, আমি বলেছিলাম।'

অন্য কারো সম্বন্ধে হলে এবং অন্য কেউ হলে এরকম একটি প্রশ্ন এখানে উঠতে পারত সেনবুড়ি শুধুমাত্র সন্দেশ পাবার জন্যই জন্মদিনের কথা উত্থাপন করেছিলেন কিনা।

নিজের ঘরে ফেরার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ফেকুর মায়ের কথাই বরং ইন্দুমতীর মনে হল। ফেকুর মা বয়সে সেনবুড়ির চাইতে কিছু ছোট। মাঝখানে প্রায় ত্রিশ বৎসর সে এ বাড়িতে ছিল না। ফেকুর মৃত্যুর পর নাতি-পুতির অনাদরে তার ডাণ্ডকোরার বাড়ি ও জমি-জিরাৎ ফেলে রেখে সে চলে এসেছে। দুচোখে ছানির দরুন দশ আনা পরিমাণ অন্ধতা, শনের নুড়ির মতো চুল, মুখে একটি মাত্র কালো অবশিষ্ট দাঁত নিয়ে কাঁপা-কাঁপা পায়ের

শুকনো রলায় ভর দিয়ে-দিয়ে এক অবিশ্বাস্য উপায়ে সে এ দেশে ফিরে এসেছিল। তার অনুপস্থিতির সময়ে এ বাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছিল। হাতায় বসে ভাবছিল দুষ্টু ছেলেরা তাকে ধোঁকা দিয়েছে, তখন সেনবুড়ি তাকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়েছিলেন। ফেকুর মায়ের এই আসাও প্রায় পনেরো বছর হল।

ইন্দুমতীর হাতে অনেক অবসর। সমাজের হুল্লোড় থেকে এখন তিনি অনেক দূরে অবস্থান করছেন। কোনো পার্টিতেই প্রায় আজকাল তিনি যোগ দেন না, কোনো পার্টির আয়োজনই করেন না। তাঁর রূপ, তাঁর সাজ-সজ্জা, তাঁর সিগারেট এবং গ্রন্থপ্রিয়তা সমাজের দৃষ্টিতে অভূতপূর্ব। হয়তো তাঁর বৈধব্যও এই হিসাবে ধরা হয়। তিনি যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তো নির্বোধও নন, রাজনৈতিক নেতাও নন যে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে সুখী হবেন। তাঁর উত্তর চল্লিশের দৈহিক আকর্ষণ নিয়ে সুতরাং তিনি একটি মুক্তাফলের মতো আত্মগত, চারিদিকের জলকল্লোলে যদি বা তাঁর পরিবেশের ঝিনুক নড়ে ওঠে।

কাজেই একখানা বই নিয়ে বসলেন ইন্দুমতী যখন তাঁর সংসারের জীবনধারা তাঁর মহলের পর্দার ওপরে প্রবাহিত হতে লাগলো।

ইন্দুমতী বই খুলে, না পড়ে, চিন্তা করলেন :

ফেকুর মা এবং সোহাগি কখনো এক হবে না। যদিও সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখন আর সম্ভব নয়—এ রকম একটা প্রবাদ আছে এ বাড়িতে : ফেকু, ফেকুর মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও তার স্বামীর নয়। আর সে তখন নাকি নিছক ঝাঁত-ঝি ছিল না। অন্যান্য দাসদাসীরা তার নামের সঙ্গে বাঈ কথাটা যুক্ত করত। সেটা একটা রূপকথার মোহের মতো ব্যাপার, যা ঘটেছিল। তারপরই ফেকুর মায়ের নির্বাসন ত্রিশ বৎসরের জন্য। ডাণ্ডকোরা থেকে ফেকুর মায়ের চিঠিতে সময়ের ব্যবধানে ফেকুর জন্ম, বৃদ্ধি, ও বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। সেনবুড়িই ডাণ্ডকোরার ঘরবাড়ি জমিজমা করার টাকা নিজের হাতখরচ থেকে পাঠাতেন। এর থেকে এবং অন্য দু-একটি কারণে এরকম একটি সন্দেহ হয়েছে ইন্দুমতীর যে ফেকুর মায়ের ঘটনাটায় সেনবুড়ি খুশিই হয়েছিলেন। তাঁর এরকম সন্দেহ হয় : ফেকুর মাকে বিশেষভাবে এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সেনবুড়ির পরিকল্পনা ছিল। যে বিষয়টি ঠারে-ঠারে, গোপন ইশারায়, কথার তলায় লুকানো কথায় চলে-চলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মধুময় বোধ হচ্ছিল, যাদুকরের দণ্ড দিয়ে তিনি যেন দেখিয়ে দিলেন সে সব ব্যাপারের সমীকৃত ফল ফেকু, কাব্য নয়।

মানুষ অনেক কিছুই করছে কিন্তু নিজের জীবন-রূপ কৌতুক ও রহস্যের যে বিষয়টি তার হস্তগত তাকে নিয়ে খেলা করতে, পরীক্ষা করতে, তার সঙ্গে প্রণয় করতে, বোকা প্রতিপন্ন হয়ে তার মুখোমুখি বসে থাকতে সে যেন চায় না।

ইন্দুমতী ভাবলেন : 'জীন'তত্ত্ব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকলেও বিস্ময় বোধ হয়—গৌরবর্ণ বাপ-মায়ের ছেলে মেয়ে কালো হয়ে গেলে। কোন এক মায়ের ভিলম্ব কত পুরুষ ধরে কোলকাতার বনেদি প্রাসাদের চোরা কুঠুরিতে, বস্তির চোরাগলিতে, আর্য-সেমেটিক মঙ্গোল জাতীয়তার দরজা পার হয়ে হয়ে ফেকুর মায়ে এসে পৌঁচেছিল—তা বলা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু ফেকুতে পৌঁছে দেখা গেল ভিলম্ব পরিবর্জিত হয়নি। ফেকুর ছোট মাথা, ভিতরদিকে বসান কপাল, পুরু ঠোঁট—এসবের কথা ইন্দুমতী শুনেছেন। তা হলেও এসবগুলি মিলিয়ে তাকে যেমন আর্যেতর টাইপ বানানোর চেষ্টা আছে আসলে হয়তো ততোটা নয়, সেনবুড়োর আকৃতি বৈশিষ্ট্যও হয়তো কিছু-কিছু প্রকাশ পেয়েছিল।

সোহাগি এসে বললে, 'ব্রেকফাস্ট।'

জীনতত্ত্বের কথা আজকাল ভাবেন ইন্দুমতী। ভাবলেন চলতে-চলতে।

টেবিলে বসেই ইন্দুমতীর ছেলে পলাশ যা একটু কথা বলে। সদ্য আসা কাগজটার প্রথম পাতায় একটি ছবি বেরিয়েছে। নীরেন রাহা নামে এক ভদ্রলোকের ছবি--এবং তিনি য়ুরোপ যাচ্ছেন তার ঘোষণা। ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন ছেলে ছবিটা এবং তার নিচের লেখা একাগ্র মনে দেখছে, যেন য়ুরোপে যাওয়াটা এমন কিছু একটা ব্যাপার। তিনি তাঁর নিরামিষ প্লেটের ক্রিস্পগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রমলা টেবিলে ছিল। ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন তাঁর অসন্তুষ্ট দৃষ্টিটা রমলা লক্ষ্য করেছে। রমলার ডান হাতখানা কাঁটা-চামচ রেখে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়লো আলগোছে, অন্যমনস্কভাবে, যেন সে কিছু বলবে, পলাশের বাঁ হাতখানা ঘেঁষে। মনে হল যেন তার একটা আঙুল এগিয়ে গিয়ে পাশে শোওয়া অন্য হাতখানাকে একবার স্পর্শ করল। অবশ্য রমলার চোখ দুটি সর্বক্ষণ ইন্দুমতীর মুখের উপরে রাখা ছিল, যাদুকর হাতের কাজ করার সময়ে যেমন করে দর্শকের চোখে চোখ রেখে তার দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখে। টেবিলে ভাঁজ করা আর একটি কাগজও ছিল। ইন্দুমতী রানি সেটাকে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। দ্বিতীয় পাতায় থামলেন ইন্দুমতী, এটি বোধহয় নীরেনের পার্টির কাগজ নয়—তবু তার ছবি না-ছেপে পারেনি। তিনি কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। রমলা বললে, 'জন্মদিনের কি হচ্ছে ?'

'জন্মদিন ? ও হ্যাঁ জন্মদিন।'

'কার আবার জন্মদিন ?' ইন্দুমতীর ছেলে প্রশ্ন তুলল :

'তোমার মামাতো ভাইয়ের।' বললেন ইন্দুমতী।

কোনো-কোনো সময়ে একটি পলককে সুদীর্ঘ বলে মনে হয়। তেমনি একটি। ইন্দুমতী লক্ষ্য করলেন—রমলার বিস্মিত পক্ষ্মগুলি আমেরিকান প্রসাধনের সাহায্যে দীর্ঘতর হয়েছে, তার চোখের মণিটায় সোনালি আভা আছে, চোখের কোলে হাল্কা প্রসাধিত কালিমা। কিন্তু রানি ইন্দুমতীকেই চোখ নামিয়ে

নিতে হল, রমলাকে নয়।

ব্রেকফাস্ট চায়ে শেষ হলে রমলা ও ইন্দুমতীর ছেলে চলে গেল। ইন্দুমতী জানেন তাঁর ছেলে এখন সোজাসুজি তার পড়ার ঘরে গিয়ে বসবে। রমলার পড়ার ঘর অন্য মহলে। কোনো কোনো দিন রমলা তার পড়ার ঘরে না গিয়ে পলাশের ঘরে একখানা সোফায় গিয়ে বসে। মুখের সামনে খবরের কাগজ ধরে বিড়-বিড় করে নানা বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করে। সেই অজস্র অস্ফুটতা অবশেষে পলাশের দৃষ্টি এবং পরে মনকেও বই থেকে সরিয়ে আনে।

সেই এক শেষ রাতে ওরা দুটিতে নাইট ক্লাব থেকে ফিরবার পর থেকে এ ব্যাপারটা নজরে পড়ছে। তার আগে পলাশ সঙ্গে কোনো মহিলা নিয়ে পথ চলতেও আপত্তি করত। এটা লক্ষণীয় অন্য এক ব্যাপারের মতো রমলা ইন্দুমতীর ছেলেকে মোটর চালাতে শিখিয়েছে এবং ঠিক টাই-টা পছন্দ করতে। যদি নীরেন রাহার পার্টির দিকে ঝুঁকে থাকে সে, রমলাই তাকে শুধরে আনতে পারবে। ইন্দুমতীর ছেলে পড়ার ঘরে বই মুখে করে বসে থাকত। সেই গণ্ডির বাইরে যদি তাকে কেউ এনে থাকে তবে সে রমলা।

বই! বই দিয়ে কি হবে? অবশ্য তিনি নিজে পড়েন।

ইন্দুমতী রানি সিগারেট ধরালেন।

এ বাড়ির একটি ছেলে যার উপাধি ছিল রাজা এবং ইন্দুমতী যাকে বিবাহ করে রানি হয়েছেন সে ছিল ইন্দুমতীর ভাই বিজয়ের সহপাঠী। সে মেধাবী ছাত্র ছিল না, বিজয় ছিল। এ জন্যই বোধহয় বিজয়ের প্রতি তার একটা টান ছিল। ইন্দুমতীদের বাসার গলিতে তার গাড়ি ভিড়ত না, বড় রাস্তার ধারে পার্ক করে রেখে আসতে হত। ইন্দুমতীর বাবা একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তা থেকে ধরে নেওয়া যায় কোনো এক চওড়া গলিতে তাঁর বাসা ছিল, কিন্তু রাজার গাড়ি তার তুলনাতেও চওড়া ছিল। বিজয়ের তখন আঠার, ইন্দুমতীর কুড়ি, এ লোকটিরও না হোক ইন্দুমতীর সমবয়সী হওয়ার কথা। কিন্তু তার টপ্ হ্যাটে এবং স্ট্রাইপ স্যুটে তাকে অন্তত পাঁচ-সাত বছরের বড় বলে বোধ হত। যদিও এদিকে সিল্কের মতো কোমল দাড়ি গোঁফ ছিল মুখে; আর কি অপূর্ব সারল্য ছিল তার দৃষ্টিতে, শিশুর মতো কি নিঃশঙ্ক কৌতুহল! ইন্দুমতীকে সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি স্নো ব্যবহার করেন?' কিন্তু কথা তো শুধু কথা নয়—গলার সুর, চোখের দৃষ্টি এবং বক্তার ভঙ্গি। এরই জন্য ইন্দুমতী নিজের জন্মতিথিটাকে দু-মাস আগে সেপ্টেম্বরে সরিয়ে এনেছিলেন।

তখনকার দিনে বিজয় একবার বলেছিল, 'দিদি, আর একবার ভেবে দেখো।'

ইন্দুমতীর তখন ভেবে দেখবার অবসর ছিল না। দামী চিনেমাটির মতো কিম্বা জাপানি ছবির মতো এক ধরনের স্তিমিত কিন্তু আকর্ষণীয় রূপ ছিল তাঁর। তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল।

রাজা একদিন তার রানিকে বলেলেন, ছি 'ইন্দু, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণের মূলে ছিল তোমার মধুর সংযম।'

একদিন চিন্তা করতে বসে ইন্দুমতী অনুভব করেছিলেন, মধুর হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ ছিল আর সংযত হওয়া তাঁর মতো মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। হিসেবী বুদ্ধি ছিল বলেই উৎসব করে সহধর্মিণী হওয়ার মাস ছয়েক আগেই তিন-আইনে বিবাহ হয়েছিল তাঁদের।

রানি ইন্দুমতীর ছেলের জগজ্জ্যোতি দিয়ে আরম্ভ করে যে পোশাকি নাম সেটা ছাড়া আর একটা নাম আছে পলাশ। জানে অনেকেই, কিন্তু, ইন্দুমতীর মনে পড়ল, এই 'পলাশ' কথাটা রমলার মতো কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। শুনে মনে হয় কথাটা সে অত ভালো উচ্চারণ করতে পারে বলেই রমলার বক্তব্যে কথাটা বার-বার ফিরে ফিরে আসে।

এখনই হয়তো সে আসবে এবং বলবে, 'কিছু বলব।'

'কি বলবে তা আমি বুঝতে পারছি। বলো।'

'পলাশের জন্মদিন, আমি খবর পেয়েছি।'

'তা পেয়েছ, দেখছি।'

'উৎসবটা গত বছর হয়নি '

'তা হয়নি। এটা কি তোমরা আলোচনা করছ?'

'না। উৎসবটা হয় না?'

'ভেবে দেখি।'

চিন্তা করতে করতে এক হাতের তেলোয় রাখা অন্য হাতের তেলোতে চোখ রেখেছিলেন তিনি। সামনে রমলার চোখ নেই। তাঁর মনে পড়ল তখন কেউই আগে পলক ফেলতে চায়নি, যদিও বয়সের খাতিরে রমলার তা উচিত ছিল।

এই কাল্পনিক কথোপকথন শেষ করে ইন্দুমতী সুতরাং কিছু ক্লান্ত বোধ করলেন। কিন্তু ক্লান্তিতে সব কিছু শেষ হয় না। তাঁর মনে সম্ভাব্য নিমন্ত্রিতদের তালিকাটা ফুটে উঠল। আজ সকালে দুবার হয়ে গেছে—একবার সেনবুড়িকে দ্বিতীয়বার পলাশকে জন্মদিনের কথায় বলেছেন বিজয়ের ছেলের জন্মদিনের কথা।

ইন্দুমতী ফোন ধরলেন নিজের ঘরের একান্তে।

'আপনি কে? ডাক্তারবাবু এখন ব্যস্ত আছেন।'

'আহা! বিজয় ডাক্তারকে বল আমি যা বলেছি। হ্যাঁ বল দিদি ডাকছেন।'

'দিদি?'

'হ্যাঁ গো, বাছা!'

লোকটি বলছি বলে চলে গেল।

'দিদি, তুমি ডাকছ?'

'হ্যাঁ, তোর ছেলে-বৌকে পাঠিয়ে দিবি আজ।'

'হঠাৎ, এই ভোর বেলায় ?'

'আজ আমার জন্মদিন মনে কর না।'

'আজ জন্মদিন তোমার ? আমি তো শুনেছি আমি আর তুমি একমাসে জন্মেছিলাম—ডিসেম্বরে। অবিশ্যি পরে তোমার জন্ম তারিখ বদলে নিয়েছ নিজেই।'

'তুই বড় দুষ্টু ; বউ ছেলেকে পাঠাতে তোর আপত্তি কি ?'

'কিন্তু তা নয়, আজ কাল কিম্বা পরশু পলাশের জন্মদিন। এতদিন যা করোনি এখন যদি তাই করো, মানে ভাগনের জন্মদিনে মামীকে নেমন্তন্ন, তা হ'লে আমাকেও প্রস্তুত হতে দাও।

'উপহার ?'

'কাজে-কাজেই।

'আমি দুপুরে গিয়ে বিকেলে নিয়ে আসব বৌকে, বলে রাখিস। কার জন্মদিন হবে আমি ভেবে দেখি।'

একটু যেন স্বস্তি বোধ করলেন ইন্দুমতী কিছু একটা করতে পেরে।

কিন্তু পলাশের জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিতের তালিকা আবার মনে ফিরে এল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দুমতী ছেলের জন্মতিথি পালন করতে পারছেন না। কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে হৈ-হৈ করা নয়, তবু কেন তিনি তেমন করে পারেন না, এ প্রশ্নটা স্বামী থাকতেও তাঁর মনে উঠেছে। কিন্তু তখন কোনো কোনো প্রশ্নকে নিবিয়ে দেওয়া যেত, তাঁর স্বামীর ব্যক্তিত্ব নিবিয়ে দিত।

কোনো-কোনো সময়ে জন্মোৎসব অবসান হলে ইন্দুমতী নিজের বোডোয়ারে বসে চিন্তা করেছেন, কোথাও আটকালো না কেন ? সব সময়েই বাধ-বাধ লাগছিল অথচ মরচে পড়া স্প্রিংয়ের উপর টাল খেতে-খেতে গাড়িটা গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

অনেক নিমন্ত্রিতের অনেক কথার মধ্যে নহরগড়ের রানির কথাই ইন্দুমতীর বেশি মনে পড়ে। ইন্দুমতীর স্বামীকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে তোমার শ্বশুর বংশের মতো হয়েছে, তাই নয় ?'

তারপর ইন্দুমতীর স্বামী এবং নহরগড়ের রানি আলাপ করতে-করতে করিডর দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে চলে গিয়েছিলেন। পথ চলতে-চলতে থেমে একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় দুমিনিট ধরে তাঁরা গল্প করেছিলেন, ইন্দুমতী তখন বসবার ঘরে অন্যান্য অতিথিদের স্বাগত করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

করিডরটা যেখানে দোতলার ব্যালকনির প্রতিরূপ হওয়ার জন্য গোল হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা ব্যালকনির আকার তৈরি করেছে, সেখানে মোজেইক-করা থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রায়চৌধুরীদের ছেলে একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল।

দেরি করে আসা কোনো নিমন্ত্রিত হলে পড়ে আছে কিনা জানবার জন্য পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইন্দুমতী। রায়চৌধুরীদের ছেলে একবার মাত্র ফিরে চেয়েছিল, বলবার মতো কথা খুঁজে পায়নি। অথচ রায়চৌধুরীদের এ ছেলেটির আলাপী বলে নাম আছে। প্রেম নয়, সে মহিলাটি রায়চৌধুরীর প্রেমিকা ছিল না, তবু যেন তেমনি মগ্ন হয়ে রইলো তারা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

সংস্কৃতি? ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যাকে সংস্কার বলি, বংশগত ব্যাপারে তাকে সংস্কৃতি বলা চলে? সংস্কৃতিটাই যেন বিভিন্ন পাত্র পাত্রীর মাধ্যমে চরিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ঘটে যাওয়ার পরে চরিত্র, ঘটে যাওয়ার আগে সংস্কৃতি। এ বংশের সংস্কৃতি যাদের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম সেনবুড়ি। তার চরিত্রের বিশিষ্টতম ঘটনা ফেকুর সম্বন্ধে।

ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে সেটাকে সেনবুড়ির ষড়যন্ত্র বলে অনুভব হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্র তো নয়, লঘুস্পর্শ একটা কিছু। এই লঘুস্পর্শ তাই যেন বৈশিষ্ট্য। নীল বলেই নীল নয়, নীলাভতা। ইন্দুমতীর স্বামীর সম্বন্ধের সেই ঘটনাটাও তুলনায়। ইন্দুমতী বলেছিলেন, আমি ভাবছি পাহাড়ের দিকে যাই কোথাও।' এক পলকের চাইতেও কম সময়ে একটা পাল্টা প্রস্তাব: 'আমি ভেবেছিলাম'—তারপরই তাঁর স্বামী বলেছিলেন, 'বেশ তাই যাও।' ইন্দুমতী একাই পাহাড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর না যাওয়া এবং অন্যত্র যাওয়া এত হাল্কা হয়ে ঘটেছিল কেউ লক্ষ্য করেনি।

অন্য উদাহরণও আছে। তার দেওরের মৃত্যুর কিছু আগে স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়েছিল। একটি মাত্র কন্যা তাদের, তাকে নিয়ে ইন্দুমতীর জা অন্যত্র বাস করত। অথচ মান অভিমান, মামলা-হামলা নয়, দিনের পর সন্ধ্যা নামার মতো নিঃশব্দ প্রাত্যহিক ব্যাপার যেন। যেন সন্ধ্যার তারার মতো সেই কলঙ্ক-মূল বিচ্ছেদও অনুভব করার কিছু।

কথায় ঠিক ধরা পড়ে না। শীতের সকালে ফুলের গায়ে লেগে থাকা উড়ন্ত মাকড়সার জালে যে শিশির তার বিশ্লেষণ করতে গেলে ফুলটাই থাকে। এ ক্ষেত্রেও থাকবে আর্থিক ঐশ্বর্য। কিন্তু ফুলটাই তো একমাত্র সত্য নয়। ভাবলেন ইন্দুমতী।

একতলার ড্রয়িংরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রানি ইন্দুমতী, এমন সময়ে সোহাগি এসে বলল, 'ফোন, আপনার ঘরে।' ইন্দুমতীকে উঠে যেতে হল না, সোহাগি একসচেঞ্জকে বলে তাঁর হাতের কাছের ফোনে ডাকটা এনে দিল।

'হ্যালো। কে? নীরেন? রাহা! পলাশকে চাই?'

ইন্দুমতীর মনে হল পলাশকে ডেকে দেবেন, তারপর স্থির করলেন তিনি, শুনি-ই না কেন নীরেন রাহা পলাশকে কি বলতে চায়।

নীরেন বললে, সে পলাশের প্রস্তাবগুলো দেখেছে এবং য়ুরোপ থেকে ফিরে

এসে পার্টির থিসিসে প্রস্তাবের দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবিষ্ট করা যায় কিনা আলোচনা করবে। এই খবরটাই পলাশকে দেওয়া দরকার। নীরেন তার হোটেল-ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল।'

ইন্দুমতী উঠে নিজের ঘরে চললেন। যাওয়ার পথে পলাশের স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে নীরেনের খবরটা তাকে দিলেন। লক্ষ্য করলেন পলাশের মুখের আনন্দ-উত্তেজনার পরিবর্তন। যেন এতদিন ধরে সে যে লেখাপড়া করেছে, চিন্তা করেছে তার স্বীকৃতি পাওয়া গেল নীরেন রাহার আশ্বাসে।

নিজের ঘরে ফিরে ইন্দুমতী তাঁর নিজের চিন্তাতে ফিরে গেলেন।

ইন্দুমতী নিজের সবটুকু অন্তর দিয়ে যেন ছেলেকে গ্রহণ করতে পারছেন না। পলাশের মুখের চেহারা, দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, স্বভাব—সবই কোনো না কোনো সময়ে এ পরিবারে আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ্যে নয়, সঙ্গোপনে। কিন্তু ইন্দুমতী জানেন। পলাশ যেন কোনো রাজনৈতিক সংস্থার সংগঠন-সচিব হওয়ার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে। তার বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকার সার্থকতা যেন নীরেনের আশ্বাস। দূর থেকে রাজনৈতিক দলকে পিঠ-চাপড়ানো নয়, পথে-পথে কাগজ ছড়ানো, কথা বলে বেড়ানো। ইন্দুমতীর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। পলাশ যেন উচ্চাভিলাষ দিয়ে পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরবে, যেন সেটা তার বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য। সেনবাড়ি রাজমাতা হওয়ার আগে রানি ছিলেন, কিন্তু তার চাইতে বড় কথা রাজকন্যা ছিলেন রানি হওয়ার আগে। রমলার মাও তাই। ইন্দুমতীরও উচ্চাভিলাষ ছিল।

এ বংশের একটি ধারা আছে: ইন্দুমতীর শ্বশুরের বাবা বেঁচেছিলেন আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত, শ্বশুর বেআল্লিশ, ইন্দুমতীর স্বামী চল্লিশ, ইন্দুমতীর দেওর আটত্রিশ। এমন কি, ডাণ্ডকোরার খবর, ফেকুও পঁয়তাল্লিশের দাগ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ইন্দুমতীর ছেলে পলাশ কুড়ির কাছাকাছি যাচ্ছে। ইন্দুমতীর মনে হল: পলাশ ষাট বছরে রিটায়ার করে পত্রিকায় লেখা দিয়ে অর্থোপার্জন করবে কিনা কে বলবে।

রানি ইন্দুমতী তাঁর প্রসাধন-করা আঙুলের ডগাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন।

'জন্মদিন? হ্যাঁ তা বৈকি।'

দ্বিপ্রহরের আহারে বসে রমলার নির্বাক প্রশ্নের এই নির্বাক উত্তর দিলেন ইন্দুমতী। রমলা তার চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করতেই চায়, তার বসবার ভঙ্গিটা সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ভাবলেন তিনি: গেস্ট হিসাবে নীরেন রাহার এ বাড়িতে আসা কি রকম দেখাবে? বিজয় ডাক্তারের ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেই বা এরা কি বলবে?

ইন্দুমতী বললেন, 'আমি দু-একদিনের জন্য অন্যত্র যাচ্ছি।'

পলাশ বলল, 'আমার পরীক্ষা কিন্তু কাছে।'

ইন্দুমতী ভাবলেন : এ কথাটা ছাড়া বলবার মতো অন্য কিছু কেন তুমি খুঁজে পাও না, পলাশ? তাঁর মনে পড়ে গেল নহরগড়ের রানির উক্তি। মাতুল বংশের মতো হয়েছে পলাশ। উচ্চাভিলাষী।

তিনি বললেন, 'ততদিন দেরি হবে না।'

রমলার নির্বাক প্রশ্নের দ্বিরুক্তিতে এবার তিনি একটু রুষ্ট হলেন। তাঁর চোখে যা ফুটল তা এই : রমলা তুমি সুলতানা রিজিয়া ধরনের মেয়ে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত আমি যে কোনো সময়ে তোমাদের, তোমাকে এবং পলাশকে, মনে করিয়ে দিতে পারি তোমরা ভাই-বোন, তুমি পলাশের নিজের কাকার মেয়ে।

ইন্দুমতী নিজের কার্যক্রম স্থির করে ফেললেন। কয়েকটি পরিকল্পনা পরীক্ষার পরে বাদ দিতে হল। তাঁর ভাইয়ের ছেলের জন্মদিন হলে ক্ষতি কি?

অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, জন্মোৎসব শেষ হওয়ার পর যেমনটা হয়ে থাকে। তাঁর মনে হল, অনেক জল ঢেলে অনেক সময় ধরে স্নান করা দরকার, বিকেলের গা-ধোওয়া নয়। সোহাগিকে ডেকে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। নখের রঙ ঘষেঘষে তুলল সোহাগি, যেন ইন্দুমতী আর কোনোদিনই রঙ মাখবেন না। এত সাবান ব্যবহার হল যেন কি একটা সর্বাঙ্গ থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে। ঘরে ফিরে নতুন করে রঙ দিলেন নখে ইন্দুমতী, একবারও ব্যবহৃত হয়নি এমন একটি পোশাক পরলেন।

ভাইয়ের বাড়িতে যেতে হবে।

গাড়ি চালিয়ে এনেছিল রমলা, আরোহী ইন্দুমতী। পলটনী-মাঠের পাশে গাড়ি থামলে ইন্দুমতী নেমে দাঁড়ালেন পথে। রমলা মোটর নিয়ে অন্তর্হিত হল। রানি জানেন, রমলা তাকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার সাহস পাবে না, তারও দুর্বলতা আছে।

একটা ঝরঝর লজ্‌ঝড় বাসে উঠে পড়লেন ইন্দুমতী। হাতে একটা নরম চামড়ার ব্যাগে খান কয়েক কাপড়-জামা।

বিজয় ডাক্তারের বাড়ির পাড়াটা ঠিক আছে। বাড়ির চেহারা বদলেছে— এতদিন পরে কি রানি ইন্দুমতী চিনতে পারবেন। অবশ্য সোহাগি বলে দিয়েছে বিজয় ডাক্তারের বাড়ি সবাই চেনে। রানির মনে হল বিজয় শুধু অর্থ নয় সম্মানও সঞ্চিত করেছে। উচ্চাভিলাষে তিনি যে পথে এসেছিলেন সে পথ ছাড়াও অন্য পথ আছে বিজয় যেন তারই প্রমাণ। আর তা যদি বলো 'হুজ্‌হু' খুলে তিনি আজই নীরেন রাহার পরিচয় সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর একটা ধারণা হয়েছে তার সহপাঠী হাল্কা গড়নের শ্যামল চেহারাব একটি ভালো ছেলে ছিল যে নীরেন রাহা, বর্তমানের নামকরা এম. পি. হয়তো তারই পরিবর্তিত রূপ।

ভিড় ছিল। একটি সিটে একজোড়া চলছে। বউটির বোধহয় প্রথম সন্তান হবে। আনন্দ-বিস্ময়-পুলকে তার স্বামী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ইন্দুমতী

এগিয়ে যেতে পুরুষটি উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল। ইন্দুমতী বললেন, 'বসুন।' তিনি বাসের রড্ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সেই রড্-ধরা হাতে হীরক খচিত চুড়ি ছিল তা কি কেউ লক্ষ্য করল? কিম্বা আমরা দেখবামাত্রই কি হীরক চিনতে পারি? অন্তর্বত্নী নারীটির স্বামীর দৃষ্টির সঙ্গে দু-তিনবার রানি ইন্দুমতীর দৃষ্টি ঠেকে গেল। তাঁর উপস্থিতি পুরুষের দৃষ্টিকে এখনও পরিবর্তিত করে? সঙ্গে স্ত্রী থাকলেও তা হয়?

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে বাস বদল করবেন ইন্দুমতী। ট্রামে, বাসে, পায়ে হেঁটে অবশেষে হয়তো একটা ট্যাক্সি করে তিনি ভাইয়ের বাড়িতে পেঁছিবেন। পথে যদি গোয়েন্দা পিছু নিত তবু তাঁর সঙ্গে কোনো বাড়ির যোগাযোগ খুঁজে বার করা সম্ভব হত না।

বাসের গায়ে বসানো অকেজো কম্পমান একটা আয়নায় তাঁর চোখ পড়ল। কালো সানগ্লাসে তাঁর চোখ ঢাকা, তার তলায় ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক করছে। সন্তান-সম্ভাবিতা মধ্যবিত্ত মেয়েটির চাইতেও তাঁকে সন্তান-ধারণের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত বোধ হয় এখনও। কথাটা তাঁর মনে কিছুক্ষণ আলোচিত হল।

ভাইয়ের সহায়তায় তিনি কি নতুন করে কারো জন্মোৎসব পালন করবেন—নতুন কোনো জন্মের উৎসব?

বাস থেকে নামতে গিয়ে কার পা তাঁর পায়ে লাগল। পায়ে হেঁটে চলতে চলতে তাঁর আকস্মিকভাবে মনে হল—এটা তার রক্তে মধ্যবিত্তয়ানা, এই অদ্ভুত পথচলা। রমলা বোধ হয় কোনো অবস্থাতেই এমন করে চলার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এ সব শুনলে হয়তো হেসে বলবে, 'কোলকাতায় কি ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না?'

এমন আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে অনেক কিছু হয়। আজ শনিবার, কাল রবি। রবির সন্ধ্যায় একটা ট্যাক্সি করে ফিরলেও হবে বাড়িতে। কিম্বা একটা গাড়ি দরকার তাঁর দেওরঝি রমলার। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব একটা গাড়ীর অভাব সে বোধ করছে। আর, একটা গাড়ি পেলে সে কিছুকালের জন্য জেঠিমাকে একটু বেশি খাতির করবে বৈকি। শুধু খাতির কেন?—রমলা রানিমা বলত, ইন্দুমতীই নিজে তাকে উৎসাহ দিয়ে জেঠিমা বলতে শিখিয়েছেন। নতুন কেনা একটা গাড়িতেও ইন্দুমতী ফিরে যেতে পারেন।

ইতিহাস

অদ্ভুত গৃহিণীর এ রকম মনোভাব বহুদিন পরে ধরা পড়ল। বড় ছেলেটা হারিয়ে যাবার পর স্বামীর মৃত্যুতে নিশ্চয় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে ঘটনা তাঁর বাড়ি ভরা লোকজনের কেউই নিজের চোখে দেখেনি। এমন কি মেজ ছেলে পুলিনও। (এখন সেই বড় ছেলে) না ভেবে বলতে পারে না কবে তার মা এতটা বিচলিত হয়েছিলেন।

বলতে পারা যায় গৃহ-বাড়িতে এখন যে যুগটা চলছে সেটা ও গৃহিণীর পূর্ব জীবনের যুগটা এক নয়। কথাটা অশ্রদ্ধেয় শোনালেও সত্য যে গৃহিণীর বাড়িতেও যুগ বদলেছে বউদের হাতে-হাতে। একটি করে বেটা-বউ এসেছে আর তার সঙ্গে একটা অদৃশ্য অথচ বোধগ্রাহ্য দ্বন্দ্ব হয়েছে গৃহিণীর। গৃহিণী হার মেনেছেন কিম্বা স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেই পরিত্যক্ত স্থানটুকু দখল করে বেটা-বউরা নিজেদের যুগের মিনার স্তম্ভ প্রভৃতি তুলেছে।

বড় ছেলে পুলিনের বিয়ে দিয়ে রাঙাবরণ ছোট একটা বউ ঘরে এনেছিলেন গৃহিণী। তখন পর্যন্ত পুলিনের রুমালের ভাঁজটুকু পর্যন্ত গৃহিণীকে নিজের হাতে করে দিতে হত। ছেলে কি ভালোবাসে, ছেলের কোন বিষয়ে অরুচি রান্নাঘর থেকে আরম্ভ করে শোবারঘর পর্যন্ত বউকে সঙ্গে করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছেলের জীবনের প্রতি মুহূর্তকে স্নেহসিক্ত করে রাখার গুরু দায়িত্বটা বউ বুঝুক। বউকে ডেকে বলতেন, 'ঐ যে লোহার কবাটের মতো বুক দেখছ, বড় স্নিগ্ধ জিনিস দিয়ে এগুলি তৈরি। তুমি কি ভেবেছ বেটাছেলে ঘা খেয়ে-খেয়ে শক্ত হয়? তা হয় না। মা, বউ, মেয়ে এদের স্নেহভালোবাসার এতটা পায় বলেই বেটাছেলেদের এতবড় বুক।' তিরস্কৃত হয়ে পুলিনের বউ পুলিনের কামিজের ইস্ত্রি, ধুতির পাড় গিলে করায় বেশি করে মন দিত। রাত্রিতে খাবার জল ঠাণ্ডা রাখবার জন্য বরফ আনতে আর ভুল হত না। কিন্তু পুলিনের বউ চারুশীলা জলের মতো ঠাণ্ডা মেয়ে, জলের মতোই তার নিঃশব্দ আত্মবিস্তারের ক্ষমতা ছিল। সেটা টের পেলেন গৃহিণী অনেক পরে।

তখন চারুশীলা ষোলো বছরের হাল্কা গড়ন ছিপছিপে মেয়েটি আর নয়, ত্রিশ বছরের স্থিতযৌবনা মেদমতী। চোখে সোনার চশমা উঠেছে, কথার সুরে গভীরতা এসেছে। পুলিনের ছোট ছেলের জ্বর বাড়াবাড়ি করছে এ খবর পেয়ে

উঠোনটা পার হয়ে পুলিনের শোবার ঘরের পাশে তার ছেলেদের শোবার ঘরে গিয়েছিলেন গৃহগিন্নী, ফিরতি পথে পুলিনের ঘরে একটু দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিন কেমন থাকে এ খোঁজ করতে গিয়ে তাঁর অভ্যস্ত চোখ ঘরের দেয়াল থেকে শয্যা, জল ও পান রাখবার ছোট টেবিল, তা থেকে চারুশীলার দেহে গিয়ে পড়ল।

'দেয়ালের ফটোখানা কোথায়, চারু ?'

'বিবেকানন্দের ছবিটার কথা বলছেন ? বোধহয় বসবার ঘরে—'

'ছবি নয়, মা, ফটো। বাইরের ঘরে গেছে !'

নিজেই অপ্রিয় আলোচনা পালটে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন গৃহগিন্নী, দৌড়-বারান্দার উপর দিয়ে চারুশীলা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ সুর নিচু করে বললেন, 'বিকেল পার হল এখন একটু চুলটুল বাঁধলেও তো পার ; পুলিন কি আর ঝোলানো বেণী পছন্দ করে না ?'

বিরত হয়ে চারুশীলা অভ্যস্ত কৈফিয়তটি দিয়ে ফেলল, 'এই তো এবার গা ধুয়েই–

দৌড়-বারান্দার যেখান থেকে চারুশীলা ফিরে গেল সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে মেজবউ বিনতার ঘরগুলি। ছেলেদের বসবার ঘর, বিনতার ঘর, মেজ ছেলে বিপিনের ঘর, তাদের বসবার ঘর, লাইব্রেরী ; ঘর বেড়েই যাচ্ছে এ দিকটায় বাগানের আয়তন চুরি করে করে ; তা হোক ওরাই থাকবে।

নাতির অসুখের সংবাদে যেমন পুলিনের ঘরে যেতে হয়েছিল, তেমনি নাতির কান্নার শব্দেই গৃহগিন্নী বিপিনের মহলে ঢুকলেন। গৃহগিন্নী নাতিকে কোলে করে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখলেন না অথচ গল্প শুনতে পেলেন বিপিনের, তার বউয়ের। একবার গৃহগিন্নী ভাবলেন, ডেকে পাঠাবেন বিনতাকে ; নাতিকে কোলে করে ভারি পর্দাটা ঠেলে তিনি ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলের সম্মুখে বিপিনের মারাঠি বন্ধু, বিপিন, তার বউ। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গৃহগিন্নী বললেন, 'ছেলে কাঁদছে, মেজ বউ, মনে করে দেখ কোনো কোনো মা বুকে করে ছেলে মানুষ করে না দিলে আই. সি. এস, স্বামী পাওয়া যায় না।' কথা কয়টি একটু অতিরিক্ত স্পষ্ট উচ্চারণ করে গৃহগিন্নী নাতিকে কোলে করেই ঘর ছেড়ে গেলেন। বিনতা ভেবেছিলেন মারাঠি বন্ধু এমন অভব্য ব্যবহারের পর রাগ করবে। কিন্তু কিছু সে মনে করেনি, এটা বোঝবার জন্যই যেন বিপিনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে বরং অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি বসে রইল। বিপিন ভেবেছিল এইবার সে ক্লাবে পালাবে, রাত অনেকটা গড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। কিন্তু তাকেও বসে থাকতে হল। বিনতা ভেবেছিল একটু কাঁদবে, বলবে, এমন অপমান না হলে কি তার চলছিল না, যে বিপিন তাকে বিয়ে করেছিল। বলবার সুযোগ সুবিধা হল না। সারা বাড়িটা যখন রাত বারোটায় থমথম করছে নিজেকে গিয়ে শাশুড়ীর ঘর থেকে

ছেলে কোলে করে আনতে হল বিনতার। ছেলে রাখবার ঝিকে ছাড়িয়ে নেপালি আয়া রাখবার কথাও ভেবেছিল বিনতা ; আভাসে জানতে পারল ঝিকে ছাড়ানো যাবে, বাড়ি থেকে তাড়ানো যাবে না।

কিন্তু এক-একদিন এক-একটা ঘটনা নিজের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়ে দিয়ে গৃহ-গিন্নী তাঁর মহলের গভীরে ডুবে থাকেন। সেখান থেকে তিনি বহু নতুন আয়োজনের আমদানি, পুরাতন প্রথার পরিবর্জন সংবাদ জানতে পারেন। ক্ষোভ করবার মতো মেয়ে নন তিনি। বরং একটা আনন্দও বোধ হয় তাঁর কোনো-কোনো দিন, যেমন হয়েছিল নতুন-কেনা পিয়ানোর ঝংকারের সঙ্গে-সঙ্গে বিনতা শিউরে-শিউরে গান করে উঠতে। বাড়ির শুভ বউদের হাতে হাতে—তারা যেখানে যাবে শুভটাও সেখানে যাবে এইটুকু শুধু প্রত্যাশা করেন তিনি।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিল পাঁচ-সাত বছর আগে। '৪২ খৃষ্টাব্দে এসে মাত্র একবারই একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল। সেটার চারদিকে সস্নেহ পরিহাস ছিল বলে বরং সেটা সকলে উপভোগই করেছিল, এমনকি বিনতাও হেসে বলেছিল, 'কি যে বলেন, মা।' ব্যাপারটা সূত্রপাত করেছিল পুলিনের বড় ছেলে। নতুন টেনিস র‍্যাকেটের জন্য দুদিন বাবা মাকে বলে ফল না পাওয়ায় রাগ করে আছাড় দিয়ে টেনিস র‍্যাকেট ভাঙতে গিয়ে পড়বার ঘরের আলমারির দু-একটা শার্সি ও একটা টাইমপিস চূর্ণ করে ঠাকুমার ঘরে এসে তাঁর বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে নিয়ে যেতে এসে পুলিনের বউ বলেছিল, 'এমন করে আস্কারা দিলে কি করে মানুষ হবে বলো, মা।'

'হবে না ?' বলতে যাচ্ছিলেন গৃহিগিন্নী, 'মার কাছ থেকে ছেলে পালিয়ে আসে কেন বল, চারু।' বলতে গিয়ে থামলেন, মেঘটার একপাশে ডুবন্ত সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠল, একটু হেসে বললেন, 'ওর দাদুর মতো যদি হয়, আমরা কি করব. পুলিশের ডাকাতধরা চাকরী করে দিও।'

ঠিক তখন-তখনই টের না পেলেও কিছুদিন পর থেকেই লোকে আন্দাজ করেছিল গৃহিগিন্নীর মস্তিষ্কটা নরম হয়ে আসছে বৃদ্ধত্বের দরুন। অবশ্য দেহের দিক থেকে এ পরিবর্তনটা আগেই সূচিত হয়েছিল : গালের দুপাশের মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে যাওয়ায় কথা বলবার সময়ে একটু বেশি নড়ত চিবুকটা : চোখের উপরের পাতাটা একটু ফুলো-ফুলো, চোখের কোলেও মাংসল ছোট-ছোট ভাঁজ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ, যখন প্রয়োজন হত, তখন শিথিলতার উপর দিয়ে তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পর্দাটাই চোখে পড়ত। বড়ছেলে পুলিন, মেজবৌ বিনতা, সরকার মাধব সেন এরা কেউ-কেউ কোনো না কোনো সময়ে সেটা অনুভব করেছে।

মস্তিষ্ক নরম হওয়ার সব চাইতে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিল অনভ্যস্ত সংবেদনশীলতায়। আজকাল এক-এক সময়ে মনে হয় তিনি যেন সকলের মনের কথা জানবার অপেক্ষা করেন কোনো বিষয়ে নিজের হুকুম ধার্য করবার আগে।

সরকার মাধব সেনের চোখে সর্বাগ্রে পড়েছিল বিষয়টা। দু-চারজন প্রজা দুর্ভিক্ষের অজুহাতে ঝি চাকর মারফৎ আর্জি পাঠিয়ে প্রায় দু বছর করে খাজনা মাপ আদায় করে নিল। সেদিন রাত্রিতে মাধব সেন অনেক রাত অবধি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করল বিষয়টা, বলল, 'কি হবে আর গৃহবাড়ির সরকারী করে, আর কে সম্মান করবে বলো।' মাধব সেন ভাবল, ঝি চাকর যাতে আর্জি পৌঁছে না দেয় তার ব্যবস্থা একটা করা দরকার। কিন্তু ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে গিয়ে মাধব সেনের মনে হল—গৃহিণী সম্বন্ধীয় কোনো ব্যাপারে তাঁকে গোপন করে ব্যবস্থা! রাতে ফিরে এসে অনুভবটি স্ত্রীকে বলল, 'ওরে এ কি গায়ের জোরে চলে, চলে শীলমোহরের ছাপে।'

বস্তুত ব্যাপারটা আজকাল দাঁড়িয়েছে তাই। কলেজদিনের মতো হাত-কাটা ব্লাউজ পরে সিনেমা যাবার প্রস্তাব করেছিল বিনতা, মোটরের হুড মাথার উপরে রাখতেও তার অনিচ্ছা ছিল। শুনে চারুশীলা বলল, 'ভালো কী?'

বিনতা প্রবল কতগুলি যুক্তি দিল, সেগুলিতে মোহগ্রস্ত হয়ে চারুশীলা বলেছিল, 'যাও।' এমন কি বিপিন শুনে একটা ব্লাউজ পছন্দই করে দিল। শাশুড়ী তার যাওয়া বা ফেরা কোনোটাই দেখতে এলেন না, তবু দেখা গেল বিনতা পুরো-হাতার একটা ব্লাউজ পরেছে, স্বামীর হালকাগড়নের নতুন মডেলের পরিবর্তে পুলিনের পুরানো কালো এবং পর্দাআঁটা বড় গাড়িটায় করে ফিরে এসেছে।

কথাটা প্রথমে শুনেছিল চারুশীলা। তার খাস ঝি এসে বাসি জল ও রাতের ছাড়া কাপড় বার করে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, 'কাল সারা রাত দিদিমার ঘরে আলো জ্বলেছে।' তারপর স্বর নিচু করে বলল, 'আজকাল বোধহয় ভুলটুল হচ্ছে একটু।'

কিন্তু বাইরের ঝির চাইতে ঘরের বউ শাশুড়ীকে বেশি চিনবে বলা বাহুল্য। চারুশীলার আশঙ্কা হল, ঘর থেকে বেরিয়ে শাশুড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'অসুখ করেনি তো, মা?'

খুব বেশি সর্দি হলে যেমন চোখ-মুখ ছল-ছল করে এমন মুখ তুলে গৃহিণী বললেন, 'কে, চারু? না অসুখ করেনি বোধহয়।'

'রাতে ঘুম ভালো হয়নি?'

'বোধহয় তাই।'

তারপর বিনতা এল।

'চোখ মুখ ছল-ছল করছে, সর্দি হয়েছে খুব?'

'না, তেমন কিছু হয়নি।'

'না হলেই ভালো। আজকাল যা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে ঘরে-ঘরে।'

পুলিন এল, বিপিন এল পুলিন চলে যাবার আগেই। বিপিন ও পুলিন মা'র খাটের উপর বসল জোড়া আসন করে। বিপিন পুলিনের চা জলখাবার

এল মা'র ঘরে। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে এক ট্রেতে দুই কর্তার খাবার কি করে নেয়া যাবে, কে নিয়ে যাবে, অনভ্যস্ত বলে সাব্যস্ত করবার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত চারু বড়বউ হিসাবে ট্রে নিয়ে গেল শাশুড়ীর ঘরে। ট্রেটা নামিয়ে দিতে হাতটা কেঁপেছিল চারুশীলার। বিনতা জানলার আড়াল থেকে দেখেছিল খাটের উপর থেকেই দু-ভাই খাচ্ছেন ট্রে থেকে খাবার নিয়ে ; হঠাৎ মনে হল তার, এবার কি ওরা দু-ভাই বই গুছিয়ে পড়তে বসবে। বিনতা মনের কল্পনায় নিজে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

বাইরে মাধব সরকারের কানে খবরটা পেঁাচেছিল। সুমার ও জমার খাতা গুলির আড়ালে অধস্তনদের কৌতূহল চাপা দিয়ে মাধব বাইরে এসে দাঁড়াল তামাক খাবার অজুহাতে। অনামনস্ক হয়ে ভাবল—হা হা. বাঁচবেন না তাহলে ? সময় হয়েছে বটে, তাহলেও। বস্তুত এমন বিচলিত গৃহগিন্নীকে এরা কেউ দেখেনি। রাতে তাঁর ঘুম হয়নি, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো দেখাচ্ছে যেন কান্নার পরে।

বাড়ির আবহাওয়া যখন স্তম্ভিত হয়ে আসছে তখন অবশ্য গৃহগিন্নী নিজেও টের পেলেন তিনি বিচলিত হয়েছেন। এর পরে তিনি লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বামুন মেয়ে নিরামিষ ঘরে রান্নার যোগাড়ে গেল। ক্ষীরো ঝির বদলে চারুশীলা নিজেই এল শাশুড়ীর মাথায় তেল দিতে।

বেলা দশটার মুখে হাতে থান ও গামছা নিয়ে স্নানের ঘরে যাবার জন্য যখন গৃহগিন্নী উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন রোদে মুখ লাল করে ঘামে চিটমিটে গা নিয়ে পুলিনের সেই ডাকাত-ধরা ছেলেটা ফিরে এল। বলল, 'সব মিছে কথা, বুড়িয়া, ওরা হাসল শুধু।'

এমন অশ্রদ্ধেয় কথাবার্তা বলার অধিকার নাতিকে দিয়েছেন যে এটা চারুশীলার সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ায় খানিকটা এবং কোনো বিষয়ে কৌতূহলের কাছে তাঁর স্থৈর্য হার মেনেছে এ দুর্বলতা প্রকাশ হল বলেও আর খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়লেন গৃহগিন্নী। একটু অপ্রতিভ হয়ে চেয়ে রইলেন।

ডাকাতে ছেলেটি কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে ঠাকুমার খাটে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। গৃহগিন্নী সিঁড়ি দিয়ে প্রায় উঠোন পর্যন্ত নেমে গেলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে এক নজর যেন দেখলেন কেউ আসছে কিনা, তারপর আবার ফিরে এলেন নাতির সম্মুখে, 'কাকে তুই জিজ্ঞাসা করলি ?'

'কেন, গণেনদাকে, বুঝতে পারনি বোধহয়, চিটাগং আরমারি রেইডে ছিল।'

'কি জিজ্ঞাসা করলি ?'

'আমি বললাম, বলুন তো গণেনদা, আমার দাদু অমুক গুহকে গুলি করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিনা আপনাদের। গণেনদা হো হো করে হেসে উঠে বলল,—'তিনি বোধহয় অনেকদিন আগেকার লোক। গণেনদার হাসি দেখে ওরা ভাবল আমি মিছে দাম বাড়াতে গিয়েছিলাম।

গৃহিণী বললেন. 'তা তো বলবেই, তুই যাস কেন ?'

'বাঃ, যাব না। মুখুজ্যে, রায়, চৌধুরী সকলে বোমা বানাতে পারে রিভলবার ছুঁড়তে পারে আর গুহরা বুঝি চিরকাল বোকা হয়ে ছিল। আমি ওদের বললাম—তোমরা বড়-বড় ওস্তাদী জানতে আর আমার দাদু তোমাদের উপরের ওস্তাদী জানতেন। গণেনদা আবার হেসে বললেন,—কিন্তু বোমা বানাতে জানতো না দাদু। আমি বললাম, দাদু না হয় না জানতেন আর কোনো গুহ হয়তো জানত তোমার চাইতে পুরনো রিভলবারওয়ালা কাউকে পেলে জেনে নিই। মন্তি মুখুজ্যে কি না তাই সে বলল গণেনদাকে যে বাঘা যতীন তাদের কে যেন হত। মন্তি একটা চালিয়াত। আমি বললাম মন্তিকে—যোগেন চাটুজ্যে আসছেন কোলকাতায়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঠিকই বলতে পারবেন গুহরা ছিল কি না তাঁদের সময়ে।'

মন্তির কাছে হার মানবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে নাতি বলল, 'দেখো তুমি আমি খুঁজে বার করবই। পুলিশের গোপন কাগজপত্তর সব লোককে দেখানোর জন্যে যাদুঘরে রাখা হয়েছে, সেগুলি না হয় পড়ে ফেলব।'

নাতি এমন উত্তেজিত হবে সেটা দোষের কিছু নয়। কাল রাত্রিতে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে নাতির সঙ্গে গল্প আরম্ভ হয়েছিল। ডাকাতে নাতি হাত পা ছুঁড়ে জিভ্ দিয়ে টাক্‌রা আঘাত করে রিভলবারের গর্জন অনুসরণ করে বাংলার অগ্নিযুগের গল্প বলছিল, তখন তিনি অতীতকালের দু-একটা কথা বলেছিলেন। তখন উঠেছিল অমুক গুহ পুলিশের জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনারের কথা।

উত্তেজিত নাতি একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাঁর মনে হল না, অনেক দিনের কথা মনে হয়ে চোখ জ্বালা করল, চোখের কোণগুলি ভিজে উঠল। সকালে উঠে কাল রাত্রির ঘটনাগুলি ও চিন্তাগুলি একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল, আচ্ছন্নের মতো হয়েছিলেন তিনি ; অনেকক্ষণ বুঝতেই পারেননি তাকে কেন্দ্র করে বাড়িটা কৌতূহলী ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কল দিয়ে ছল-ছল করে জল পড়ছে, গৃহিণী ভাবলেন :

১৫ খৃষ্টাব্দে কিম্বা ১৬তে হবে, তখন গুহ ইউ পি-তে। কুম্ভমেলাও নয়, হরিহর ছত্রও নয়, সাধারণ একটা শহরের একটা ছোটখাট উৎসবের মেলায় হারিয়ে গেল ছেলেটা। ঝক্‌ঝকে হাসিমুখে আঠারো বছরের ঠাসা-ঠাসা ভরে-ওঠা বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, খিচুড়িটা নামিয়ে নাও, দেখে আসি কিমা পাওয়া যায় কিনা। খোঁজা হয়েছিল, পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের ছেলে, চোখ লাল করে সারা রাতের পরে ফিরে এসে ছোট একটা ছেলের মতো কেঁদেছিল ডেপুটি কমিশনার। দুদিনের মধ্যে জেলাটার বনজঙ্গলের মধ্যে মানুষের পায়ের দাগ পড়ে গেল, বহুদিনের ফেরার চার পাঁচটা রাক্ষুসে ডাকাত ধরা পড়ল, ছেলে পাওয়া গেল না।

মলিন বস্ত্রে রুক্ষ চুলে গৃহজায়া দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। দেশের বাড়িতে ফিরে শোকটা কিন্তু সহজে নিবারিত হল। ফলন্ত গাছগুলি দেখেই বোধ করি গৃহজায়া নিজের মনকে বোঝালেন একটি ফল অকালে খসে গেল বলে গাছটাই যদি শুকিয়ে ওঠে অন্য ফলগুলিও যে শুকিয়ে যাবে। সে হয়তো হিমালয়ে আছে। ভারতবর্ষে এমন কত হয়। কত লোকের ছেলে মার কথা মনে রাখতে পারে না. উখী মঠ স্থাপন করে তারা। তাদের জন্য শোক করতে নেই. আত্মার অধোগতি হয়।

কিন্তু তারপর গাঁয়ে এল সেই সন্ন্যাসীর ছেলেটা।

গৃহিগিন্নী গায়ে জল ঢালতে গিয়ে থামলেন।

একদিন বিকেলে ডেপুটি কমিশনার বাড়ি ফিরে এসে বললেন. 'গৃহজায়া. একটা সন্ন্যাসীকে স্থান দেবে তোমার বাড়িতে ?'

গৃহজায়া (এখনকার গৃহিগিন্নী) হাসিমুখে কি একটা বলতে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের শুকনো মুখ দেখে বলেছিলেন, 'কি ব্যাপার বলো তো।'

'কিছু নয়,' বলে ডেপুটি উঠে গিয়ে বৈঠকখানায় বসে অনেকক্ষণ তামাক টেনেছিলেন কিন্তু নিজের অন্তর যখন বুদ্ধিবৃত্তির পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে তখন স্ত্রী ছাড়া পুরুষের চলে না, কাজেই ফিরে এসে বললেন, 'বউ. সন্ন্যাসী ঠিক নয়, উসকোখুসকো চুল—মুখে অল্প-অল্প দাড়ি, ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড়, একটি অল্পবয়সী ছেলে।'

গৃহিগিন্নীর হৃৎপিণ্ডটা ছলকে উঠে খালি হয়ে গেল যেন. গৃহিগিন্নীর মনে আছে তিনি কান্নাকাতর হয়ে বলেছিলেন, 'কার ছেলে. কে সে, বলো।'

ডেপুটি কমিশনার বলেছিলেন, কেমন যেন দেখতে. যেন কি-কি মিল আছে।'

টেবিলের কোণটা চেপে ধরে গৃহিগিন্নী সামলে নিয়েছিলেন।

'গায়ে কতগুলি ঘা বিষিয়ে উঠেছে।'

'বিষাক্ত ঘা. খারাপ লোকদের যা হয়, না, ও ছেলে আমার নয়।'

পুলিন কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে গৃহিগিন্নী বললেন, 'বিষাক্ত ঘা কি আমার ছেলের গায়ে হয় ?'

চলে গিয়েও গৃহিগিন্নী আবার ফিরে এসেছিলেন, বিষাক্ত ঘা যার গায়ে সেই লোকটির কথা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

'কোথায় আছে সন্ন্যাসী ?'

'গ্রামের পাশে, কাশের জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে ছিল, গ্রামের কয়েকজনে একটা চালা তুলে দিয়েছে।'

'আহা, কার বা ছেলে। ওর মা কী কখনো ভেবেছিল এমন বিপথে যাবে ছেলে !'

সন্ধ্যার আলো দিতে এসে গৃহগিন্নী দেখলেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে গৃহ একটু একটু মদ খাচ্ছে। কাছে সরে এসে গৃহের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন গৃহগিন্নী, 'এত মনমরা হয়ে আছ কেন? কি ভাবছ বলো?'

'না কই।' চুরুট ধরিয়ে গৃহ উঠে দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা, ছেলেটার ঘাগুলি কি সত্যি বিষাক্ত?'

'মনে হয়। গ্যাংগ্রিনের মতো বাঁ হাতটা পচতে আরম্ভ করেছে', একটু পরে বলেছিলেন, 'তুমি যাবে নাকি একবার?'

'আমি, কেন? ও রকম করে বলো না।' আশঙ্কায় অন্তরটা ধক্ করে উঠল গৃহগিন্নীর।

পরদিন সকাল গড়িয়ে গেল, দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল বেলায় আর থাকতে না পেরে গৃহগিন্নী স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'যদি সন্ন্যাসীকে কেউ দেখতে যায় নিন্দা হয় নাকি?'

মুখ থেকে কড়া চুরুট, চোখের সম্মুখ থেকে কড়া ক্রাইম নভেল সরিয়ে ডেপুটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায়? ও, সে বেঁচে নেই। কাল রাত্রির অন্ধকারে শেয়ালরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু (বলতে গিয়ে গলাটা কাঁপল) দুধ খেয়েছিল বটে মায়ের। রোগশীর্ণ গায়ে কি শক্তি, একটা জানোয়ারও পাশে পড়েছিল, কে যেন পাঁচ আঙুল দিয়ে সেটার গলার শিরাগুলি চুপসে দিয়েছে

'আহা, কে সে মা গো।'

গৃহগিন্নী মাথায় জল ঢালতে লাগলেন।

এর বহুদিন পরে স্বামীর পুরানো চিঠি ঘাঁটতে গিয়ে একটা চিঠি পেয়ে কেমন লেগেছিল গৃহগিন্নীর। পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে সেই সন্ন্যাসীটার গ্যাংগ্রিন হওয়া হাতের মধ্যে থেকে বেরিয়েছিল শিসের কয়েকটা টুক্‌রো, যা রিভলবারের গুলিও হতে পারে। চিঠিটা লিখেছিল সদরের সিভিল সার্জন। খবরটা জানিয়ে লিখেছিল,—আপনার অনুরোধে খবরটা গোপন রাখা হল। অনাহার, গ্যাংগ্রিন, সর্বোপরি বন্যজন্তু বলে সার্টিফিকেট দেয়া হল। কিন্তু গোপন করতে বলছেন কেন কৌতূহল হচ্ছে, দেখা হলে আলোচনা হবে।

স্বামী বেঁচেছিলেন না তখন, কাজেই গৃহগিন্নীর কৌতূহল মনের মধ্যে থিতিয়ে গিয়েছিল। হয়তো কোনো ফেরারী ডাকাত, কাজ বেড়ে উঠবার ভয়ে স্বামী গোপন করেছিলেন। কিন্তু কোন বা সে মা, যার বুক জুড়ে মাণিক হয়েছিল এই ছেলে।

একবার একটা অদ্ভুত কল্পনা মনে এসেছিল, শিউরে উঠে পুলিনের ও বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, তা কি করে হবে, তাঁর ছেলে ডাকাত হবে। মানুষ মারবে! ছি-ছি। এর পরে কয়েকদিন ধরে গৃহগিন্নীর মনটা

করুণায় কোমল হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ কি হল কাল রাত্রিতে, এইসব পুরানো অনুভূতি মনে হতে লাগল। স্বামীর পুরানো চিঠি বার করতে গিয়ে সিভিল সার্জনের চিঠিটাও চোখে পড়ল। হাতের গ্যাংগ্রিনের মধ্যে বেরিয়েছে রিভলবারের গুলির টুকরো আর একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, মনে হয় দেশী মতে অশিক্ষিত হাতে চিকিৎসা করতে গিয়ে, উপড় সারেনি, পচন ধরেছে।

না, স্বামী তাঁকে কিছুই বলেননি। ছেলে হারাবার পর কড়া চুরুট, কড়া মদ ও কড়া ক্রাইম নভেলে ডুবে থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন অত বড় বুকের ভেতরে হার্টটা থেমে গেল।

খবরের কাগজে কাল রাত্রিতে গৃহিণী পড়ছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের কথা। বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়দের কথা পড়ে বেদনাবোধ হচ্ছিল। খবরের কাগজে তাদের মায়েদের মনের কথা একটাও নেই। কত না নীরব জল পড়েছে তাঁদের চোখে অন্ধকার রাত্রির গোপনে।

ফোঁপানোর মতো মনে হল : বুকের কাছে তুলে ধরে মানুষ করা ছেলেটির দেহ যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায়...তখন? তখন মনে হল তাঁর সেই ছেলেও হারিয়ে গেছে। ভাবতে গিয়ে হু-হু করে চোখ ছাপিয়ে এল গভীর রাত্রির আড়ালে। মা'র মন সহজেই ছেলেদের অশুভ কল্পনা করে বসে, রাত জাগলে আরও বেশি হয়। একবার তাঁর মনে হল, তাঁর ছেলেও কি ওদেরই একজন। বুকটা তোলপাড় করে উঠল গৃহিণীর, ডেপুটির বন্ধু সেই সাহেবটি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গেই প্রায় গ্রামে এসেছিল, সঙ্গে অনেক লোক, অনেক গুলি বন্দুক নিয়ে সে কি এসেছিল ঐ মানুষের ছেলেটিকে শিকার করতে? শিকারকে আহত ভূমিশায়ী দেখে ঋানু শিকারী যেমন বিশ্রাম নেয় তেমনি বিরাম ভোগ করছিলেন গৃহবাড়ীর প্রাচুর্যের মধ্যে। জানালার বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে মনে হল—যেন সেই সন্ন্যাসীটি তাঁর ছেলে। বিপ্লবী হয়েছিল, আহত হয়ে হয়তো সারা ভারতের তৃষ্ণার্ত গোপন পথে রাত্রির কাঁটাগুলির উপর দিয়ে গ্রামে এসেছিল, মা'র কোলের কাছে আসবার জন্যে, মা'র হাতখানা কপালের উপর পাবার জন্য। কি অসহ্য বেদনা হয়েছিল হাতের, কি দুঃসহ তৃষ্ণা। লোককে লুকিয়ে বেড়াতে হত বলে হয়তো অনাহারে দিন কেটেছে। ভেবেছিল, যে মা'র ছেলে হারিয়ে গেছে তার সদাজাগ্রত অন্বেষী দৃষ্টি কাশের জঙ্গল থেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাবে। দেখা হয়েছিল পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের বর্ম চড়ানো বাবার সঙ্গে। হয়তো ভূমিতে শায়িত অবস্থায় ভীত পাংশুমুখে সে প্রার্থনা করেছিল, হে ভগবান, হে দেশজননী, উনি যেন আমাকে চিনতে না পারেন। কালই আমি চলে যাব। তারপর যখন রাত অন্ধকার হল তখন হয়তো মাকে পাবার লোভ বড় হয়ে উঠেছিল, চলে যেতে পারেনি। হয়তো বা অনুচ্চস্বরে কেঁদেছিল, মা, মাগো।

ঢোক গিলে চোখের জল মুছে গৃহগিন্নী ভাবলেন—বহুদিন আগে ছুরি দিয়ে হাত কেটে ফেলে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে কেঁদেছিল—মা, মাগো। চাপা ছেলে চিরদিনের। হয়তো মা বকবেন এই ভয়ই হয়েছিল তার—গ্রামে এসেও সামনে আসতে পারেনি।

কিন্তু স্নান সেরে গৃহগিন্নী ঘরে ফিরে এলেন, কালকের অনিদ্রার গ্লানি অনেকটা দূরে হয়েছে।

আসন পেতে পূজা করতে বসে মনে হল—তাই কি হয়, সে হয়তো হিমালয়ের কোথায় নিজের আত্মার কথা ভাবছে। এখন কি মা'র কথা মনে পড়ে তার? অনেক বড় মা পেয়েছে সে।

তবু আর একবার মনে হল—তখনকার দিনে এতটা অগ্রসর ছিল না সমাজের অবস্থা। কেলেঙ্কারির ভয়েই কি তাঁর স্বামী নিজের ছেলেকে বুকে তুলে নেননি, তিনিও যাননি একবার চোখের দেখা দেখতে। তাই যদি হয়ে থাকে কি তার প্রতিকার? কি করেই বা জানা যাবে আদৌ সত্য কিনা তাঁর কল্পনা। নাম বললেই বা কে চিনবে। বাপ মা'র দেয়া নাম তো ওরা দলের খাতায় লেখে না। বরং পুলিনের ছেলেটার মতো হাস্যাস্পদ হতে হবে হয়তো।

বম্‌ বম্‌ করে গাল বাজিয়ে শিবের মাথায় বেলপাতাটা দিতে-দিতে আবার তাঁর মনে হল—সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমার কাছে এলে না, আমার চোখের জল পড়ছে, সে জলে যেন তোমার অমঙ্গল না হয়।

চারুশীলা নিজে ভাত নিয়ে এল। বিনতার হাতে জলের গেলাস, আসন।

হাসিমুখে গৃহগিন্নী বললেন, 'কি বাড়াবাড়ি কর, চারু. কি শুরু করলে, বিনতা।'

খুশিও হলেন গৃহগিন্নী।

শহিদ

মহাত্মা সীতানাথ একাডেমির তৃতীয় শিক্ষক শ্রীবিনোদলাল কড়ুই সদরের শহরে গিয়েছিল বলেই এই গল্প। বিনোদলাল লম্বা, টিমসে হলুদ রঙের। কপালে বলি, নাকের দু-পাশে ভাঁজ, গাল তোবড়ানো। রোগা-রোগা হাতে-পায়ে অজস্র শিরা-উপশিরা কিলবিল করছে। পিঠের ও কাঁধের হাড় জামার তলায় ধারালো হয়ে ফুটে উঠেছে। তার বয়স এবার সাতান্ন পার হয়েছে। কিন্তু একটু আনুপূর্বিক বলা দরকার।

দরজা বন্ধ করা ছিল হেডমাস্টারের হুকুমে যাতে বাইরের খোলা পৃথিবী শিক্ষক এবং ছাত্রদের মনোনিবেশের গাঢ়তাকে হালকা করে না দেয়। কিন্তু বাঁশের বাখারির উপরে মাটি এবং তার উপরে এক ফেরতা চুনের কলিতে তৈরি দেয়ালের একটা জায়গা দরজার পাশেই ভাঙা। বিনোদলালের মনোযোগ সেই ভাঙা-পথে অকর্তব্য-পরায়ণ ছাত্রের মতো পলায়ন করল। দ্রৌপদী দপ্তরি খালি গায়ে মাথায় গামছা দিয়ে ঘড়ি পিটতে যাচ্ছে। মনোযোগ-ভ্রষ্ট হওয়ার আগের মুহূর্তে শিক্ষক-মশাই যে বাক্যটি শুরু করেছিল সেটায় ব্যায়াম শব্দটা ছিল। সেটা শেষ হওয়ার আগেই এই দুর্ঘটনা। নিচের পাটির ক্ষয়াবশিষ্ট দু-তিনটি হলুদে দাঁত প্রকাশিত করে হাই তুলতে বাধ্য হয়েছিল সে। ব্যায়াম শব্দটির শেষভাগ হাইয়ের ফাঁপা অনুনাসিক শব্দে মিশে গেল। ঘণ্টাও বাজল।

তৃতীয় শিক্ষক তাদের বসবার ঘরে এল। কয়েকটি বার্নিশহীন কাঠের আলমারির ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকখানি চেয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিক্ষকদের জন্যে। মাথার উপরে টিনের ছাদ রোদে তেতে, কট্‌কট্‌ করছে। বাইরে চৈত্রের রোদে-পোড়া চরাচর। ঘাসগুলো শুকিয়ে খড়ের রঙ নিয়েছে, তার উপরে ধুলোর স্তর জমেছে। একদিকে কিছু ঝামা ইঁট জমা করা, তার পাশে একটা পেঁপে গাছ। তার রোদে ঝলসানো ডালে একটা কাক কর্কশতার ঐক্যতানে সংযোগ রাখতে উপস্থিত। শিক্ষকরা খাতা-বই মুখের সম্মুখে নেড়ে-নেড়ে গরম তাড়াচ্ছে। হেডমাস্টারের ঘরে অবশ্য নতুন টানা-পাখা টানছে এক ছোক্‌রো।

তা ভালো, এটা যেন তৃতীয় শিক্ষকেরই একটি সফলকাম উচ্চাভিলাষ। এরকম একটি ঘরই সে হেডমাস্টারের জন্যে কল্পনা করত। কারণ মহাত্মা সীতানাথ একাডেমি যখন স্থাপিত হয়েছিল তখন থেকে প্রায় বিশ বৎসর সে-ই

হেডমাস্টার ছিল। সে সময়ে যা হয়নি এই নতুন হেডমাস্টারের বেলায় তা হয়েছে। তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলাল এখন আর বিদ্বেষ অনুভব করে না। করেছিল বটে যখন কমিটি সরকারী সাহায্য বেশি করে পাওয়ার জন্যে একজন বি-টি পাশ করা অল্পবয়সী হেডমাস্টার এনে বিনোদলালের মাথার উপরে বসাল। সে ঘটনা দশ বছর আগেকার। চার বছরের পুরনো একটি ঘটনাও আছে, একেবারে টাটকা এম-এ, বি-টি হেডমাস্টার এসে বিনোদলালের মাথায়-বসা হেডমাস্টারের উপরে বসেছে। বিনোদলাল তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে কোঁচার খোঁট দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, আর দ্বিতীয় দফার হেডমাস্টার তার সম্মুখে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে একটা তালপাখা নাড়ছে নিজের মুখের সম্মুখে।

এমন সময়ে ডাকপিওন এল।

চিঠি! আশ্চর্য হল বিনোদলাল। উপাধি কি লিখেছে?

ডাকপিওন পড়ে বলল, 'কড়ুই।'

তাহলে, বিনোদলাল ভাগ্যনির্ভর হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তাহলে আমারই হবে। 'ড'য়ে বিন্দু 'ড়'কে কেউ-কেউ ইংরাজিতে 'ডি' দিয়ে লেখে বটে।

সরকারি খাম। একেবারে টাটকা নয়, আরও দু-একবার এটায় করে চিঠি চালাচালি হয়েছে। খামের উপরে কাগজের তাপ্পি মেরে বিনোদলাল কড়ুইয়ের নাম ঠিকানা লেখা আছে। চিঠি খুলতে চেষ্টা করে বিনোদলালের হাত কাঁপল। সে চিঠি না-খুলে খামখানা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। পুরনো একটা ঠিকানা খামের পিছন দিকে নজরে পড়ল তার—পুলিশ সুপারইণ্টেণ্ডেণ্টের ঠিকানা ছিল সেখানে। চিঠিটা অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নেই : উঁচু মহলের ঠিকানা লেখা খামে যার যাওয়া-আসা।

কিন্তু এসব কিছুরই পক্ষে সময়ের একান্ত অভাব ছিল। বিনোদলালকে এবার ইতিহাস পড়াতে যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোঁচার খুঁটে হাওয়া খাওয়ার এই সময়টুকু ইতিহাস-ক্লাস থেকে চুরি করে নেওয়া। সুতরাং চিঠিটা পাশ পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল।

ক্লাসে বসে ইতিহাস বই খুলে পাঠ্য অংশ বার করে সে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আকবর।' এবং বলতে-বলতে চেয়ারের তলায় হাত গলিয়ে বেয়াদপ জুতোটাকে আঙুল দিয়ে টেনে-টুনে চটিত্ব থেকে জুতোর অবস্থায় নিয়ে এল। উত্তেজনার এক সময়ে সেটা অর্ধচ্যুত হয়েছিল। বাংলায় পড়বে ছেলেরা, বইটিও বাংলায় লেখা তবু আকবর সম্বন্ধে কিছু বলার আগেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—আকবর দি গ্রেট্। বছরের পর বছর এই একই ব্যাপার ঘটছে। ছেলেরা হঠাৎ ইংরেজি শুনে হকচকিয়ে যায়। বই খুলে অতঃপর বাবর ও হুমায়ুনের সঙ্গে আকবরের রক্তের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে বিনোদলাল বলে, 'আমরা ভিনসেণ্টস্মিথের বই পড়তাম হে—এই এত মোটা বই!' তারপর নিয়মিতরূপে আসে স্যার যদুনাথ সরকারের কথা। এবং

এই নামটা উচ্চারণ করতে-করতে বিনোদলাল যুক্তকর কপালে ঠেকাল কয়েক-বার। ছাত্রদের কেউ ভাবে সেটা আকবরের প্রাপ্য, কেউ ভাবে যদুনাথের। এরপরে একটা বাৎসরিক রসিকতা করার কথা বিনোদলালের।

কিন্তু রসিকতাটা এবারের ক্লাসে বাদ পড়ল। হেডমাস্টার এল।

'এই র‍্যা, খেয়েছে, দরজা যে খোলা।' এই স্বগতোক্তি করে বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল। হেডমাস্টার বলল, 'আপনি একবার আমার ঘরে আসুন।'

স্বাভাবিক মর্যাদার ছাপ কারো-কারো মুখাবয়বে থাকে না। পদমর্যাদাতুল্য গাম্ভীর্য আনতে গিয়ে তারা নিজের মুখের চেহারাকে যেমন করে, হেডমাস্টারের মুখ তেমনি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

হেডমাস্টারের পিছন-পিছন বিনোদলাল হাতড়ে চলার ভঙ্গিতে হাঁটছিল। হাঁটু নুয়ে-নুয়ে যাচ্ছিল ভয়ে।

হেডমাস্টার বলল, 'আপনি বাড়ি যান।'

'আমি? কেন-কেন?'

বলির পাঁঠার অনুভব নেই, বিনোদলাল অনুভবের বালাই নিয়ে টলতে লাগলো। অজ্ঞাত আশংকায় তার সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটল।

হেডমাস্টার যেন একটু সদয় হল, বলল, 'রিক্সায় করেই যান না হয়।'

কথাটা একটা নির্দয় বিদ্রুপের মতো শোনালো। বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল। তবে কি তার নিজের তৈরি এই স্কুলে তাকে তৃতীয়-শিক্ষক হিসাবেও থাকতে দেবে না? হেডমাস্টারের হাত ধরে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে কিছু একটা বলতে ইচ্ছা হল তার কিন্তু একটা অভিমান তাকে চূড়ান্ত হীনতা থেকে বাঁচাল।

বাড়ির পথে ফিরতে-ফিরতে বিনোদলাল চিন্তা করল—তাকে কি অশক্ত বলে তাড়ানো হল? কিন্তু তাহলে কি অন্তত নোটিশ দিত না? তবে কি পকেটের চিঠিটাই সে নোটিশ? হেডমাস্টার কি এ বিষয়েও তার বহুপ্রচারিত ক্ষিপ্র কারিতার পরিচয় রাখল? কিন্তু ব্যাপারটা তার পক্ষেও অতিদ্রুত ঘটছে না? তাহলে সেই তহবিল তছরূপের ঘটনাটাই কারণ হবে। নতুবা এমন নির্দয় ও আকস্মিক খড়্গাঘাত হত না। আঙুলের মাথায় গুণল বিনোদলাল, পনরো বছর হল। তখন সে হেডমাস্টার ছিল। ছোট ভাই সে বছর একই সঙ্গে এম-এ এবং ল-এর পরীক্ষা দিচ্ছে। তার ফীসের টাকা আর তিন-চার মাসের বাকি মাইনা বিনোদলাল স্কুলের তহবিল থেকে নিয়েছিল। মিথ্যাভাষণে অনভ্যস্তের মতো সে তার পরেও অনেক মিথ্যা-হিসাবে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু পনরো বছর পরে কি সেই ঘটনা তাকে এমন বিপন্ন করতে পারে? তা পারে। যদি হেডমাস্টার পনরো বছরের পুরনো হিসাব খাতা খুঁজে পেয়ে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কি আছে। ফৌজদারী কখনও তামাদি হয় না। ঘটনাটা বিনোদলাল মনের মধ্যেও সব সময়েই খুঁজে পায়।

'কি হবে, কি হবে বলো !'

দুটি ঘটনায় তার জীবন বাঁক নিয়েছে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য আকস্মিকভাবে ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কাছে থেকে একটি স্বর্ণপদক লাভ একনম্বর ঘটনা। এরই ফলে বংশগত বৃত্তি দোকানদারিতে তার রুচির অভাব দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনা এই তহবিল তছরূপ। মহাত্মা সীতানাথ একাডেমির তদানীন্তন হেডমাস্টার বিনোদলাল কড়ুই আদর্শকঠোর, শুচিতাদম্ভী ছিল ; চিত্তদৌর্বল্যের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড বৈর ; দারিদ্র্য ছিল রাজমুকুট। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহের কাছে যখন তার স্বাতন্ত্র্য, দম্ভ, এবং সততার তেজ পরাজিত হল এবং সে তহবিল তছরূপ করল তারপর থেকে সে মিইয়ে গেল। তার কন্ঠস্বরে পরিবর্তন দেখা দিল, স্বাস্থ্যের ঋজুতা নুয়ে এল। সে যে ডিস্টিংশনে বি-এ পাশ এটা তার মুখের ভাষা থেকে, পরে চিন্তা থেকেও দূরে সরে যেতে লাগল। এককথায় তখনই বর্তমানের তৃতীয় শিক্ষক নির্বিবাদী ভালোমানুষ বিনোদলালের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

সেই ভাই এখন জেলার প্রথম পাঁচজন লোকের একজন। নাম করা পয়সাওয়ালা উকিল, আইনসভার সভ্য। সদরের সাহেব পাড়ায় সাহেবি বাংলো বাড়ির গ্যারাজে নাকি একাধিক মটর গাড়ি তার। কিন্তু এ হেন ভাইয়ের জন্য মানসিক সুখভোগ বা আত্মতৃপ্তি অনুভব করার সুযোগ নেই মন্দভাগ্য বিনোদলালের। তার পরিবারের সকলে তাকে ছি-ছি করে ওঠে। একদা তিন-চার পৃষ্ঠাব্যাপী আশীর্বাদ, স্মৃতি-রোমন্থন ও গর্ববোধে ভরা দীর্ঘ একখানি চিঠি লিখেছিল বিনোদলাল তার ভাইকে। উত্তরটা আসতে অনেক দেরি হতে লাগল, অবশেষে তার ভাইয়ের একান্ত সচিব চিঠিটার প্রাপ্তিস্বীকার করেছিল। কিন্তু বিনোদলালের ভ্রাতৃবধূ বোধহয় একটি কারুণ্য দ্বারা চালিত হয়েছিল—মনিঅর্ডার করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিনোদলালের গৃহিনী এবং পুত্রকন্যারা অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

'হায়—হায়। একী হল !'

বিনোদলাল ঘরে ঢুকে দেখল গৃহিনী নেই সেখানে, বোধহয় পাড়া-বেড়াতে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে—নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা যাবে। ঘরের কোণে ছাতা রেখে বিছানায় বসল সে। মুহূর্তের একটা অংশ ধরে তার মনে ক্রুর একটা কিছু জাগ্রত হল—চাকরি গেছে, এবার সকলে বুঝুক তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলালের এই বৃদ্ধ বয়সের অক্লান্ত শ্রমের মূল্য কিছু আছে কিনা। কিন্তু কথাটার অন্যমুখের সঙ্গেও সে অপরিচিত নয়। বেদনায় সে ও-ও করে উঠল। জামা গায়ে বিছানায় শুয়ে দুহাত দিয়ে সে চোখ আড়াল করল কারণ, দু-চোখ ভরে অজস্র জল এসেছে।

অনেকক্ষণ মুহ্যমান থাকার পর প্রতিকার খোঁজবার অবস্থায় এল তার মন।

হাতির দাঁতের পাত—এমন সাদা, মসৃণ ও শক্ত কাগজ। নীলাভ একটা বর্ডার, এককোণে রাষ্ট্রীয় প্রতীক আঁকা। টাইপ-রাইটারে লেখা সরকারী চিঠি। তলায় জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তার সই। একাধিকবার আগাগোড়া সে চিঠিটা পড়ল। একটা কুয়াশা যেন তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঢেকে ফেলেছে। তারই মধ্যে সে একবার ভেবে নিল—এতদিন পরে কি সে সত্যি-সত্যি ইংরেজি ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে। প্রবল জ্বরের সময়ে মস্তিষ্ক অনেক ক্ষেত্রে এমন নিভে-নিভে আসে, প্রথিত একটা চিন্তা থেকে কথা খসে-খসে পড়ে যায়।

তারপর তার মনে হল একটা চূড়ান্ত কান্নায় সে নিজেকে বিস্ফোরিত করে দেবে, নিজেকে শতভিন্ন করে সংসারময় উৎক্রোশ কান্নায় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কান্নাটা গলার কাছে আটকে-আটকে গিয়ে কয়েকটি বিকৃত শব্দে পরিণত হল। মাথা কোটার মতো কয়েকবার বিছানায় মাথা ঠুকে চিঠিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদার চেষ্টা করল। কিন্তু তার অশ্রুগ্রন্থিগুলো তার বেদনার প্রতি উদাস হয়ে রইল, ইতিপূর্বে অন্য কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চোখে জল এল না। ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করে সে দেখল তার কান্নায় পাথর গলা দূরে থাক, কাঠ-বাঁশ প্রভৃতির দৈনন্দিন আকৃতিতেও কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। উপায়ন্তর না-দেখে সে শুকনো কান্নায় আউ-থাউ করতে লাগল।

বিনোদলালের মেজ ছেলের নাম ছিল সুধীরলাল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তার বয়স ছিল ষোল-সতেরো। ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল বলে বিনোদলাল একদিন রাগারাগি করেছিল। তারপর থেকে সুধীরলাল তার সামনে বড় একটা আসত না। তারপর একদিন কি একটা কাজে খোঁজ করতে গিয়ে বিনোদলাল শুনল সে সদরে তার পিসির বাড়িতে গেছে। সেই পিসির বাড়ি থেকেই ছেলে কোথায় কোনদিকে চলে গেল এই পাঁচ মিনিট আগেও বিনোদলাল জানত না। এখন সে নিশ্চিততম সংবাদ পেয়েছে। সেই ৪২-এ সদরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দপ্তর দখল করতে গিয়ে যে কয়েকটি তরুণ গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল সুধীরলাল তাদের অন্যতম। সুধীরলাল এবং সহমৃত অন্য কয়েকটি যুবকের প্রতিমূর্তি স্থাপনের উৎসব হচ্ছে—তাতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে সে।

বিনোদলাল চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে পকেটে রেখে বিছানা থেকে নেমে তামাক সেজে মেঝেতে উবু হয়ে বসল। তামাক খেতে-খেতে মেজ ছেলের অনেক ছবি যেন তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে লাগল। এত স্মৃতি যে তার মনে সঞ্চিত ছিল সে নিজেও জানত না।

কিন্তু ছেলের কথা কাকে সে বলবে? ছেলেদের কথা আলোচনা করতে গেলে গভীর একটা লজ্জাবোধ, অপরিসীম বেদনা ও অভিমানে তার কণ্ঠরোধ

হয়ে আসে। চিন্তাটা থেকে নিজের মুখ আড়াল করার জন্যে সে হুঁকোয় ঘন-ঘন টান দিতে লাগল।

তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—নয়টি সবশুদ্ধ। অপরিচিত একজন তার ছেলে-মেয়ের বয়সের পরিচয় পেয়ে প্রশ্ন করেছিল বিনোদলালের একাধিক বিবাহ কিনা। স্কুলের মাস্টারমশাইরা এ নিয়ে রসিকতা করে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছোকরা মাস্টার যে নাকি ছ-মাস হল বিবাহ করেছে সেও উপদেশ দিয়েছিল ফ্যামিলি-প্ল্যানিং সম্বন্ধে।

সামান্য সামান্য ঘটনা থেকে এ ধরনের আলোচনা উঠে পড়ে। দু-মাস আগে বাড়ির উঠোনে প্রকাশ্যে আলোচনাটা উঠে পড়েছিল। বিনোদলালের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা অবশ্য আলোচনার কুৎসিত দিকটা বুঝতে পারেনি কিন্তু তার ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটির মুখ লজ্জায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। বিনোদলালের ছোট ছেলেটির বছর চারেক বয়স। ধবধবে রঙ, টুকটুকে লাল ঠোঁটে ফুরফুরে হাসি। ছেলেটি অধিকাংশ সময়ে দাদা-দিদিদের পরিত্যক্ত জামা-কাপড় পরে থাকে। একদিন ছেলেটির কি খেয়াল হল সে তার বাবার কাছে একটা প্যাণ্ট চাইল আর বিনোদলাল এক টাকা দামের একটা প্যাণ্ট এনে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে যদি দোষের কিছু থেকে থাকে তবে তা এই যে সস্তা প্যাণ্টটিতে ছোট ছেলেটিকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

এমন দিনে এসব কথা মনে আসে কেন—এই ভেবে বিনোদলাল তামাক ছেড়ে উঠে পড়ল। সুধীর থাকলে সেও কি এসব আলোচনায় যোগ দিত? নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা যায় না। তার বড় মেয়ে এক সময়ে তার পক্ষ নিয়ে দাদা-বউদির সঙ্গে তর্ক করত এখন সে ধীরে ধীরে পরাজিত-পক্ষ ত্যাগ করছে।

হয়তো ওরা ঠিকই বলে। যতদিন সে হেডমাস্টার ছিল সে সংযমী ছিল কি না ছিল, হুঁসিয়ার ছিল। তারপর চাকরিতে অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে সে লোকজন বই পুঁথির সংস্রব ত্যাগ করতে শুরু করল, আর—

বিনোদলাল নিজেকে ধমকেও শান্ত করতে পারল না। এমন সময়ে তাকে বাঁচাল তার কনিষ্ঠ ছেলেটি এসে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুধীর সুধীর বলে সে উদ্বেলিত অশ্রুটার পথ করে দিতে পারল। এক সময়ে ছেলেটিকে বিছানায় বসিয়ে, পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তার পাশে বসে আবার পড়ল চিঠিখানা। বুড়ো বয়সের ছেলে দুরন্ত নয়, বরং যেন চিন্তাশীল। সে বাবার চিঠিপড়া দেখতে লাগল।

শহিদ। কথাটা ইংরাজিতেও তাই লিখেছে। বিনোদলাল এদিক-ওদিক চাইল। গত পুজোর বন্ধের আগে তার ছাত্রেরা তাকে একখানা অভিধান উপহার দিয়েছিল। বানানটা বাংলায় ‘ই’কার কিম্বা ‘ঈ’কার দিয়ে হবে তা দেখার ইচ্ছা হল তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলালের। অভিধানটা বার করে সে কথাটা খুঁজে বার করল। দুই বানানই অভিধানকার লিখেছে, শব্দটা মূলত

আরবী, অর্থ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। তা কথাটা যখন আরবী তা হলে 'শ' কেন হতেই হবে।

বিকেলে হেডমাস্টার এল। পদমর্যাদায় যাই হক বয়সে সে একালের। খবরের কাগজ পড়ে, ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে, একালের কাণ্ডকারখানায় তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

'যাচ্ছেন তো? নিশ্চয়ই যাবেন, এমন মহৎ উদ্দেশ্য যার পিছনে আছে।'

'তাহলে যাব।'

'আর এই নিন চল্লিশটা টাকা। আপনি চলে আসবার পর এস-ডি-ও অফিস থেকে আপনার পথখরচের জন্য পাঠিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়া-আসা, সদরে দু-দিন থাকা।

হেডমাস্টার অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল।

বিকেলে সে ছোট ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরুল। বহুদিনের একটা কামনা পূর্ণ হল তার। যে সঙ্কোচটা বাড়তে-বাড়তে ছোট ছেলেটিকে প্রকাশ্যে স্বীকার করার সাহসটাকেও শুকিয়ে দিচ্ছিল সেটা যেন আজ একেবারেই নেই। সুধীরলালের ভাই এই পরিচয়ই দেবে সে, তার ছোট-ছেলেটি সম্বন্ধে কেউ যদি রসিকতা করে প্রশ্ন করে।

রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে—বিনোদলাল ভাবল—স্ত্রীকে বলাই সঙ্গত হত। তারও তো ছেলে। তিক্ততা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে বেশি কথা না-বলা অভ্যাস করেছে সে। তার ফলে এমন খবরটাও সে দিতে পারল না। দারিদ্র্যজরাজীর্ণ স্ত্রীর জন্যে কিছুটা কারুণ্য সে অনুভব করল।

সাড়ে নটায় পৌঁছানোর বদলে প্রায় বারোটায় সদরের স্টেশনে নামল বিনোদলাল। কারণ একটি স্পেশ্যাল ট্রেণকে পথ করে দেওয়ার জন্যে তাদের গাড়িটাকে সাইডিং-এ ফেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু উৎসব, তার জন্যে কি উৎসবের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে না? কুণ্ঠিত হল সে।

স্টেশনের কাছেই গেট বাঁধা হয়েছে। এই তোরণ যে উৎসবের জন্যে তার মর্মস্থলে তার নিজের ছেলে এই অনুভব হল তার। তোরণটির প্রতি স্নেহবোধ করল সে, কাছে দাঁড়িয়ে সেটাকে স্পর্শ করার লোভ হল। কিন্তু তখন যাত্রীরা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে আসছে, সেই স্রোতে তাকেও চলতে হল। গেটের বাইরে 'সে তার সহযাত্রীকে আবার দেখতে পেল।

'এই যে, মশাই।'

'আর বলেন কেন।'

বিনোদলাল তার রিকশায় সহযাত্রীকে টেনে তোলার মতো করে উঠিয়ে নিল।

সহযাত্রীর নাম শচীন সাণ্ডেল, পথে আলাপ। মাঝবয়সী ভদ্রলোক,

পরনে ধোপদুরস্ত খাদি। চোখে মুখে কথা, কথায়-কথায় রসিকতা। জানে না এমন বিষয় নেই ; অত্যন্ত নামী রাজনৈতিক নেতারাও তার 'দাদা'। কিন্তু যেন অত্যন্ত সরল। নিজে সে অকপটে ছোট। বলেছে—উকিলের মুহুরির কর্ম করা হয়, মশাই, টাউটগিরি পেশা।

পথে আরও গেট ছিল। গাছে-গাছে লটকানো জাতীয় পতাকার মালা। বিনোদলালের প্রাণ একটি বেদনা-কেন্দ্রিক পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠল।

শচীন সাণ্ডেল বলল, 'আপনি তাহলে শহীদদের দিকেই যাবেন ?'

'আপনিও চলুন না।'

'তা চলুন। ওরা তো এককালে আমার আপনই ছিল।'

বিনোদলালের কৌতুহল হল। 'ওদের চিনতেন বুঝি ?'

শচীন সাণ্ডেল বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখাল।

'ওদের দুজন অন্তত আমার ফুটবল টিমে ছিল। আজ সুধীরলাল কড়ুয়ের নাম সকলের মুখেই শুনবেন, এক এম-এল-এ নাকি বলছে—তার ভাইপো। সরকারি ইস্তাহারে নাম বেরিয়েছে কিনা। কিন্তু তখন তার মৃতদেহ সনাক্ত করতে কেউই আত্মপ্রকাশ করেনি।

'আপনি সুধীরলালকে চিনতেন ?'

'তারই জন্যে সব চাইতে বেশি ভাবনা ছিল। সে মরতে ভয় পেত। তাকে বোঝাতে হত রাইফেলের গুলিতে শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেলে বেদনা অনুভবের ক্ষমতা থাকে না, যা থাকে ফুটবল খেলায় সাধারণ চোট লাগলে যেমন হয় তার চাইতে বেশি নয়।'

বিনোদলাল রিকশার হাতল চেপে ধরল।

শচীন সাণ্ডেল বলল, 'তবে কেন উকিলের মুহুরি ? দেশের জন্যে স্কুল ছেড়েছিলাম মশাই, পাশ দেওয়া হয়নি। আর—চার অধ্যায় পড়েছেন ?—হ্যাঁ তাই, বেয়াল্লিশের পরে পাঁচ বছর লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সাতদিন এক এলা জুটেছিল ; যেমন কুৎসিত তেমনি মুখরা, কিন্তু শরীর ছিল।'

সামনে মর্মর বেদীর উপরে তেরপলে ঢাকা হাউই কামানের মতো কি একটা দেখা যাচ্ছে লোকারণ্যের মাথার উপর দিয়ে। বেদীর ওপাশে রেশমি রিবন ও জাতীয় পতাকায় সাজানো সুদৃশ্য এক মণ্ডপে অনেক টেবিল চেয়ারে অনেক সুসজ্জিত মানুষ।

শচীন সাণ্ডেল বলল, 'যে রকম ভিড় দেখছি, পকেট-মারা না যায়।'

'এমন সভায় কে আর পকেট মারতে আসবে ?' বিনোদলাল রুমালে বাঁধা বুকপকেটে রাখা টাকা কয়েকটি হাত বুলিয়ে অনুভব করল।

রিক্সা থেকে নেমে বিনোদলাল ভাড়া দিতে গেল।

'আরে না-না আপনি কেন ?' শচীন সাণ্ডেল নিজে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বন্ধুর ভঙ্গিতে বিনোদলালের বুকে একটা হাল্কা চাপড় দিয়ে তাকে উৎসাহিত

করল ; তারপর তার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

বেদীর উপরে কামানের মতো ঐ যে কিছু দেখা যাচ্ছে আজকের যা কিছু ওখানেই হবে। তেরপলটার চারিদিকে রঙিন দড়ি বাঁধা। হয়তো কোনো যন্ত্রকৌশলে ওই দড়িতে টান পড়বে আর তেরপলটা ধীরে-ধীরে গুটিয়ে গিয়ে শহিদদের অনাবৃত করবে।

বিনোদলালের দৃষ্টি মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট করে শচীন সাণ্ডেল তার ঝকঝকে ভাষায় মঞ্চোপবিষ্টদের পরিচয় দিয়ে চলল, 'ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-সাহেব, জেলা-জজ, কংগ্রেসের জেলা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী।' তারই মধ্যে কাত হয়ে, কনুই দিয়ে ভিড় গুঁতিয়ে শচীন ক্রমশ এগিয়েও যাচ্ছে। বিনোদলাল তার মতো পারছে না। দু-এক সারি মানুষের ব্যবধান ইতিমধ্যে হয়েছে তার শচীনের সঙ্গে।

এমন সময়ে বিনোদলালের মনে পড়ল সে আজকের এই উৎসবে বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত। সে চাপা গলায় শচীনকে বলল, 'মঞ্চে যাবার রাস্তা কোনদিকে? যাব?'

'তা যান।' শচীন মুখ না ঘুরিয়েই বলল।

বিনোদলাল ঘুরে-ঘুরে মঞ্চের প্রবেশ পথের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। লাল কাঁকড়ের উপর ম্যাটিং পাতা, পাতাবাহারের টবে সাজানো, পুলিশের বর্ডার দেওয়া সেই পথে সারি-সারি মোটর গাড়ি পার্ক করা। এখনও দু-একজন করে আসছে। সেরোয়ানি-আচকান পরিহিতরা মঞ্চে চলে যাচ্ছে মোটর থেকে নেমে। একজন পুলিশ বিনোদলালকে দেখতে পেয়ে বলল, 'স'রে যান, মশাই।'

বিনোদলালের মনে পড়ল, এবং সে হতাশ হল—নিমন্ত্রণ পত্রটা সে বাড়িতে রেখে এসেছে। কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে সে, তার উদ্দেশ্য ছিল চিঠিটা পড়ে বাড়ির লোকরা তাঁর গতিবিধি আন্দাজ করতে পারবে। পুলিশের সঙ্গে নিরর্থক তর্ক না করে সে ভিড়ের মধ্যে পিছিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এ জায়গা থেকে বেদী অনেক দূরে। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারলে হত।

উঁচু জায়গার খোঁজ করতে গিয়ে বিনোদলাল একটা ক্রেন দেখতে পেল। ক্রেনের মঞ্চের উপরে অনেক লোক উঠেছে। এই বয়সে সে কি ওখানে উঠতে পারবে? কিন্তু একজন এক অহেতুক সমবেদনায় হাত বাড়িয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল।

মঞ্চের সম্মুখভাগে তিন-চারখানা চেয়ার খালি আছে—সেগুলি পূর্ণ হলেই সভার কাজ আরম্ভ হবে। বিনোদ এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখল। ক্রেনটার গায়ে ইংরেজিতে লেখা আছে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান। আরওকি লেখা আছে যা পড়া গেল না, দর্শকরা ঢেকে দাঁড়িয়েছে। মাথার উপরে মোটা লোহার শিকলে প্রকাণ্ড কপিকল। যদি হঠাৎ ওটা নেমে আসে? কল দিয়ে

আটকানো আছে, কিন্তু তা বিকল হতে কতক্ষণ। তা ছাড়া যারা উপরে উঠছে তারা খুটখাট করে যন্ত্রপাতির গায়ে হাতও দিচ্ছে।

জনতা হঠাৎ 'ঝায়' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'এসে গেছে', বলে হুল্লোড় তুলল কয়েকজন।

'কে, মশায়, কে?'

'হবে কেউ মন্ত্রি-ফন্ত্রি।'

ব্যাণ্ডে বিলেতি কায়দায় জাতীয় সংগীত বাজছে। মঞ্চে মাত্র একখানা চেয়ার খালি আছে যেন কোনো নিমন্ত্রিত যে মঞ্চে যেতে পারেনি তার অপেক্ষায়। ব্যাণ্ড থামলে একজন বক্তা উঠে দাঁড়াল। সেকালের বিপ্লবীদের কর্মপন্থাকে অবৈপ্লবিক বলে এ কালের কার্যক্রমকে একমাত্র বিপ্লব বলে শুরু করে বেয়াল্লিশের অহিংস নাশকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, অবশেষে সে একটা বোতাম টিপল। শহিদমূর্তির তেরপলের ঢাকনা রঙিন দড়ির টানে-টানে গুটিয়ে যেতে লাগল। বিনোদলালের যেন দম বন্ধ হয়ে এল। কি দেখব—কি দেখব?

পলকে অনেক চিন্তা করল সে। শচীন সাণ্ডেল বলেছে—সুধীর মৃত্যুকে ভয় পেত। রাইফেলের গুলিতে হাড় ভেঙে গেলে বোধশক্তি নাকি থাকে না। ফুটবল খেলার মাঠে চোট লাগলে কেমন লাগে? বিনোদলালের কোনো ধারণা নেই। সে এত শান্ত এবং ভালো ছাত্র ছিল যে খেলার মাঠে যেত না। বি-এ পাশ করে সে এম-এ পড়ল না কারণ তাহলে ছোট ভাইয়ের পড়া হত না। সদর আদালতে পেশকার-নাজিরের চাকরি সে নেয়নি, কারণ সেসব চাকরির সঙ্গে অসাধুতার গল্প জড়ানো থাকে। ভাইদের চোখের সম্মুখে সাধুতা এবং বিদ্যার গৌরবের আদর্শ রাখবার জন্যে সে স্কুলমাস্টার হয়ে রইল।

ভাস্করের কলাকৌশলে সেই মৃত্যুর ঘটনা নাটকীয়ভাবে পুনর্ঘটিত হয়েছে। বিনোদলাল দূরেই ছিল কিন্তু বাবার চোখ ছেলেকে চিনতে পারল। সুধীরলাল মৃত্যু-আঘাত পেয়েছে। দুসহ বেদনায় তার মুখ বিকৃত, তার অবশ হাত দুখানা অসহায়ের মতো ঝুলছে, অশক্ত হাঁটু ন্যাকড়ার মতো লুটিয়ে পড়েছে, তার এক সঙ্গী তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

বিনোদলালের দমবন্ধ মন অন্তঃস্থিত চাপে ফেটে গেল, 'সুধীর সুধীর! বাবারে আমাকে কেন নিলি না সঙ্গে। ওহোহো।'

পাশের একজন লোক ধমকে উঠল, 'কি ফ্যাক্ ফ্যাক করছেন।'

ধমকে খেয়ে বিনোদলাল থেমে গেল, দৃশ্যমান চরাচর আচ্ছন্ন করে তার চোখে জল নামল। সেই অন্ধ অবস্থায় সে শুনতে পেল মাইকের ঘোষণা; 'শহিদ সুধীরলালের পিতা বিনোদলাল কড়ুই অনিবার্য কারণে আসতে না পারায় তার খুল্লতাত গোবিন্দলাল কড়ুই শহিদতর্পণের ভাষণ দেবেন।'

বিনোদলাল চোখ তুলে তাকাল। গোবিন্দলাল? হ্যাঁ গোবিন্দলালই

তো। তারই ছোট ভাই গোবিন্দলাল বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছে। ঝকককে সেরোয়ানি-আচকানে তাকে চেনা কঠিন। তাহলেও ভাইয়ের চোখ তো বটে। ভ্রাতৃগর্বে বিনোদলালের বুক ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। হ্যাঁ, আজ সে বলতে পারে অন্তত একটিকে সে মানুষের মতো মানুষ করতে পেরেছে।

মন একটু স্থির হলে গোবিন্দলালের কথাগুলো বিনোদলাল বুঝতে পারল। গোবিন্দলাল বলছে, 'সুধীর সেই প্রকৃতির লোক ছিল যারা বেণীর সঙ্গে মাথা কেটে দিতে পারে।'

বিনোদলাল বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ কবিতাটা আমিই পড়িয়েছিলাম, গোবিন্দলালের এক পরীক্ষার আগে তাকে পাশে বসিয়ে। সুধীরলালকেও পড়িয়েছিলাম।'

সুধীর···। সেই মৃত্যু অবশ অসহায় সুধীর। সুধীর, সুধীর, ফোঁপাতে লাগল বিনোদলাল। তার একবার একটা ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে সুধীরলালকে কুড়িয়ে আনতে। আর একবার মনে হল সুধীর আমি তোমার উপযুক্ত পিতা নয়। সারা জীবন শুধু বোকা-আদর্শকে আঁকড়ে রইলাম!

ক্রেনটা যেন ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করে উঠল। বিনোদলালের মনে হল ক্রেনের আকাশছোঁয়া দাঁড়া লোহার শিকল ও কপিকল সমেত নেমে আসছে। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। পলকের মধ্যে তার মনে হল এতদিনে এবার সে একটা কিছু করতে পারবে। সকলে পালালেও যে ছেলেটি এখনও বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে গিয়ে সে নিজেই ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্রেনটার নিচে চাপা পড়ে যাবে। কেউই তাকে চিনবে না, খবরের কাগজে বেরুবে 'অজ্ঞাতনামা পুরুষের আত্মাহুতি'। তারপর গোবিন্দলাল কাগজে ছাপানো ফটো দেখে যদি এখানেই আর একটা বেদী করে দেয়! তাহলে সে মৃত্যু-অবশ সুধীরলালের চিরকালের সঙ্গী হতে পারে।

পালাক আর না-পালাক লোকগুলো সত্যি চলে যাচ্ছে, এবং ভিড় থেকে আগে বেরুনোর জন্যে ছুটোছুটিও করছে। বিনোদলাল চেয়ে দেখল সে ক্রেনের উপরে একাই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকের মঞ্চও খালি হয়ে গেছে, কারা এসে টেবিল চেয়ার সরাচ্ছে।

তখন বেলা দুটো বাজে। জনতা মানসিক উত্তেজনায় চৈত্রের রৌদ্র ভুলে ছিল, বিনোদলালও অনুভব করেনি। কিন্তু ক্রেন থেকে নেমে সে অপরিসীম ক্লান্তি ও পিপাসা বোধ করল।

পিপাসা! অমন অবস্থায় সুধীরলালের না জানি কি পিপাসাই পেয়েছিল।

সে স্থির করল কোনো দোকান থেকে একটু জল খেয়ে কিছু কেনাকাটা করে স্টেশনে যাবে। কিন্তু দোকানে ঢোকার আগে চোখমুখ মোছা দরকার।

বিনোদলালকে থামতে হল। বুকপকেটে টাকা-বাঁধা রুমালটা নেই। তাহলে সে কি (এর আগে কখনো) চোখ মুছতে রুমাল বার করেছিল? এ

পকেট, সে পকেট, কোমর সব খুঁজল সে। ক্রেনের কাছে সে ছুটে গেল। এদিক—ওদিক, উপরে—নিচে। হায়-হায়। শচীন সাণ্ডেল পকেট-মারের কথা বলেছিল। হায় হায়। শচীনই ঠাট্টা করে সরায়নি তো?

আদালত খুব দূরে নয়। বিনোদলাল আদালতে গিয়ে শচীন সাণ্ডেলের খোঁজ করল। সে তো উকিলের মুহুরি। একজন বলল, 'শচীন সাণ্ডেল, সে তো জেলাজজের নাম।' আর একজন বলল, 'এক শচীন সাণ্ডেল আছে, বাজারে মাড়োয়ারির দোকানে।' একজন দোকানদার বলল, 'শচীন সাণ্ডেল গণ্ডা পাঁচেক নেই তো কি বলেছি। আর আপনিও কেমন মশাই, এত বড় শহরে কোন পাড়ায় থাকে তা না-জেনে লোক খুঁজতে বেরিয়েছেন।'

টাকা না-পেলে এই অজানা শহরে সে কি করবে। বাড়ি ফিরবে কি করে? এখানে আসবার জন্যে সে নতুন জামা-কাপড় কিনেছিল। আর সেগুলি পরতে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল. তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল তার ছেঁড়াছেঁড়া ফ্রকপরা চোদ্দ-পনরো বছরের মেয়েটির আকৃতি। হঠাৎ পাওয়া এই টাকায় সে বাড়ির সকলের জন্যেই কিছু-কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। সকলের মুখেই একটু হাসি দেখবে সে, একটু পারস্পারিক প্রীতি অনুভব করবে—এই আশা করেছিল।

চৈত্রের খাড়া রোদে সে মাড়োয়ারি দোকানে-দোকানে শচীন সাণ্ডেলের খোঁজ করে বেড়িয়েছে। স্বভাবতই তার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়েছিল। সারা দুপুর, বিকেল পর্যন্ত। তার এক পায়ের পুরনো স্যাণ্ডেল খুলে গিয়ে পায়ের পিছনে ও আগে ঘসড়ে-ঘসড়ে চলছে। চোখ দুটি লাল। মুখের ভিতরে থুথু আঠার মতো জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে সাদা-সাদা দাগের মতো শুকনো লালা।

ইতিমধ্যে একদল ছেলেকে চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখে সে তাদের মধ্যে সুধীরকে খুঁজতে গিয়েছিল। ছেলেদের একজন সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, 'এই বুড়ো বিড়ি খাবি?'

তাদের হাত এড়ানোর জন্যে সে এগলি-ওগলি করে শহরের গলিপথে এমন করে জড়িয়ে পড়ল যে পথের কোনো ঠিকানাই তার রইল না। একবার সে ভাবল, দেখো দেখি, ওদের মধ্যে সুধীর কি করে থাকবে।

বিকেলের দিকে সে একটা গাছ তলায় বসে পড়েছিল। সে কি এখন গোবিন্দলালের বাড়িতে ফিরে যাবে? ও-হ্যাঁ গোবিন্দলাল। তার অনুভব হল সে ভাসুর হয়ে সে বাড়িতে যেতে পারে না। আ—ছি—ছি। সে বাড়িতে ভাই-বউ আছে যে।

বিনোদলাল উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে শুরু করল। দূরের স্টেশনের সিগন্যালের আলো যেমন অন্ধকারের বুকে মিট্-মিট্ করে—তেমনি তার মনে পড়ল তার চোদ্দ-পনরো বছরের মেয়েটির শাড়ি নেই। ছোট

ছেলেটির মতো এ মেয়েটিকেও এক সময়ে সে আদর করত।

গোবিন্দলাল বলেছিল—বিনোদলাল অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারেনি। তাহলে একথাটাই খবরের কাগজে ছাপা হবে। তাহলে? লোকে বলবে সরকার থেকে পাওয়া টাকাটা মারবার জন্যেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে। বিনোদলালের কপালে বিন-বিন করে ঘাম ফুটে উঠল। টাকাটা পুরোপুরি ফিরিয়ে দিতে হবে নতুবা কেউ তাকে ছাড়বে না। এ পর্যন্ত কে তাকে কবে ছেড়েছে?

ঝক্‌ঝক্‌ শব্দে, ঝক্‌ঝকে আলোয়, বারোমিশালি কোলাহলের মধ্যে দু-একটি চড়া গলায় বলা কথায় খেয়াল করে বিনোদলাল দেখলে সে স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি একটা থেমে আছে। লোকজন ওঠা-নামা করছে।

ও, বাড়িতে যেতে হবে।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে বিনোদলালের মনে হল সে টিকিট করেনি। গাড়ির হাতল ছেড়ে নেমে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে রেল কর্মচারীকে খুঁজতে লাগল।

গার্ড হুইসিল দিয়ে সবুজ আলো দেখাতে-দেখাতে এগিয়ে এল। বিনোদলাল তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিকিট'?

'বেশ তো রাত চারটের গাড়িতে এস টিকিট করে।'

বিনোদলাল প্রাণপণ বলে বলল, 'আমি শহিদ, আমি শহিদ…'

গার্ড হেসে পাশে দাঁড়ানো কনেস্টেবলের দিকে তাকাল। সে বিনোদলালকে ডেকে নিল,—'এই ইধর আরও!' গাড়ি ছেড়ে দিল।

বিনোদলালের বলার ইচ্ছা ছিল, আমি শহিদ সুধীরলালের বাবা। কিন্তু কিছুতেই কেন যেন নামটাই তার মনে পড়ল না।

তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলাল বিনা-টিকিটে রেলে চড়তে পারে না। কি করে পারে, বলুন? সে সেই অজ্ঞাত জনের অরণ্যে একটা বেঞ্চের একটি কোনায় বসে পড়ল রাত চারটের গাড়ির জন্যে। কিন্তু কোনো গাড়ির জন্যে টিকিট করার টাকা তার কাছে নেই, এটা সে মনে করতেই পারল না।

স্টেশনের নিচেই মোটর-চলার রাস্তা। সে রাস্তায় একটা বাস যাচ্ছে। ফুলেপাতায় সাজানো। মহাত্মা সীতানাথ একাডেমির ছাত্র এবং শিক্ষকরা বাসে করে সদরে এসেছিল উৎসবে যোগ দিতে। করিৎকর্মা আধুনিক হেডমাস্টারের সুযোগ্য নেতৃত্বে উৎসবের শেষে তারা সীতানাথ একাডেমি ও শহিদ সুধীরলালের জয়কারে পথ মুখরিত করে ফিরে যাচ্ছে।

এ খবর অবশ্য বিনোদলাল জানে না।

পারদ

আমাকে একদা এক পাগলের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়েছিল, একঘরে, এক বিছানায়, এক মশারি অবলম্বন করে। সেই গল্পটা বলি।

সদ্য ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছি কলেজ থেকে। বাড়ি থেকে দূরে এক শহরে প্র্যাক্‌টিশের অর্থমূল্য যাচাই করতে গিয়েছিলাম। আলাপী লোক পেলে সুবিধা হবে কাজের এজন্য বাবা কয়েকজনের নামে পত্রাদি দিয়েছিলেন। একদিন সকালে তাঁদেরই একজনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

শহরের একান্তে দোতলা বাড়ি, একটু পুরনো কিন্তু মধ্যবিত্তদের থাকার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়।

খুব সহজেই চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভালো খাওয়া থাকার চিহ্ন শরীরে, একটু ভুঁড়ি, মাথার উপরে একটা ছোট টাক। নাক মুখ ইত্যাদিতে বৈশিষ্ট্য, চোখে গম্ভীর রঙের চশমা। মার্জিত সৌজন্য ও বিনয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন। কয়েকজন লোক ছিল, তারা চলে গেলে পরিচয় দিলাম।

চন্দ্রবাবু উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন, 'আরে, বলো কী! তাই কিনা পরের মতো দূরে-দূরে বসে আছি। তোমার বাবা আমার চাইতে বড় ছিলেন বয়েসে। কিন্তু শোয়া-বসা খেলা-ধুলা সেই নেংটা বয়স থেকে এক সঙ্গেই হয়েছে। কবে এসেছ? বিছানাপত্তর কোথায়? কোথায় উঠলে তবে?'

সংক্ষেপে আমার এ শহরে আসার কারণাদি বললাম।

'এটা তুমি অন্যায়ই করেছ বীরেন। ছি-ছি। আর দাদার কী উচিত ছিল না আমাকে প্রথমেই জানানো।'

চা ইত্যাদির পর আর একটু গল্পগুজব করে বেলার দিকে ইঙ্গিত করে উঠবার অনুমতি চাইলাম। চন্দ্রবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। এসেছ যখন একটা দিনও না থেকে যাবে। আমি ভেতরে খবর দিয়েছি। পদ্মা বোধহয়, এখনও লাইব্রেরী থেকে নামেনি, নতুবা লুফে নিয়ে যেত এতক্ষণ। আমি বরং কাজটা সেরে আসি চট্‌ করে। চলে যেয়ো না যেন।'

চন্দ্রবাবুর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তারপরে আলাপ হল। চন্দ্রবাবুর চেহারায় খানিকটা অভিজাত-ব্যবধানের ছাপ আছে, সূর্যবাবুর তাও নেই। মন ও দেহ সমান সাদাসিদে, সরলতা দিয়ে তৈরি। গায়ের ফতুয়াটা আধ-ময়লা, পরনের

কাপড়ও তাই। অন্য কেউ হলে বসবার ঘরে এ পোশাকে আসতে সংকুচিত হত।

এটায়-ওটায় আলাপের জড়তা ভাঙলে সাহিত্যের কথা উঠল। এক সময়ে সূর্যবাবু বললেন, সাহিত্য তাহলে তোমার ভালোই লাগে।

'ও ছাড়া বাঙালীর আর কিই বা আছে।'

'তোমার ভালো লাগার যুক্তিও আছে। আজকাল সাহিত্যটা ডাক্তারদের হাতেই গেছে। এই তো সেদিন রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার হলেন, পদ্মা বলে শরৎবাবু না কে একজন ডাক্তার আছেন।'

রহস্যটা একটু স্থূল। সেকালের লোকেরা অবশ্য স্থূল রসিকতাই করে থাকেন। আমিও বললাম, 'বনফুল ডাক্তারও ভালোই লিখছেন আজকাল।'

'তাই নাকি!' সূর্যবাবু হাসলেন। 'সকলেরই দেখছি ডাক্তার হওয়া উচিত।'

আমাদের আলাপের মাঝখানে সদু নামে একটি মেয়ে এসে ডাকল আমাকে। সূর্যবাবু বললেন, 'যাও ভেতরে, লজ্জা কী। বাড়িরই ছেলে তুমি। পদ্মার সঙ্গে আলাপ করগে। খুব ভালো মেয়ে। খুব ভালো লাগবে তোমার।'

দোতালার একটা ঘরে পেঁছে চেয়ার টেনে দিয়ে সদু বলল, 'বসুন, আমি পদ্মাকে খবর দি।' এদের সঙ্গে যখন সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে বারবার একজনের মুখে অপরের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে সদুকে ধরে বরং জেনে শুনে নেয়া ভালো। বললাম, 'তুমি বস, আসবে'খন পদ্মা। ততক্ষণ তোমার সঙ্গে আলাপ করে নিই।'

সদুর বয়স হয়েছে, সদ্য ষোলো পার হওয়াদের মতো লজ্জিত মুখে সে বলল, 'আমি কি আলাপ করব আপনার সঙ্গে, একদম লেখাপড়া জানি না।'

'আমি বুঝি তোমার মাস্টার মশাই, আলাপ মানে বুঝি পড়ার কথা? আচ্ছা বলো দেখি তুমি ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আর কে কে আছে?'

প্রশ্নটায় বোধহয় সদুকে খুব ছেলেমানুষ কল্পনা করা হয়েছিল, সে হাসতে হাসতে বলল, 'জেঠামশাই আছেন, বাবা আছেন, জেঠিমা, জগা, টুবলু।'

'চন্দ্রবাবু তোমার জেঠামশাই? তাহলে সূর্যবাবু? তোমার বাবা, ঠিকই ধরেছিলাম। বলো দেখি এবার লক্ষ্মী মেয়ে জগা আর টুবলু কে?'

'জেঠামশাইয়ের ছেলে।'

'ঠিকই ধরেছিলাম। একজনের নাম বলেছ, পরিচয় দাওনি এখনও। পদ্মা বুঝি তোমাদের ছোট্ট বোন, খুব ছোট, আর খুব মিষ্টি একজন, না? তোমরা সবাই খুব ভালোবাসো যাকে?'

'না পদ্মা আমাদের পিসিমা। আমার চাইতে অনেক বড়, জেঠিমাদের মতো।'

'তবে পদ্মা বলছ কেন?'

'তাই শিখিয়েছে বলতে।'

সদুর জড়তা কাটলে দেখা গেল বেশ আলাপী মেয়ে। গড় গড় করে অনেক কথা বলতে পারে না, যেমনটা হলে শিষ্ট বলা যায় তেমনি।

কিছুক্ষণ পরে সদু বললে, 'আপনি বসুন, পদ্মাকে ডেকে আনি আমি।'

পদ্মাবতী যাকে এরা সংক্ষেপে পদ্মা ও পদ্ম বলে তার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না আমার, তবু বলা যায় সে আমার কল্পনার সঙ্গে মিলল না। প্রথম দৃষ্টিতে ঝলমল করে ওঠার মতো সৌন্দর্য। পদ্মাবতী ঘরে এসে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'অনেকক্ষণ একা বসে আছেন তো?'

'না সদু ছিল।'

'দাদার ঐ স্বভাব। আত্মীয়জনকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দেন, তখন হয়তো আমরা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকি, কষ্ট হয় তাদের। আপনারও হয়েছে।'

'না, না।'

আর দু-একটা কথার পর পদ্মাবতী বলল, 'দাদার বোধহয় একটু দেরি হবে আসতে, তার চাইতে চলুন লাইব্রেরীতে গিয়ে বসি। যাবেন?'

এদের বাড়ির লাইব্রেরী ঘরটা খুব বড় নয়, তাহলেও সাধারণত লাইব্রেরী বলতে মধ্যবিত্তদের বাড়িতে যে রকমটা হিজিবিজি বইয়ের আলমারি আর বসবার চেয়ার ছড়ানো ঘর একটা কল্পনা করা যায় তার চাইতে ভালো। ঘরের একদিকের দেয়ালে কয়েকখানি তেলরঙের প্রতিকৃতি। আর একদিকের দেয়ালের গায়ে খাড়া করা একটা অর্ধ প্রাত্নতাত্ত্বিক দেবীমূর্তি।

'আজকের কাগজ পড়েছেন?'

'কেন বলুন তো? খবর আছে?'

'না, যদি পড়তে ইচ্ছা হয়ে থাকে। এনে দেব?' পদ্মাবতী উঠে দাঁড়াল।

সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, 'আপনারা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যেন। আসলে কিন্তু আমি ততটা উঁচুদরের কিছু নয়।'

'নিকটজন! এর চাইতে উঁচু আর কি হতে পারে।' পদ্মাবতী হাসল মিষ্টি করে।

'খুব নিকটজন! এতদিন তো কোনো খোঁজই নিইনি আপনাদের, কাউকেই চিনতাম না।'

'না চেনাকে দোষ দেয়া যায় না। দাদার যা মনে আছে, আমার ততটুকু মনে পড়ে না। অথচ সম্বন্ধটা এতটুকু দূরের নয়। বুড়োরা গেলে বোধহয় ভাইও ভাইকে চিনবে না।'

'আজকাল সে রকমটাই হয়েছে, আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থায় সব ছড়িয়ে পড়েছে।'

সদু যা বলেছিল পদ্মাবতীর বয়স সম্বন্ধে সেটা ঠিক নয়; তার বয়স

পঁচিশ-ছাবিবশ পার হয়েছে তা বোঝা যায় রূপের স্থৈর্য দেখে, কিন্তু পার হয়ে কতদূর গেছে ধরা যায় না। দরকার মাত্র সে ঝকঝকে হাসি হাসতে পারে কিন্তু চঞ্চল-রঙের শাড়িটিকে সম্বৃত করে বসবার ভঙ্গিতে সবটাই গাম্ভীর্য।

বললাম, 'লাইব্রেরীটা ভালো।'

খিলখিল করে হেসে পদ্মাবতী বলল, 'না দেখেই বলছেন।'

'দু-একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকার দেখছি।' আঙুল দিয়ে বইগুলি দেখিয়ে দিলাম।

'ওগুলি পাওয়া একটু কষ্টকর বটে।'

'আপনি বোধহয় খুব পড়াশোনা করেছেন, সূর্যবাবু বলছিলেন।'

'ছোড়দার ঐ রকম। কি যে মনে করে আমাকে ঠিক নেই।'

'আমারও খুব সাধ ছিল পড়ার, হল না।'

'কম হল কি? শুনলাম ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছেন এবার।'

'সে রকম নয়।'

'ও, বুঝেছি। কিন্তু সেটা কি বেটাছেলের জীবনে হয়, অত অবসর কোথায়? এমন ফাঁকা দিন রাত তারা কোথায় পাবে!'

এ সব ব্যাপার চট করে ঠাহর হয় না আমার, এতক্ষণে দেখলাম পদ্মার কপালে, মাথার কোথাও সিঁদুর নেই। হয়তো ভুল, তবু ধারণা হল অবসর যাদের একান্ত ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে তাদের মতো খিন্নতার সুর ছিল পদ্মাবতীর এই মাত্র বলা কথাগুলিতে। অথচ খুবই সুখী হবার উপাদান ছিল তার গঠনে। কিন্তু পদ্মা বলল, 'অবশ্য শুধু অবকাশ মানেই লাইব্রেরী নয়, ওটা আমার একটা রোগ। ভালো লাগার ব্যাপার বোধ হয়।'

এমন সময়ে দরজার পাশে কার পায়ের শব্দ হল। পদ্মাবতী মুখ তুলে বলল, 'ছোড়দা নাকি, কাকে খুঁজছ?'

পদ্মার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, দরজার কাজে সূর্যবাবু দাঁড়িয়ে।

সূর্যবাবু বললেন, 'বীরেন কি চলে গেছে?'

'না, এইতো আছি এখানে।'

'আচ্ছা, বোস, বোস।'

'আসুন না।'

'না, থাক এখন, পরে হবে 'খন।' সূর্যবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন।

পদ্মাবতী বলল, 'আলাপ হয়েছে ছোড়দার সঙ্গে? কি রকম লাগল আপনার?'

'ভালো লেগেছে।'

'আমাদের ভাইবোন তিনজনের মধ্যে—ওই সব চাইতে ভালো লোক। সাতে পাঁচে নেই. একটেরে পড়ে থাকা মানুষ। আমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু বলতেন, যমজ সন্তানের মধ্যে একটি সবল হলে অপরটির যা হয় তাই হয়েছে

ছোড়দার। দাদা যেন নিজের জায়গা করে নিতে গিয়ে ওকে চেপে ছোট করে দিয়েছেন।'

দ্বিপ্রহরের আহারটি গুরুতর হয়েছিল। লাইব্রেরীর খোলা জানালার পাশে বই হাতে আরাম-কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙবার পরও অলস-ভাবে শুয়েছিলাম। বোধহয় পদ্মার কথা ভাবছিলাম। মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিল। নিঃসঙ্কোচ আলাপ করার শক্তিটি মেয়েদের মধ্যে এখনো দুষ্প্রাপ্য, নেহাত যদি চোখে পড়ে তবে সে আলাপ, দেখেছি, হয় প্রগলভতা কিংবা অতিরিক্ত বাকচাতুর্যে সহজভাবটা হারিয়ে আড়ষ্টতার বিকৃতরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্মা এদিক দিয়ে খুঁজে পাওয়ার মতো অনন্যা।

কিন্তু এই ভালো লাগার বোধটার মূলে শুধু সেই নয়। এদের আর সকলেরই হৃদ্যতাও ছিল। এদের এ ব্যাপারটা এমন নিখাদ যে চিনে নিতে দেরি হয় না। নিখাদ বস্তুমাত্রই সহজ হয়, অনাড়ম্বর হয়।

চোখ মেলে দেখলাম বেলা পড়ে এসেছে। লজ্জিত হয়ে উঠলাম, এতক্ষণ যাবার প্রস্তাব তোলা উচিত ছিল। হৃদ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ নেয়া একই ব্যাপার।

ঘর থেকে বেরিয়ে দু-পা নামতে দেখা হল বাড়ির চাকরের সঙ্গে; দেখি, আমার জুতাজোড়া খুব মন দিয়ে পরিষ্কার করছে। বললাম, 'আর করতে হবে না, হয়েছে দাও। তোমাদের বড়বাবু কোথায়?'

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হল বৈঠকখানায়। একরাশ কাগজপত্তরে ডুবে ছিলেন। আমি যেতে মুখ তুলে চাইলেন, 'এস, ঘুমিয়ে পড়েছিলে শুনে ডাকিনি।'

কয়েকটা কাগজে সই করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'গরমে কষ্ট হয়নি তো? একদিকে আবার ইলেকট্রিকের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

'না কষ্ট আর কি? আমি তবু তো ঘুমোচ্ছিলাম, আপনি তো তার মধ্যেই কাজ করছেন।'

চন্দ্রবাবু হাসলেন, 'কাজ না করলে খেতে দেবে কে, বাবা? একটু অন্যমনস্ক হয়ে বিশ্রাম করতে গেলে কি আর কিছু থাকে। বাপ-মা-মরা ছোট ভাইবোন দুটিকে নিয়ে সেই যে সাগরে ভেসেছিলাম এখনও কূল পেলাম না।' চন্দ্রবাবু আর কতগুলি কাগজে ঘস-ঘস করে এক-আধ লাইন লিখে-লিখে কখনো বা সই করে সরিয়ে রাখলেন। 'এ ক'খানা হলেই হয়, কথা বলি তোমার সঙ্গে।'

এত কাছে বসে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে কাউকে কোনোদিন দেখিনি। আমাদের দেখার পেছনে প্রায়ই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে। দৃষ্ট ব্যক্তিটির স্বরূপ সব সময়ে বুঝতে পারি না সে জন্য চন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার কিন্তু মনে হল লোকটির আপাতদৃশ্য সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গিতে কি একটা

সংকুচিত হচ্ছে। ক্লান্তি? অসম্ভব নয়। একটু আগেই উনি সংসারের কুল না পাওয়ার কথা বলছিলেন। হয়তো তাই। অল্প বয়সে সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে কাঁধে ভার তুলে নিয়ে নিজের দিকে তাকাননি। নিজের মনকে অনুভবকে গোপন করে চলতে হয়েছে, হাসিমুখে চলছেন এখনও, তবু এমনি অসতর্ক সময়ে হয়তো গোপন করে রাখা ক্লান্তিটা প্রকাশ পায়।

কিন্তু এসব ভাবলে তো চলবে না। সঙ্কোচ কাটিয়ে বললাম, 'এখন আমি যাব ভাবছি। রোদ পড়ে গেছে, যেতে কোনো কষ্ট হবে না।'

কথা শুনে চন্দ্রবাবু সকাল বেলার মতোই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। পরে বললেন, 'বলো কী, আমি তো ভেবেছি দু-একদিন অন্তত তুমি থেকে যাবে। কাজের ক্ষতি হবে কিছু, থাকলে?'

মিছে কথাটা চট করে মুখে এল না।

চন্দ্রবাবু চোখ থেকে চশমা সরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসুবিধা হচ্ছে কি কিছু?' তাঁর কুন্ঠিতস্বরে বিড়ম্বিত বোধ করলাম। এরপরে আর কিই বা বলা যায়। একটা চব্বিশ ঘন্টার দিন এদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলে যদি এত আনন্দ হয় এদের আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি থেকে গেলে চন্দ্রবাবু আনন্দিত হবেন। মানুষের কাছে তার বাল্যের স্মৃতির চাইতে মধুর কি আছে, আমি তাঁর বাল্যের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত: ঠিক আমি না হলেও আমাদের পরিবার বটে।

চন্দ্রবাবু চেয়ারটাকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছি, বীরেন, তুমি আসবার পর থেকে। আমাদের দুটো পুরনো পরিবারের বাঁধনটা যেন একটু ঢিলে হয়ে গেছে, একটু নতুন করে বাঁধলে হয় না। তোমার মেজদা শুনেছি মুন্সেফ হয়েছে এদিকে কোথায়।'

'এতো খুব ভলো কথা, বাবাকে বলব।'

চন্দ্রবাবু হাসলেন, 'ভালো পাত্রী খুঁজে পাই তবে তো, দেখি তোমার কাকীমার সঙ্গে শলা করে।'

চন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে কাগজ টেনে নিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

বৈকালটা কাটল নিছক আনন্দে। সদু খোঁজ নিতে এসে বলল, 'বিকেলে স্নানের অভ্যাস আছে?'

'অভ্যাস নেই, ইচ্ছা আছে।'

'বিকেলের চায়ের আগে, না সন্ধ্যায়? ঘরে না পুকুরে?'

'তুমি যা ভালো বলো, যদি বিকেলের চা-টা শুধু সন্ধ্যায় নিয়ে যেতে।'

সদু হাসল, 'তাহলে পুকুরে করুন।'

টুবলু এসে নিয়ে গিয়েছিল। দিনটায় গুমোট ছিল, পুকুরের জলও ভালো। টুবলুরা ভালো সাঁতার দেয়। দলে মিশে হৈ-হৈ করা গেল জলে।

জল ছেড়ে উঠতে পদ্মার সঙ্গে দেখা। সে কখন জলে নেমেছিল টের পাইনি। পদ্মার আর একটা পরিচয় পেলাম। তার মুখ তবু বয়সের শাসন মেনেছে, দেহ নয়। তাতে লাবণ্য আছে, বন্যা আছে। সিক্ত বাসের কুহক নয় মাত্র। অবশ্য আর একটুক্ষণ জলে গা ডুবিয়ে থাকলে আমি একথার উল্লেখ করতে পারতাম না।

বাগানে চা দেয়া হয়েছিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটা শিশুবটের তলায় কয়েকটি বেতের চেয়ার দুখানা বেতের টেবিল ঘিরে। বাড়ির সবাই নয়, চন্দ্র, সূর্য, পদ্মা আর আমি। প্রথম টেবিলে আমি আর চন্দ্রবাবু, পদ্মার টেবিলে সে আর সূর্য। এটা-ওটা চলছিল। কথাটা বলছিলাম আমরাই বেশি, সূর্য ও পদ্মা শুনছিল।

একসময়ে সূর্যবাবু বললেন, বোধহয় আমার উপস্থিতি মনে ছিল না, বললেন, 'আমার সে কাজটা কিন্তু হল না।'

'কোনটে, সেই গ্রীন হাউস তৈরির? সে কি আর এ ভাঙা বাড়ির পাশে মানায়?'

'তা নয়,' একটু ইতস্তত করে সূর্যবাবু বললেন, 'সেই যন্ত্রটা দেখে এসেছিলাম।'

'টাইপরাইটার?'

'হ্যাঁ, বলো কবে দেবে?'

'ভেবে দেখি।'

সূর্য যে কোনো একটি শিশুর মতোই বললেন, 'অনেকদিন থেকেই ভাবছ।'

চন্দ্রবাবু সস্নেহ হাসির অভিনয় করে বললেন, 'ভাবতে সময় লাগছে।'

দুজনের কথাই তাঁদের বয়সের সঙ্গে মানায় না। দুভাইয়ে এরকম আলাপ হওয়া অসম্ভব নয় তবে সেটা লাটিম-প্রিয়তার বয়সে হতে পারে।

সূর্যবাবু খুবই উদ্বিগ্ন বিষয়টিতে, মনে হল। পদ্মার টেবিল থেকে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চন্দ্রকে স্পর্শ করে বললেন, 'অনেক ভেবেছ, এবার আর শুনছি না।'

'আঃ, থাম, সূর্য।'

সূর্যবাবু এবার থামলেন। চন্দ্রবাবুর স্বরে প্রভুত্ব ছিল। কথাটা বলে কিন্তু চন্দ্রবাবু লজ্জিত হলেন।

কুণ্ঠিত আমিও কম হইনি। একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অপরের কাছে ছেলেমানুষি করার জন্য কড়া কথা শুনতে হলে আসর ফেঁসে যায়।

আলাপকে অন্য খাতে নেবার জন্য আমি বললাম, 'সূর্যকাকা আমাকে কি বলবেন বলেছিলেন।'

সূর্যবাবু মুখ নিচু করে চা খাচ্ছিলেন, কথাটা কানে যেতে মুখ তুললেন, হাসি হাসি মুখে বললেন, 'তোমার মনে আছে? বলব বৈকি।'

এ যেন অন্য মানুষ। আমার প্রচেষ্টা সূর্যবাবুর উপরে অপ্রত্যাশিত কাজ করলেও, আসরটা আড়ষ্ট হয়েই রইল। চন্দ্রবাবু অবশ্য হাতের সিগারেটটা শেষ করেই উঠলেন, তবু মনে হল যেন এ বিশ্রী ব্যাপারটার জন্যই তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল।

আমি আবার বললাম, 'বলুন না, এখন তো আমাদের কোনো কাজ নেই।'

সূর্যবাবু চন্দ্রবাবুর অপসূয়মান চেহারাটা দেখছিলেন, একটা যেন উদ্যত নিশ্বাস চাপলেন, তারপরে বললেন, 'কি বলছিলে? সেই কথা, নয়? আর একটু সন্ধ্যা হক, বলব।'

অতঃপর সূর্যবাবুও চলে গেলেন, বাগানে রইলাম আমি ও পদ্মা। সকাল থেকে যে সহজ আনন্দের সাবলীলতায় আমাদের আলাপ চলছিল তার মধ্যে সূর্যবাবুদের এই ব্যাপারটা কাদার মতো এসে পড়েছে। এ বুঝতে পদ্মার বাকি ছিল না, বলল সে, 'খারাপই হয়েছে ব্যাপারটা, বীরেনবাবু, আমি ওদের হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।'

আমি প্রতিবাদসূচক কিছু বলার আগে সে আবার বলল, 'ভেবেছিলাম এটা প্রকাশ পাবে না, কিন্তু বলতে হল। ছোড়দা একটু বাতিকগ্রস্ত। অবশ্য দাদার ওটা উচিত হত না, যদি না প্রয়োজনের হত। দাদা ও রকম সুরে কথা না বললে, ব্যাপারটা আরও গড়াত।'

সংবাদটা সহজে আদান-প্রদান করার মতো নয়। পদ্মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, 'ওতে আর বিমর্ষ হবার কি আছে, অমন বাতিক কতজনের কত থাকে।'

পদ্মা যাকে মার্জিত ভাষায় বলেছিল বাতিক, আসলে সেটা পাগলামি। পদ্মার অতটা কুণ্ঠিত হবার কারণও তাই। সেটা বুঝলাম সন্ধ্যার পরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলে সূর্যবাবু প্রায় ধরে নিয়ে যাবার মতো করে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বাড়ির অন্য সব ঘরের মতোই একখানা ঘর। ঝাঁটপাট হয় না, ধূলিমলিন, মালিন্যগন্ধি। শোনা গেছে সহসা প্রকাশিত অসামঞ্জস্য হাস্যরসের মূলে আছে। এবং হাস্যরসটা মানুষের এত প্রিয় যে সংবেদনশীলতাকে সে নিমজ্জিত করে দেয়। সূর্যবাবুর ব্যাপারে দুঃখ হত যদি আমার, হয়তো নিজেকে সংবেদনশীল বলে প্রশংসা করতে পারতাম, কিন্তু প্রশংসার লোভেও হাসি সম্বরণ করতে পারিনি।

আমাকে ঘরে বসিয়ে সূর্যবাবু একটার পর একটা মোটা খাতা খুলে কবিতা শোনাতে লাগলেন। খাতার শেষ নেই, কাজেই খাতার পাতা ও কবিতার সংখ্যা অসীম বললেও চলে। শুধু কবিতা পড়া নয় মাঝে-মাঝে স্বকীয় মতামতও জানাচ্ছিলেন তিনি। সূর্যবাবুর ধারণা ঐ কবিতাগুলিই প্রমাণ করছে তিনি বড় কবি। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, সে তো দেশের গৌরবের ব্যাপারই কিন্তু একবার গৌরব লাভই কি একটি দেশের পক্ষে

যথেষ্ট। আবার কি চেষ্টা করা উচিত নয়। আমি বললাম, 'ওতো আর চেষ্টার ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের সব কটি কবি একত্র বসে একটা কবিতা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ হয় না।'

সূর্যবাবু হাসলেন। দুষ্টুমিতে চোখ পিট-পিট করে উঠল, বললেন, 'তা নয়, বীরেন, তা নয়। আমার কবিতাগুলি শুধু ছাপিয়ে দাও। তোমরা তো ডাক্তার, তোমাদের সাহিত্যবোধ আছে।'

পাগলামি দেখে হাসা আর পাগলামির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলা এক নয়। আমি খুঁজছিলাম কোন কথায় সূর্যবাবুকে নিরস্ত করে ছুটি নেয়া যায়। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার এই, যে কোনো কথা থেকেই সূর্যবাবু নিজের কথায় ফিরে যেতে পারেন দেখা গেল। আমার বক্তব্যের সঙ্গে সেটার আদৌ সম্পর্ক আছে কিনা সেটা যেন বিবেচনার বিষয়ই নয়।

আমি যদি বলি, 'পদ্মাকে অনেকক্ষণ দেখছি না-- -'

সূর্যবাবু বলেন, 'তাকে দিয়ে আর কি হবে বলো। সে তো অনুবাদ করে দিতে পারবে না, আর অনুবাদেই বা কি হবে? দরকার নেই।'

আমি বললাম, 'মিছে নয় কথাটা। কবিতা লিখবার জন্য কবিতা লেখা মানের জন্য নয়। দেশের লোকরা না চিনলেই বা ক্ষতি কি?'

সূর্যবাবু বলেন, 'অনুবাদে কি আর রস থাকে? আমি তো অন্য এক কায়দা করব ভেবেছি। ইংরেজি অক্ষরে বাংলা কবিতা ছাপব।'

'সেটা ইংরেজদের কাছে আরও কঠিন হবে উঠবে না? ওদের কষ্ট হবে। টি, ও, এম, এ, আর, "তোমার" কথাটা ডিক্‌শেনারিতে খুঁজে না পেলে চটেও যেতে পারে। ইংরেজদের চটানো ভালো নয়।'

সূর্যবাবু একটু ভেবে বললেলেন, 'না, না, তা কেন হবে। তার পরের লাইনে এ, এম্‌, এ, আর, থাকলেই কানে মিষ্টি লেগে যাবে।'

'তা যায় বটে। ওরা আবার মিষ্টিটা পছন্দ করে না কিনা তেমন।'

সূর্যবাবু ভাবলেন খানিকটা সময়। তারপরে হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে বললেন, 'ওহো, তোমাকে সে কবিতাটা শোনানো হয়নি। রসগোল্লা সম্বন্ধে আমার একটা ভালো কবিতা আছে।'

হা ভগবান্‌।

ভগবানের সাড়া পেলাম। চাকর এসে বলল, 'লাইব্রেরীতে দিদি ডাকছেন আপনাকে।' সূর্যবাবুকে বললাম, 'এখন উঠলে হয় না'?

'এখনি? দরকার আছে কিছু?'

'না, তেমন নয়, পদ্মা বোধ হয় ডাকছেন।'

'ও পদ্মা? তাহলে তো যাওয়াই উচিত। যাও।'

উঠতে পেরে বাঁচলাম। দেখলাম সূর্যবাবু খাতাগুলি ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে রাখছেন।

লাইব্রেরীতে খোলা জানালার কাছে পাশাপাশি দু-খানা আরামকেদারা।

পদ্মা হেসে বলল, 'আসুন, ছোড়দা আটকেছিল?'

পদ্মার হাসিতে ক্ষমা চাইবার কুণ্ঠাও ছিল। হ্যাঁ না করে আসন গ্রহণ করলাম।

'এখন বোধ হয় আমার, ছোড়দার মাথাটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আপনি তো ডাক্তার, কি মনে হয় আপনার, সারানো যায় না চিকিৎসা করলে?'

'ঠিক বলা যায় না, পরীক্ষা করানো দরকার।'

পদ্মা আমাকে অনুরোধ করল আত্মীয়তার সহানুভূতি নিয়ে একবার পরীক্ষা করতে। কিন্তু এ ব্যাধির কার্যকরী চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না, বললাম তাই। বললাম, 'আমরা জানি ওষুধ ব্যবস্থা আর শল্যবিদ্যা! কেন যে মনটা ঠিক আগের মতো কাজ করে না, এটা মৃতদেহ দ্বিখণ্ডিত করেও বোঝা যায় না, কাজেই এর চিকিৎসা আমাদের নাগালের বাইরে থেকে গেছে।'

দেখলাম পদ্মা তার ছোড়দার বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছে, পড়াশুনাও কম করেনি।

বললে সে, 'সেদিন একটা ইংরেজি জর্নালে পড়ছিলাম কিনা তাই মনে হল এসব কথা।'

পদ্মা সেই পরীক্ষামূলক থিয়োরিটির কথা বলছিল। প্রাচ্যদেশে কয়েকজন শরীরতত্ত্ববিদ বলছেন, মস্তিষ্ক পদার্থটির বিভিন্ন অংশ আমাদের বিভিন্ন ধী ও চিন্তার ক্ষেত্র। মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশ ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে ওরা নাকি প্রতিপন্ন করেছেন, মানুষের বিশেষ একটা বৃত্তি বা প্রবৃত্তির হানি ঘটানো যায়। এমনি করে গায়ককে অগায়ক করা যায়, বৈজ্ঞানিককে অবৈজ্ঞানিক করা যায়। তা যদি যায়, মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অংশকে সতেজ করে তুলবার কৌশলও ওরা হয়তো আবিষ্কার করেছে। যে অংশের শৈথিল্যের জন্য পদ্মার ছোড়দার এই ব্যতিকগ্রস্ততা সেটাকে সতেজ করতে পারলে হয়তো আবার সে স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষাটা এখনও গিনিপিগের স্তর পার হয়নি। মস্তিষ্কের কোন অংশের কাব্যে অধিকার, কোনটির বা গণিতে এ যদি নির্ধারিত হয়েও থাকে, সে অংশগুলি বিকৃত হলে শল্যবিদ্যায় কিছু করতে পারে এমন শোনা যায়নি। বললাম তাই।

পদ্মা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'অবশ্য ছোড়দার পাগলামি বীভৎস নয়, ক্ষতি-কারকও নয়। তা হলেও বড় কষ্টের ব্যাপার। ভাবুন ঐ মেয়েটির কথা. কি রকম লাগে ওর।'

সদুর কথা মনে হতে আমারও কষ্ট হল।

একসময়ে বললাম, 'এ রকমটা কতদিন হয়েছে?'

'ছোটবেলায় লিখতেন-টিকতেন কিন্তু নিজেকে অনন্যসাধারণ কবি ভাবা

এটা কয়েক বছর হল হয়েছে।'

'কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিল কঠিন?'

'না, কোনো কারণই পাওয়া যায় না। যদি না শোকটাকে মানে ওর স্ত্রীর শোকটাকে না বলি।'

'সদুর মায়ের মৃত্যু?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, শুধু দুবছরে মানুষ মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে।'

'একটু অসাধারণ বৈকি, কিন্তু অসম্ভব নয়।'

খানিকটা চুপ করে থেকে পদ্মা আবার বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার বিশ্বাস আছে মনোবিকলনে।'

'অবিশ্বাস করবার মতো জ্ঞান নেই, কাজেই বিশ্বাস করতেও আপত্তি নেই।'

পদ্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'হয়তো হয়। শোকের যে সূত্রটি হারিয়ে গেছে সেটার একটা প্রান্ত ওকে কেউ যদি ধরিয়ে দিতে পারে খানিকটা কেঁদে আবার ও প্রকৃতিস্থ হবে।'

এ বিষয়েই আর খানিকটা আলাপ হল পদ্মার সঙ্গে। একটা বিষয় প্রায় আশ্চর্যজনক বোধ হল। দেখলাম পদ্মা মনোবিশ্লেষণ বিষয়টিতে অনন্যসাধারণ জ্ঞান রাখে। সে জ্ঞানটা অলস মুহূর্তে অষ্ট্রিয়ান মনোবৈজ্ঞানিকের বইয়ের অনুবাদ থেকে সংগ্রহ নয়। মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা, স্নায়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান ডাক্তারীর ভালো জ্ঞানের চাইতে কম নয়। মনোবিশ্লেষণের শুধু নয় মনস্তত্ত্বের সর্বদিকে জ্ঞান তার আছে।

কিন্তু পদ্মা হাসল আবার, বলল, 'মনোবিশ্লেষণটা কিন্তু ভয়ের ব্যাপার, ভয় ঠিক নয় লজ্জার।'

'বিজ্ঞানের কাছে লজ্জা নেই, যেমন নেই উজ্জ্বল আলোয়।'

'আপনাদের অপারেশন থিয়েটারের মতো?'—পদ্মা যেন কি ভেবে শিউরে উঠল, 'কি সাংঘাতিক।'

রাত্রির আহারপর্ব সুনির্বাহ হতে চন্দ্রবাবুকে অনুসরণ করলাম। যেতে-যেতে লক্ষ্য করেছিলাম সূর্যবাবুর বাঁ হাতে আমার পূর্বদৃষ্ট খাতাগুলির একটা রয়েছে। তার দিকে চোখ পড়তে মনে হল তিনি যেন চোখ দিয়ে আমার চোখকে খাতার দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে বিষয়টি। তা ছাড়া পদ্মার সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপের পর থেকে সদুর মায়ের কথাটা খুব মনে হয়েছে, পৃথিবীতে সব চাইতে সহনীয় যা সেই প্রেমের এই বিকৃত রূপ দেখার ইচ্ছা আমার ছিল না।

চন্দ্রবাবুর শোবার ঘরে বসা গেল। শোবার ঘর সাধারণত বাড়ির অন্য ঘর গুলির চাইতে ভালো হয়, এখানাও তাই। এ ঘরখানির আর একটু লক্ষ্যণীয়

বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে এর রুচি। শোবার ঘর কখনোই শিল্পভারে আড়ষ্ট হওয়া উচিত নয়, এটিও নয় তা। বরং শিল্পকর্মের একান্ত অভাবই যেন এর বৈশিষ্ট্য। দুপাশে দুখানা খাট, মসৃণ কাঁঠালিরঙের কাঠে তৈরি, কোথাও এতটুকু রঙিন সুতো নেই। অখণ্ড যত্নার্জিত শুভ্রতা। ছবিহীন দেয়াল কল্পনা করা কঠিন, অনেকদিন পরে দেখলাম। দুমিনিট যেতেই মনে হয় রুচির পেছনে যথেষ্ট যত্ন না থাকলে এমনি একটি আশ্রয় তৈরি হয় না।

সংসারে যাদের দৌড়ঝাঁপ কম করতে হয় তাদের চালে ও কথায় একটি আয়েসি ভাব থাকে। সেটা ছিল চন্দ্রবাবুর। দিনের বেলা ততটা নজরে পড়েনি। তুলনা দিতে হলে বলা যায় গানের আগের স্বরবিস্তারের মতো যেন আয়েসের ভাবটি আনার চেষ্টায় আছেন চন্দ্রবাবু। বিছানার অফুরন্ত কোমল শুভ্রতায় ঢেলে দেবার জন্য নিজেকে ও চারপাশকে কোমল করে তুলেছেন।

সেকালের লোকদের বোধহয় গল্প বলতে শেখার একটা অলিখিত সামাজিক নির্দেশ ছিল। আমরা পড়ে ও লিখে যে অভাবটা মেটাই ওরা বোধ হয় বলে ও শুনে সেটা করত। চন্দ্রবাবু ছোটবেলার কথা বলছিলেন, কবে তাঁরা স্টীমারের গায়ে নৌকা ভিড়িয়ে উঠে স্টীমার ছেড়ে দিতে কি মুশকিলে পড়েছিলেন। কবে তাঁরা গ্রামের পাঠশালার পেছনে অন্ধকার সন্ধ্যায় কি দেখেছিলেন। নতুনও নয়, অসাধারণও নয়। মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতো করে বলেছিলেন চন্দ্রবাবু। বাল্যের স্মৃতিতে অবগাহন করার আনন্দ তাঁর স্বরে ছিল। ফিরে গিয়ে বাবাকে একবার কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কিন্তু সভা ভাঙতে হল। বড্ড মশা পড়ছিল। তা ছাড়া লক্ষ্য করলাম চন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে নিদ্রা নেমে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেয়াল ঘড়িটায় দেখলাম বারোটা বাজে। এবার শুয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এদের একজনকে আর একটু অসুবিধায় ফেলতে হবে। চন্দ্রবাবুর কাছে শুনে আসিনি আমার শোবার ব্যবস্থাটা কোথায় হয়েছে।

সিঁড়ির গোড়ায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল এরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও হাই উঠছে। ওদের ডেকে আর কি হবে, এসব ঘরেরই কোথাও একটা বিছানা করা আছে আমার জন্য। খুঁজে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে ঘরের দরজা নিশ্চয়ই বাঙালি কায়দায় আধখোলা থাকবে, এবং থাকবে একটি পরিচ্ছন্ন অতিথি-অনুরূপ বিছানা, যার মশারি ফেলা হয়নি। খুঁজে বার করার ব্যাপারটায় কৌতুকই অনুভব করলাম।

বৈঠকখানার পাশেরটিতে ঢুকলাম, দিনের বেলায় জেনেছি এটা টুবলুদের ঘর। ঘরের দুপাশে দুখানা খাট পাতা। একটিতে ময়লা বিছানা, সেটায় টুবলুর দাদা। অপরটি পরিচ্ছন্ন, মশারিও ফেলা হয়নি, কিন্তু সেটিতে টুবলু নিজে মাথাকে কেন্দ্র করে সর্বাঙ্গ দিয়ে বৃত্ত রচনা করছে ঘুমের ঘোরে।

নিচের তলায় সূর্যবাবুর ঘরখানিতে একবার উঁকি দিলেই বোঝা যাবে

শোবার ব্যবস্থা দোতালায় আছে। সূর্যবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম একটিমাত্র বিছানা সে ঘরে, এবং সেটি দখল করে সূর্যবাবু ম্লান আলোকে কি করছেন মাথা হেঁট করে। আর দাঁড়ালাম না, দোতলার সিঁড়ি ধরলাম।

কিন্তু ফিরে আসতে হল। চন্দ্রবাবুর ঘরটি নীরব নিস্তব্ধ, হাতড়ে-হাতড়ে অন্য দরজাগুলি দেখলাম, সেগুলি তালা বন্ধ। মনে হল পদ্মাকে একবার লাইব্রেরীর কথায় সে ঘরের হাওয়ার কথা বলেছিলাম। সম্ভবত সে ঘরের খোলা জানালার ধারে আমার বিছানা হয়েছে। উৎসাহ করে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম তা নয়। বাড়ির সব চাইতে বড় তালাটা ঝুলছে সে দরজায়। অন্ধকারে একা-একা হেসে ফেললাম। কায়দা করতে গিয়ে খুব বেকায়দায় পড়া গেছে। জিজ্ঞাসা করে নিলে গোল চুকে যেত।

নিচে নামতে-নামতে সূর্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নেয়ার কথাই ভাবছিলাম, ভয় ভয়ও করছিল, সারা রাত কবিতা শুনতে না হয়। কিন্তু তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম দরজা খোলা বটে, সূর্যবাবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

মানুষ এরকম সময়ে ভাবে হাসব না কাঁদব। ব্যাপারটার কারণ বোঝা কষ্ট নয়। ওরা সকলেই মনে করেছে সে ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয়ই আমাকে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেখানেই আমার এখন শাঝরাত। কিম্বা অন্য সব ব্যাপারে যেমন পদ্মার অখণ্ড প্রভুত্ব এ বাড়িতে, হয়তো এ ব্যাপারের ভারও তার পরেই ছেড়ে দিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কিন্তু এত রাত্রিতে পদ্মাকে ডেকে তোলা বাড়াবাড়ি মনে হল।

বারান্দা ঘুরে পদ্মার ঘরেব সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। ওদের দরজাও খোলা, আলো জ্বলছে। একটা বিছানায় বসে পদ্মা, পায়ের কাছে মাটিতে বসে সদু, সম্ভবত আলতা পরিয়ে দিচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে পদ্মা আমাকে দেখতে পেল।

বোকার মতো মুখ করে ওদের ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরেও দুটি বিছানা। দরজার ঠিক পাশেরটি ঝক্‌ঝক্‌ তুলতুল করছে। বিছানার উপরে বসে পড়লাম মনে হল বিছানা থেকে একটা আকর্ষণ অনেকগুলো অদৃশ্য আঙুল দিয়ে মেরুদণ্ডটাকে টানছে। বালিশে কনুইয়ের ভর দিয়ে হাসলাম কুণ্ঠায়। পদ্মা পাশে এসে বসে বলল, 'ঘুমোননি ?'

নিজের বোকামি স্বীকার করতে হল।

পদ্মা হেসে বললে, 'এখানেও শুতে পারেন।'

'কিন্তু।'

'তার চাইতে চলুন, টুবলুদের ডেকে দিয়ে আসি।' পদ্মা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চলল।

'না, না, থাক, একটা রাত বইতো নয়।' পদ্মাকে সঙ্গী করে এতরাতে

কারো দরজায় দাঁড়াতে ইচ্ছা ছিল না।

পদ্মাদের বিছানা থেকে বালিশ-জোড়া ঢাকনা সমেত তুলে নিয়ে সূর্যবাবুর ঘরে এসে ঢুকলাম। ঢাকনাটা বিছিয়ে বালিশ দুটি সাজিয়ে মেঝেতে শুয়েও পড়লাম।

কিন্তু সাপ কামড়ায়নি, কামড়েছিল মশা। সারা দেহের জ্বালা নিয়ে তখন-তখনি উঠে বসলাম। চোরের মতো সন্তর্পণে সূর্যবাবুর বিছানায় উঠে তার মশারির আশ্রয় নিতে হল।

সূর্যবাবু জেগে ছিলেন।

'কে, বীরেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঘুমোননি, আমি তো দুমিনিটেই।'

কেশে গলা সাফ করলেন সূর্যবাবু, বললেন, 'এরকম হবে, আমি জানতাম।'

'কি হবে জানতেন।'

'তুমি বোধহয় লাইব্রেরীতে শোবে ভেবেছিলে !'

'কই না তো, যে কোনো জায়গা হলেই হত।'

'কোনো জায়গাতেই হয়নি ? হবে না আমি জানতাম।'

'টুবলুদের ঘরেই নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি যেতে দেরি করেছিলাম ওরা শুয়ে পড়েছে।

সূর্যবাবু হাসলেন, 'বলেছিল তোমাকে দাদা ? বলবে না আমি জানতাম। ছোটবেলা থেকেই জানি। খাওয়া হলেই নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিত। বাড়িতে আর সকলে জায়গার অভাবে রাত জেগে বসে থাকলেও ও নিজের শোবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবে। সেই অভ্যাস থেকে গেছে।'

'তা নয়, এ সামান্য ব্যাপারগুলির জন্য বাড়ির কর্তার ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই, টুবলুদের উপরেই ভার ছিল, তারাই ভুলে গেছে।'

সূর্যবাবু হাসলেন আবার, 'কিছুমাত্র বোঝ না। আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি, না তুমি দেখছ ? পাছে নিজের ঘরে জায়গা দিতে হয় তাই শোবার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। আর এসব ব্যাপার পদ্মাও জানে।'

'আপনি ঘুমোন, অনেক রাত হল। আমিও ঘুমিয়ে পড়ব।'

এমন অবিশ্বাস্য ছেলেমানুষি স্বার্থপরতা চন্দ্রবাবুতে আরোপ করা যায় কি ? এ যেন শালগ্রামের ছিদ্র, কলির প্রবেশ পথের নিশানা।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ে মশা কামড়াচ্ছিল, সাপের স্বপ্নে ভয়ে ঘুম চটে গেল। আবেশ কেটে যাবার পরও মনে হল কে যেন সাপের বিষে মুহ্যমান হয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। আলোর ব্যবস্থা ছিল না। বিছানা থেকে সন্তর্পণে নেমে দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েও কান্নাটা শুনতে পেলাম।

দু'পা এগিয়ে মনে হল পদ্মার ঘর থেকেই আসছে কান্নাটা। দ্বিধা করেও সে দিকেই এগিয়ে গেলাম। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ম্লান আলোয় ঘরের ভেতরটা নজরে পড়ল। সদু কাঁদছে বিছানায় বসে। ক্রিশ্চানদের ক্রুশ করার কায়দায় হাতদুটি বুকের উপরে আড়াআড়ি করে রাখা। কথা বলা উচিত কিনা ভেবে উঠবার আগে বললাম, 'কি হয়েছে সদু ?'

পদ্মা দরজা খুলে দিল।

'কি হয়েছে ওর ?'

সদু সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়ল।

পদ্মা বললে, 'দেখা না কি হয়েছে, বীরেনবাবু ডাক্তার তা তো জানিস।'

পদ্মা সদুর আড়াআড়ি রাখা হাত দুটি আলগা করে দেবার চেষ্টায় টানাটানি করল। বলল, 'কি বোকা মেয়ে তুই, সদু, ডাক্তারকে আবার লজ্জা কি ?'

সদু মুখ তুলল না। ব্লাউজের বুকের কাছটা ছিঁড়ে গেলে ঢাকবার জন্য যেমন করতে পারত তেমনি করে আঙুল দিয়ে কাঁধের কাছে ব্লাউজের কাপড় কুঁচিয়ে ধরল। যেন কেউ ওর লজ্জার অবমাননা করেছে।

'তেমন কিছু নয় বোধ হয়,' বলে বেরিয়ে এলাম।

পদ্মা দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল, গলা নিচু করে কানে কানে বলার মতো বলল, 'কি লজ্জা !'

দিনের কয়েকটা ঘণ্টা হয়তো বা একটিমাত্র ; প্রাতঃরাশ নয়, প্রথম চায়ের কাপ অবধি। বিনিদ্র রাত্রির গ্লানি চোখ জুড়ে থাকলেও সূর্যবাবুর কথায় ভয় পেলাম না।

সূর্যবাবু বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না ঠিক ঠাক।'

'কোনটা ?'

'কালকের সেই কবিতাটা। সেই ইংরেজি হরফে ছাপানো, সেই এইচ্ আর টি কে এ এম, এ এল্।' কথাটার সুর যেন করুণ মনে হল।

কাল সন্ধ্যার সেই ভয়ঙ্কর কবিতাপুঞ্জের একটি ছিল হৃৎকমল বলে। যতদূর মনে পড়ে একটা সরোবরের বর্ণনা, একটা দাঁড়কাকের বর্ণনা, একটা পদ্মহীন বৃন্তের বর্ণনা, একটা সরু কাঠির সঙ্গে তার তুলনাও ছিল ; সবটাই লঘু ত্রিপদীতে। হাসি চাপা কষ্টসাধ্য হয়েছিল। এখন মনে হল ; সামান্য বস্তু হারিয়ে শিশু শোক করে, তখন কি আমরা বুঝতে পারি তার ব্যক্তিগত জগতের কতটা জুড়ে ছিল ঐ বস্তুটুকু, কত গভীর স্পর্শ দিত তার মনে, কত বিপুল অনুরণন ছিল তার ? একটা বোবা মায়ের কথাও মনে হল, সন্তান হারিয়েও সে শোক করতে পারল না বলে তার লাঞ্ছনা হয়েছিল। তার বুকের ভেতরটা কি কেউ দেখেছিল তখন ? হয়তো তাঁর শোকের অব্যক্ত শব্দে হাসিও পেয়েছিল।

কে জানে সদুর মা বৃন্তটিকে কতটুকু সার্থক করেছিল। কি বিপুল স্থান পূর্ণ করেছিল এই বোবা মস্তিষ্কের।

বসবার ঘরে চায়ের কাপ শেষ হল। চন্দ্রবাবুর স্নানাদি হয়ে গেছে। সৌম্য গাম্ভীর্যে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন, 'এখনি যাবে?'

'আমাকে আজ ফিরে যেতে হবে।'

'কিছু একটু মুখে দিয়ে যাও বরং।'

'আর একবার এসে হবে তখন।'

পদ্মা এল। ঝলমল করে উঠল ঘর।

'এখনি?'

'সকালে-সকালে বেরিয়ে পড়ি।'

পদ্মা হাসল যেমন করে পদ্মাই শুধু পারে।

চন্দ্রবাবু কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার বাবাকে আসতে বলবে। ভুলবে না?'

'হ্যাঁ বলব।'

পথের ধারে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সূর্যবাবু।

একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বীরেন, তোমার যদি এখানে আসা হত এই হসপিট্যালে—একটা টাইপরাইটার আছে ওদের, বেশ ছাপিয়ে নেয়া যেত।'

সূর্যবাবুর কাছে বিদায় নিলাম।

সদুকে দেখলাম না।

ভদ্রলোকের বাড়ি

ওরা আমাদের এক ধরনের প্রতিবেশী ছিল।

১৯৪৮-এ এসেছিলাম বলে ১৯৫০-এর আগতদের তুলনায় ভালো ছিলাম বলতে হবে। একটা ঝরঝরে বাড়ির দোতলায় একটা ফ্ল্যাট দখল করতে পেরেছিলাম আমরা। পাশের ফ্ল্যাট থেকে আমাদের অংশটা কোথাও কাঠের কোথাও বা চুন-লেপা চটের পর্দা দিয়ে পৃথক করা ছিল। এটার জন্য উপার্জনের একটা বড় অংশ ব্যয় হত, তবু একটি শোয়া-বসার ঘর এবং একটি রান্নাঘরের আভাস মাত্র নিয়ে ব্রাহ্মণী সুখে ছিলেন, কারণ ফ্ল্যাটে একটা পায়খানা এবং পায়খানার বাইরের দিকের দেয়ালে বসানো একটি স্বল্পতোয়া জলের ট্যাপও ছিল। রান্নার বেশির ভাগ ও আহারাদি শয়নকক্ষে করতে হলেও, তার দরুন সারা দিন সারা রাত শোয়ার ঘরের মেঝে পিছল হয়ে থাকলেও ব্রাহ্মণী তাঁর দেবর, স্বামী, পুত্রকন্যাদি নিয়ে সুখে ছিলেন। তাঁর ভাষায়, জলের কলে আর পায়খানার জন্য লাইন দিতে হচ্ছে না, এটাকে নিশ্চয়ই ভদ্র ফ্ল্যাটই বলব।

আমাদের রান্নাঘরের জানলা খুললেই সাত-আট হাত নিচে একটি বাসা আবরণহীন হয়ে চোখে পড়ত।

আমরা এসে দেখে দেখেছিলাম সে অংশটা আমাদের অংশের এবং ওদিকের অংশের কারো-কারো আঁস্তাকুড়। জানলা খুললেই ছাইয়ের গাদা, তার উপরে ছড়ানো জঞ্জাল, ব্যান্ডেজের কাপড়, ছেঁড়া নেকড়া, ডিমের খোলা—এক কথায় একটি আধুনিক নরক চোখে পড়ত এবং ভক করে একটা গন্ধও নাকে আসত। শোবার ঘরে খেতে বসে ব্রাহ্মণীর শত চেষ্টাতেও তা ভুলতে পারতাম না।

একদিন ব্রাহ্মণী এসে বললেন, 'চেহারা দেখে লোকটাকে যা মনে করেছিলাম, তেমন নয়। নিশ্চতই ভদ্র।'

উদিষ্ট পুরুষ আমাদের বাড়িওয়ালা। তার বাড়িতে একটা পাতিলেবুর গাছ আছে। এ সময়ে মশায় কাটা লেবুগুলো হলদে হয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। আমার ধারণা হল সেই লেবু গোটা কয়েক হয়তো পাঠিয়ে দিয়েছে। তা দিক, চার গণ্ডা পয়সা বাঁচা মন্দ কথা নয়, কিন্তু তার বিনিময়ে বেআইনি কিছু না করতে হয়, কোনো পারমিট এনে দেয়া কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।

আমার আশঙ্কার কথা ব্রাহ্মণীকে প্রকাশ করতে শুরু করেছি তখনই তিনি প্রায় আমার হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমি 'করো কি করো কি'

বলতে-বলতে জানালাটা খুলে দিলেন।

'তুমি এতো অবিশ্বাসী কেন?'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে বটে। জানালা দিয়ে দেখলাম দশ-পনরজন মুদ্দফরাস কোদাল ঝুড়ি নিয়ে ছাইগাদা পরিষ্কার করতে লেগে গেছে।

'দেখলে তো। বলেছিলাম এবার যখন ভাড়া নিতে এসেছিল।'

বিকেলে এসে দেখলাম ছাই-টাই কিছু নেই। লাল সিমেণ্টের ভাঙাচোরা চত্বর বেরিয়ে পড়েছে। একটা থামের কারুকার্য করা গোড়া। এসব দেখেই মনে হয়েছিল পুরাকালে বাড়িওয়ালার কোনো পূর্বপুরুষের নাটমন্দির ছিল হয়তো এ অংশটা।

ভালো। খুবই ভালো।

মেয়ে এসে বলল, 'ইস্কুলের সব মেয়ে হয় নীল শাড়ি কিম্বা নীল ফ্রক পরবে। একটা নীল ফ্রক কিনে দিও, বাবা। সুতোর হলেই হবে।'

'তা হবে, খুব হবে। ডাক্তারের খরচ মাসে পাঁচ-ছ'টাকা কমলো বলে মনে হচ্ছে।' ব্রাহ্মণীরও মেজাজ খুব ভালো ছিল। তিনি বললেন, 'তুমি বড্ড সিনিক হচ্ছ।'

কেউ-কেউ সিনিক নামে পরিচিত হতে বিরক্ত হন, অন্য কেউ-কেউ সিনিক না হয়েও এমন নামটা পছন্দই করেন। আমার অবশ্য এসব কিছু হল না। আমার শুধু ব্রাহ্মণীর মুখে ইংরেজি শুনে অনেকদিন পরে মনে পড়ে গেল বিয়ের সময়ে তিনি কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

আমি বললাম 'কিন্তু এ আর কতদিন! আমরা আর সব ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করতে পারি কিন্তু ছাই ফেলবার জায়গা না হলে আমাদের চলে না।'

'তুমি দেখে নিও, আমি—'

'তোমার কথা হচ্ছে না। অত ছাই তোমার একার সাধ্য কি।'

ব্রাহ্মণী আবার একদিন রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন ছাইমুক্ত চত্বরটায় একটা বাড়ি উঠছে। বাঁশ পুঁতে, বাঁশের ফ্রেমে খোলার ঘর। দেয়ালের জন্য গুড়ের টিন কাটা হচ্ছে।

'ভালো।'

'তা হলে আর আমাদের ভাবনার কিছু রইল না।'

'ভাবো যদি তা হলে অনেকই রইল। চত্বরের দিকে আমাদের এ ব্লকটার পেছন দিক। প্রত্যেক ঘর থেকে একটি করে নালী কখনো ফুটো ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া লোহার নল বেয়ে, কখনো দেয়ালের গায়ের ফাটল বেয়ে চত্বরে গিয়ে তাদের কাদা জলগুলি ঢেলে দেয় এবং এই ব্লকটার ভিতর গায়ে একটা উন্মুক্ত মাঝারি ড্রেন সেগুলোকে বহন করে নিয়ে যায় সদরের বড় ঢাকা ড্রেনটায়। এ নতুন বাড়িতে যারা আসবে তাদের টাইফয়েড এবং অন্যান্য রোগে ভুগতেই হবে।'

'তুমি সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো নও।'

'আপাতত অবশ্য দুর্ভাবনার কারণ আমার চোখে পড়ছে না, কারণ ও বাড়িতে ঢুকবার পথ খুঁজে পাবার মতো কোনো ভাড়াটের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।'

'তাও ভালো। টাইফয়েড বড় ছোঁয়াচে রোগ বাপু।' বলে ব্রাহ্মণী বিদায় নিলেন।

কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত ছিল বাড়ি যে করেছে বাড়ি ভাড়া দেয়াই তার উপজীবিকা। আপাতদৃষ্টিতে এই নতুন বাড়িটা আফগানিস্থানের মতো সদরের গলিগুলির সঙ্গে সব রকমে বিচ্ছিন্ন হলেও একটা করিডর তৈরি হল। খোলা ড্রেনটার উপর দিয়ে বাঁশের একটা ঢাক্‌না তৈরি হয়ে গেল। সেই ঢাক্‌না-দেয়া-ড্রেনই হল এই নতুন বাসায় আসবার পথ।

'এখানে কি ভাড়াটে আসবে?'

'এলেও বস্তির লোক।'

'তাহলে?'

'জানালা খোলা চলবে না। এত টাকা দিয়ে এখানে থাকবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বস্তির দৃশ্যগুলো ছেলেদের চোখে না পড়ে। মনে করো যদি ঐ উঠোনে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কেউ গান শুরু করে দেয়!'

'গান ভালো জিনিস বটে, কিন্তু—'

'সেই কথাই বলছি। সেই বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে বিশেষ রকমের গান।'

'আমাদের একই কথা। দক্ষিণের জানালা দুটো খোলা যাবে না, সে শোবার ঘরই বলো আর রান্নাঘরই বলো।'

'তা ছাড়াও আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে হবে। ওরা যাই করুক আমরা সেটা দেখছি তা দেখতে দিলে চলবে না।'

একদিন অফিস ফেরত ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরের মধ্যে অপরিচিত মেয়েছেলে।

বাড়িতে ঢুকে আমার ফ্ল্যাটটায় আসতে হলে ট্রাউজারের পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরতে হয়। এই অবস্থাতেই আসছিলাম। অপরিচিত মেয়েছেলে দেখে ট্রাউজারের ঝুল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওঁরাও আমাকে দেখেছিলেন। বৌটি আমার পাশ দিয়ে বার হয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম চালচলনটা ভালো।

'কে বলো তো?'

'কি করে বলব!'

ব্রাহ্মণী আর কিছু না বলে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি আমার

দামী খোলসটা টিনের চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় মাদুর ঢাকা তোশকে ছেলেমেয়েদের বইখাতা সরিয়ে গা ঢেলে দিলাম।

দু-পাঁচ দিন পরে ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়েটা বড় ভালো গো। একটা কথা তোমাকে বলি, ওদের এর আগে ভালো দিন ছিল।

'তা আর ছিল না?'

'ঠাট্টা করো কেন? অনেকে হয়তো মিথ্যে লাখ-দু'লাখের গল্প করে কিন্তু ব্যবহারেই বোঝা যায় সব।'

'না, লাখ-দু'লাখের গল্প এখন সহ্য হয়ে গেছে। এদেশী লোকদের মুখে অন্যের বাগানবাড়িতে ছিপে-মাছ-ধরার গল্প, বাড়িতে কি-কি রান্না হয়েছিল তার ঢেকুর সমেত বর্ণনা, আর ওদিকের লাখ-দু'লাখের বাগ-বাগিচা জমি-জিরাত এ-সব সহ্য হয়ে গেছে। বরং না শুনলে অস্বস্তি লাগে।'

'সে তুমি যাই বলো। আমি বুঝতে পেরেছি এরা ভদ্রলোক।'

'ঘুষ দিয়ে গেছে কিছু?'

'তা যদি বলো অস্বীকার করব কি করে। একটা ছোট্ট তোলা-উনুন দিয়ে গেছে মেয়েটি। এমন শক্ত আঁটসাঁট ছোট্টখাট্ট জিনিসটি যে এক্‌জিবিসনে দেয়া যায়। স্টোভ আর জ্বালতে হবে না। এখন তাতে করেই তোমার চা করে আনলাম। ভালো হয়নি চা?'

হেসে বললাম, 'তা হয়েছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি ক'রে?'

'হল, মশাই, হল।'

'তা হোক। তোমার সারা বাড়িতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখা অভ্যেস। যাওয়া-আসার পথের ধারে অন্তত দামি কিছু রেখো না যেন।'

'ছি, ছি, একটা বৌকে কি তুমি---'

দু-তিন মিনিট পরে আমাকে মত বদলাতে হল। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। তুমি তো কতই সামলাচ্ছ, এ ব্যাপারেও পারবে।'

ব্রাহ্মণী ঈষৎ নরম হলেও তখন-তখনই নিজের থেকে কথা বলার মতো সহজ হলেন না। কিন্তু গত দশ বছর এ কাজ করে এ বিষয়ে আমার দক্ষতা জন্মেছে। নিজের সাংসারিক বোকামি ও দৃষ্টিহীনতার কথা আর কিছুক্ষণ বলে যেতেই ব্রাহ্মণী পাশে এসে বসলেন এবং পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে-করতে আনুপূর্বিক সব বললেন। কি করে আলাপ হল। বৌটির ছেলেপুলে নেই। সাত-আট বছর বিয়ে হয়েছে। ও হবেও না। পেটে ব্যথা আছে। ওর স্বামী ট্রামের কন্‌ডাক্টর। এমন কি এখন তিনি জানালা খুলতে পারেন। আমি আফিসে যাওয়ার পর-পরই ওর স্বামী এসে খেয়ে যায়। তারপর থেকে বৌটি একা বাড়িতে থাকে। উঠোন ঝাঁট দেয়। বাসনপত্তর মাজে। কখনো সেলাই করে। তখন জানালা খুললে আপত্তি নেই। জানালায় দাঁড়িয়ে

গল্প করাও চলে।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। দেখলাম ছোট মেয়েটা ঘরময় কালি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমার বড় ছেলেটি বিছানার উপরে বসে কতগুলি খেলনা নিয়ে খেলা করছে। আমার ছোট মেয়েটি আমার অত্যন্ত আদরের। তার মুখে কালি দেখে আমি বললাম, 'তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই রে। ছোট বোনটা কালি মেখে বেড়াচ্ছে আর তুই ঐ আবর্জনাগুলো নিয়ে বিছানার উপরে গিয়ে বসেছিস? নাম্, হতভাগা, নাম্।'

ব্রাহ্মণী প্রবেশ করতে-করতে আবর্জনা কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন। এবং সে কথাটাই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেল।

'আবর্জনা কোথায়? ওটা তো খেলনা।'

কথাটা অত্যন্ত সাধারণ হলেও এক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্য। ব্যাপারটা খেলনাই বটে। পাতলা কাঠের টুকরো এবং পেষ্টবোর্ড দিয়ে তৈরি একটা বাংলো বাড়ি। অন্য সময়ে হলে প্রশংসাই করতাম।

কিন্তু সে সময়ে আমার রাগ কমলো না, বরং বাড়ল। 'পিণ্ডি আমার। নাহক্ কতগুলো পয়সা খুইয়েছ। এই তো তোমায় ছেলে মানুষ করার বুদ্ধি।'

ছেলের সম্মুখে অন্তত এমন একথা ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহ্য করা শক্ত। তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

'চেঁচাচ্ছ কেন?'

থামলাম। তবু বললাম, 'মেয়েটার মুখে কালি-মাখা কেন?'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'থামো। ঐ বাড়ির বৌটি তোমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল। কাজল পরিয়ে দিয়েছে। কি অন্যায় হয়েছে বলো?'

সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে মনটা একটু স্থির হল। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসে অনুভব হল ঐ বাড়ির বৌটির সন্তান নেই। কাজল যদি পরে মেয়েকে দিয়ে থাকেই তাই বলে এমন কিছু হৈচৈ করা উচিত হয়নি। লজ্জা বোধ হল। ছেলেকে বললাম, 'তোকে বুঝি খেলনা দিয়েছে?' গলাটা উঁচু করলাম। ছেলের ভীতমুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। চৌকির তলা থেকে তার খেলনার বাড়িটা বার করে আনল। তখন আমি প্রায় চীৎকার করে বললাম, 'বাহ্, ভারি সুন্দর তো। এটা একটা শিল্পীর কাজ বলতে পারা যায়।' আশা করেছিলাম আমার আফিস ফেরতা উঁচু গলা যদি কেউ শুনে থাকে তারা আমার প্রশংসাও শুনুক।

কিন্তু ব্রাহ্মণীকে রাত্রিতে বললাম, 'এত ঘনিষ্ঠ হওয়া কি ভালো? ওদের কাছ থেকে তুমি তোলা উনুন নিয়েছ নাও, কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা খেলনা নেবে কেন?'

'দোষ কি ? ওরা তো ভদ্রলোকই।'

কিন্তু এক রবিবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আমার যেন মনে হল বুলুর একটা জামা হাতে করে ব্রাহ্মণী কাকে দিয়ে এলেন। এরকম দান তিনি মাঝে-মাঝে করেন না তা নয়, কিন্তু আমাকে, অন্তত আমার তাই ধারণা, সামলাতেও হয়। কতকটা অভ্যাস-বশে বললাম, 'জামাটা কি তেমন পুরোনো হয়েছিল ?'

'পুরোনো কেন, একধোপ মাত্র পড়েছে।'

'তবে ?'

'এত কৃপণ কেন ?'

'না, তেমন আর কি। পাত্রটা উপযুক্ত হল কি না দয়ার তাই ভাবছি।'

ব্রাহ্মণীর কোনো কারণে হয়তো মনটা ভালো ছিল, তাই সোজা না বলে বাঁকা কথায় চলছিলেন : এবার সরল করে বললেন, 'ঐ বাড়ির বউটিকে দিলাম।'

'তার ছেলেমেয়ে নেই বলেছিলে।'

'চাইল।'

'চাইলেই কি দিতে হবে। ওসব লোকের নানা রকম তুকতাক আছে।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো ওসবে।'

'তা করি না। ওতে নিজের মঙ্গল হয় না, অন্যের অমঙ্গল হতে পারে।'

'দেখো, এসব মেয়েলি কথা কি তোমার মতো একজন বিদগ্ধ ভদ্রব্যক্তির বলা উচিত। অজ পাড়াগেঁয়ে কোনো ঝিয়ের কোলে মানুষ হয়েছিলে ?'

এর পরে আমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। রাগ হল। বললাম, 'তোমার আভিজাত্য বোধ থেকে তুমি বলতে পার কেন জামাটি তার দরকার হতে পারে !'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'জামাটায় ঢাকাই-কাজের নমুনা তুলে দেবে।'

'গরজটা কোন পক্ষের ?'

'ওই বলেছিল।'

'তবে ? তাহলে তুমিও বুঝতে পারছ না ?'

ব্রাহ্মণীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল, বললেন, 'কেন ভয় দেখাচ্ছ ?' তিনি ভয়ে কেঁদেও ফেললেন।

সে যাই হোক, স্থির করলাম প্রতিবেশী সম্বন্ধে কোনো কথা আমি আর বলব না। এমনকি ব্রাহ্মণী বললেও না। লক্ষ্য করতে লাগলাম ছেলেরা মাঝে মাঝে চকোলেট বিস্কুট পাচ্ছে। তবু লক্ষ্যে আনলাম না।

এক শনিবার রাত্রি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুপুর দুটোয় বাসায় ফিরে দেখলাম ছোট মেয়েটা ছাড়া বাসায় সবাই অনুপস্থিত। ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'সব গেলো কোথায় ?'

'পিসির বাড়িতে।'

কথাটা আকস্মিক। জুতো খুলতে-খুলতে ব্যঙ্গ করে বললাম, 'পিসি গাড়ি পাঠিয়েছিল ?'

'না, তাহলেও। অনেকদিন যায় না পিসির বাড়িতে।' ব্রাহ্মণী স্বাভাবিকের চাইতেও সুন্দর করে হাসলেন।

'কিন্তু পিসি যদি বসতেও না বলে ? এই আট দশ মাইল পথ বাসে ট্রামে করে তিনটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে ?'

'তারা তো ট্রামে-বাসে চলা ফেরা করেও ! খেলা-টেলা দেখতেও যায়।'

ছেলেরা বলতে আমার ষোলো-সতরো বছরের একটি ভাই আর আমার দুই ছেলে। 'তা যায়। কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে যাওয়ার কি দরকার ছিল ?'

ব্রাহ্মণীর মুখ তার অন্তরগত কোনো কথায় বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কুটো চেপে ধরার ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ তো পিসি আদর না করে, দিদি আদর না করে, ফিরে আসবে।'

আর কোনো কথা না বলেই চুপ করে রইলাম। চা এল।

চায়ের বাটি নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'নির্জন লাগছে।'

দশ-বাই-বারো হাত ঘরের ছজন বাসিন্দার মধ্যে যদি তিনজন অনুপস্থিত থাকে তবে এমন নির্জন বোধ হয়।

ব্রাহ্মণীর চোখে জল এল। তীব্র অভিমানের স্বরে তিনি বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ, আমি ইচ্ছা করে নির্জন করেছি বাসা।

'না-না। দেখো।'

ব্রাহ্মণী চলে গেলেন। সে রাত্রিতে প্রয়োজনের চাইতে জোর দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে গেলেন তিনি ইচ্ছা করে ঘর নির্জন করেননি। ঘরেই এলেন না তিনি, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুলেন।

ঘুম আসবার কথা নয়। এদিক-ওদিক করতে করতে মনে হল দক্ষিণ দিকের জানালাটা খোলা আছে। বন্ধ করতে গিয়ে একটু দাঁড়ালাম। তখনও ট্রামের কনডাক্টর বোধ করি তার ডিউটি শেষ করতে পারেনি। মনে হল বৌটি উঠোনে বসে আছে। সহসা তার দুঃখের কথা মনে হতে পারে কিন্তু ক্ষণপরেই মনে হল একটা লণ্ঠনের আলোয় বসে বালিশের ওয়াড়ে সে ফুল তুলছে, কিম্বা বুলুর সে-জামাটায় ঢাকাই কাজের নমুনা। এবং তার মুখে তখন হাসি হাসি ভাব। ফ্ল্যাটগুলির গোলমালের উপরে ফুটে ওঠা তার সেই নির্জন শান্তি অপূর্ব বোধ হল। ভদ্রতার দিক দিয়ে যা অন্যায় তেমনি করে বৌটির বসে থাকার স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গীটি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু মনকে সেটা শান্ত করল না। আমার মনের মধ্যে ছেলেদের অনুপস্থিতি কোলাহল করে বেড়াচ্ছে। মনে হল, ব্রাহ্মণী লজ্জায় ঘরে আসেননি। মনে হল, এ বৌটির নির্জন অবসর ব্রাহ্মণীকে কুদৃষ্টান্তের মতো বিচলিত করেছিল।

ওদের স্বরূপ প্রকাশ পেলো। এমনকি ব্রাহ্মণীকে বললাম। আমার

পার্থিব জ্ঞান যে তাঁর চাইতে বেশি এটা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলাম কয়েক মিনিট ধরে।

রাত তখন দশটা। চিৎকার শুনে মনে হল কেউ কাউকে মারছে। এদিকের ফ্ল্যাটগুলির সব কটি জানলা খুলে গেল। ব্রাহ্মণীকে বললাম 'সরে এসো। আজ ওদের মাইনে পাওয়ার দিন।'

জানালা বন্ধ করলেও কানে আসতে লাগল:

'কে বলেছে তোমাকে টাকা দিতে, কোন্ নবাবের ঝি তুমি? তোমাকে কি টাকা দিই যাচ্ছেতাই খরচ করার জন্যে?'

'মা বললেন, কাল একাদশী গেছে।'

'সে রাক্ষুসি না খেয়ে মরল, গোল্লায় গেল, তাতে আমার কি?'

বৌটির মা হয়তো অত্যন্ত দুর্দশায় পড়েছে। দুর্দশায় না পড়লে এমন জামাইয়ের বাড়িতে একাদশীর পরদিনও না-খেয়ে থাকলেও কেউ আসে!

লোকটির রাগ এতেও কমলো না। 'তুমি যেখানে-সেখানে টাকা জমাবে, যাকে-তাকে দেবে, তুমি ভেবেছ কি? টাকা আমার না?'

সে কি-সব বার করল। উঠোনে বসে ভাঙল। বোধ হয় পয়সা জমানোর কৌটো বা ছোট বাক্সটাক্স হবে। ভাঙাচোরার শব্দ ধুঁয়োর মতো ভেসে আসতে লাগল, 'যার তার জন্যে খরচ করবে, না?'

কয়েক দিন আগেও বৌটি লজেঞ্চুস টফি তো বটেই একটি রঙিন পুতুলও কিনে দিয়েছে আমার ছোট ছেলেকে। বৌটির লজ্জা আমারও লাগল। মনে হল ওদের দেয়া উপহারগুলো জানলা গলিয়ে লোকটির মাথায় ছুঁড়ে মারি। সে উপহার না দিলেও যে আমার ছেলেদের কোনো ক্ষতি হবার নয়, তার উপহার নেয়াটা যে আমাদের পক্ষে বদান্যতা মাত্র, এরকম কিছু একটা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা হল।

পরদিন সকালে আমার মেজ ছেলে খবর আনল। সে তার দাদাকে বলল, তাদের কাকা উঠোনে কপাল ধরে বসে আছে, বোধহয় জ্বর হয়েছে।

কথাটা কানে গেলেও তখন কিছু বললাম না কিন্তু অবসর মতো ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'এমন মাতলামো করা তো ভালো নয়, বাপু। তাছাড়া ছেলেরা যাকে তাকে কাকা বলে কেন?'

ব্রাহ্মণী একটু উদাস স্বরে বললেন, 'কি করা যাবে?'

'ছেলেপুলেদের সামলাতে হয়।'

'তা সামলাব।'

কিন্তু ব্রাহ্মণী যে তাদের সামলাতে পারছেন না তার প্রমাণ পেতে লাগলাম। ছেলেদের হাতে দু-একটা দামি খেলনাও আসতে লাগল। যেন স্ত্রীর যা-তা খরচ করবার মধ্যে আমার ছেলেদের উপহার দেয়াও ধর্তব্য নয় তারই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে লোকটি।

কিন্তু লজ্জা যেন ভেঙেছে। শুধু মাইনের দিন নয়, অন্যান্য দিনও হৈ-হল্লা হতে লাগল। শুধু এইটুকু বাঁচোয়া যে অশ্লীলতা নেই। বউকে তাড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখানো আছে, গলা টিপে মেরে ফেলার শাসানি আছে, আর সব চাইতে বেশি কোনো এক রাক্ষসীকে টাকা-পয়সা এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপার।

পাশের ফ্ল্যাটের ভুবনবাবু একদিন বললেন, 'বেটা ছোটলোক, বেহেটু মাতাল। আপনার ছেলেপুলেদের সঙ্গে অত খাতির করতে চায় কেন বুঝি না।'

'তাই চায়? চায় নাকি?' বলে চলে এলাম। কিন্তু মাতালটার চীৎকার যেন আমার ব্যক্তিগত একটা লজ্জায় পরিবর্তিত হবে এমন সূচনা দেখা দিল। অথচ প্রথম দশ পনরোদিন ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে যাতায়াত করেছে। ব্রাহ্মণী না বলে দিলে আমি ধারণা করতে পারতাম যে রাত্রিতে সে বাক্স-টাক্স ভেঙেছিল, তার আগে পর্যন্ত বৌটি একাই বাস করত। ব্রাহ্মণীকে বললাম 'স্বরূপ কি বেশিদিন চেপে রাখতে পারে?'

'বউটারই দুঃখ।'

সিনিকের ভঙ্গি নিয়ে বললাম, 'অবশ্য, সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টাই করেছে। তোমাদের দশজনের চাপে আর কতদিন সে আত্মসংকোচ করবে। তারও তো একটা অধিকার আছে।'

কিন্তু সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে।

এই পরিবারটি আমার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করছিল। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ছোটখাট কথা কাটাকাটি বাড়তে লাগল। একদিন তিনি বললেন, 'বৌটি যাকে সময়ে-অসময়ে সাহায্য করে সে বৌটির শাশুড়ী, নিজের মা নয়।'

'মানে লোকটির সৎ-মা বলছ?'

'না। নিজের মা।'

'তাহলেও কন্ডাক্টর মানে ছেলেই যখন নিষেধ করছে তখন কি দরকার বৌটির ভালোমানুষী করে?'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'বৌ হওয়ার অনেক জ্বালা।'

কথাটার এখানেই শেষ হল না। আমার মনে হতে লাগল মায়েদের কথা। বললাম, 'বৌটির বোধহয় কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে। ছেলে আর মায়েতে পার্থক্য এনে দিয়ে এখন—'

'বৌয়েদের দোষ এমন ধরে নেয়ার কি যুক্তি? শাশুড়ীদের দোষ থাকতে পারে।'

'তুমি নিজে বৌ হয়ে শাশুড়ী বৌয়ের ঝগড়ার ব্যাপারে বৌয়ের পক্ষ নিলে সেটা কেমন দেখায় না?'

'আমার মনের ছবিটা দেখতে পাও বুঝি?'

অফিসে এসে মনটা কেন তিক্ত হয়ে রইল কারণ খুঁজে পেলাম না। উপরি

কয়েকটি টাকা পেলাম। ভাবলাম, কটু কথা অকারণে বলে এসেছি, একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যাই। তারপর মনে হল সেটা ভালো হবে না, ঘুষ দেওয়ার মতো দেখাবে, তারপর মনে হল আবার মায়েদের কথা। মা বলেছিলেন, 'তুই তো শহরে যাবি, বৌকেও নিয়ে গেলে কি টাকা পাঠাতে পারবি আর !'

'কি দরকার টাকা পাঠিয়ে ? তুমিও চলো।'

মা কিছু বলেননি। কিন্তু শহরের সেই এক ঘরোয়া ফ্ল্যাটে যে শাশুড়ী-বৌয়ের স্থান সঙ্কুলান হয় না এ তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমিই বলেছিলাম।

একসময়ে এরকম মনে হয়েছিল ছেলের সুখের চাইতে ছেলের টাকার দিকেই যেন মায়েদের নজর বেশি। বলেছিলাম, 'পৃথিবীতে আর সব মায়ের মতো তোমারও টাকার দিকেই নজর।' মার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবু আসবার সময়েও মা বলেছিলেন, 'পারিস তো কিছু পাঠাতে চেষ্টা করিস।'

একটা আকস্মিক আবেগে উপরি পাওনা টাকা কটা মায়ের নামে মনিঅর্ডার করে দিলাম। স্থির করলাম প্রতিমাসেই অতঃপর টাকা পাঠাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চলল না।

একদিন তুমুল ব্যাপার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ যাবৎ গোলমাল শুনছিলাম। কি নিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হল এপক্ষে কনডাক্টর ওপক্ষে একটি খাণ্ডার মেয়েছেলেতে বস্তির ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'মা নাকি ?'

ব্রাহ্মণী জানলাগুলি বন্ধ করে দিয়ে এসে ভয়ে যেন কাঁপতে লাগলেন।

'খুন-টুন হবে নাকি ?'

ব্রাহ্মণী পাংশুমুখে বসে রইলেন। উভয় পক্ষই মাঝে মাঝে একটি কথা উচ্চারিত হচ্ছে—সেটা নিজের ভদ্রলোকত্বের প্রতিষ্ঠা ও অন্যের অভদ্রতার ইঙ্গিত। এবং তা করতে গিয়ে অশ্লীলতার চূড়ান্ত করছে। খাণ্ডার মেয়েছেলেটি ভাড়ার তাগাদা দিতে এসেছিল। বাড়িওয়ালার কেউ হবে।

পরদিন সকালে মেজছেলে তার দাদাকে বলল, 'কাকারা চলে যাচ্ছে।'

'চলে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, সকাল থেকে রাস্তার মোড়ে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কাকা এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছে, মাল চাপাচ্ছে।'

কথাটা শুনে কিছু বলার আগে ছোট ছেলে খোলা জানালার ধারে গিয়ে চীৎকার করে বলল, 'কাকা যাচ্ছ ?'

দু-তিনবার বলবার পর নিচে থেকে হাসির শব্দ পেলাম। অত্যন্ত মধুর গলায় কে যেন বলল, 'হ্যাঁ বাবা, যাচ্ছি। মাঝে-মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।'

যা করা উচিত না তাই করলাম। জানালায় উঁকি দিলাম। দেখলাম লোকটি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে-করতে মাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যেন সে আনন্দে শিস্ দিচ্ছে এমন সন্দেহ হল। এ-বাড়ি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এই যেন তার ভাব।

সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মণী বললেন, 'যাই বলো বড্ড যেন নীরব হয়ে গেছে।'

কথাটা সত্যি।

'আচ্ছা ভদ্রলোক কি সত্যি মদ খেতো?'

'কি জানি।' দার্শনিক ভঙ্গিতে বললাম, 'কারো-কারো অমন রাগও থাকে।'

কিন্তু কলকাতায় বাসা খালি পড়ে থাকে না। সাতদিনের মধ্যে একজন ভাড়াটে এল।

'লোক এসেছে বুঝি?'

ব্রাহ্মণী হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে।'

'কিন্তু দেখো বাপু, আলাপ করো না।'

'না।' আমরা একমত হলাম।

একদিন ব্রাহ্মণী বললেন, 'বৌটির চেহারা দেখলে কিন্তু এদের ভদ্র বলেই মনে হয়।'

'চেহারায় কি বোঝা যায়?'

'আভিজাত্য ভাবটা থাকে না?

'তা থাকুক। আলাপ করোনি তো?'

'না। বৌটির স্বামীটি যেন মাটির মানুষ। আমরা এদিকের জানালা খুলে রাখি বলে সে মাটির দিকে মাথা রেখে হাঁটে।'

'মন্দের ভালো বলতে হবে।'

দু দিন না যেতে আরও খবর এল।

'ওদের অবস্থা ভালোই ছিল। পূর্ববঙ্গে ব্যবসা ছিল। স্বামীটি এখানে এসে কোনো কাজ যোগাড় করে নিতে পারছে না। কখনো কারো কাছে কাজ করেনি, কোনো কাজও জানে না। এক দোকানে খাতা লিখে সামান্য কিছু পায়। দিন চলতে চায় না। একটি মেয়ে ছিল। এর আগে যেখানে ছিল সেখানে প্রায় অচিকিৎসায় মেয়েটি মারা গেছে এদের। তারপর থেকে স্বামীটি কেমন জড় হয়ে গেছে।'

শুনে কষ্ট হল কিন্তু তবুও বললাম, 'এই পর্যন্তই। এর বেশি নয় কিন্তু।'

বৌটি নিজে থেকে ডাকাডাকি করে আলাপ করল। এ বৌটির আলাপ করার ধরন আগের বৌটির চাইতেও ভালো। শব্দ ব্যবহার দেখে বোঝা যায় ভদ্র ঘরের এরা।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। হৈ-হল্লা চেঁচামেচি কিছু নেই। স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'যাক, বাঁচা গেল।'

আমি ধারণা করেছিলাম ওরা ওদের অস্তিত্বকে আমাদের জীবনের খিড়কির দিকেই অজ্ঞাতে রাখতে সাহায্য করবে।

একদিন ব্রাহ্মণী আবার মুখ খুললেন।

'ওদের চাল-চলন কিন্তু একটু নতুন রকমের।'

'হুঁ।'

'মানে আমার-তোমার দশজনের সঙ্গে পার্থক্য আছে।'

'হুঁ।'

'তৃতীয় একটি পুরুষ আছে।'

'তৃতীয় পুরুষ তো সর্বত্রই আছে। তাতে কি?'

'ঠিক ধরা যায় না, তবে নতুনত্বটা চোখে পড়ে।'

'চোখে না-পড়লে আপত্তি কি?'

ব্রাহ্মণী বললেন আর একদিন—

'এই জানালায় চোখ রাখো।'

'সে কি?'

'রাখো না।'

প্রতিবেশীর একতলা বাড়ি অসহায়ের মতো দোতলার অধিবাসীর কাছে উন্মুক্ত হল। দেখলাম, উঠোনে একটা লোক বসে আছে। বৌটি তার সঙ্গে গল্প করছে। এমন কিছু ব্যাপার নয়। তারা কি আলাপ করছে তা বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হয় আলাপের বিষয়টা স্নিগ্ধ এবং গোপনীয়। লোকটির অবস্থা ভালো তা তার পোশাক-পরিচ্ছদে সুস্পষ্ট।

এর পরে জানতে পারলাম এদের সংসার যেটুকু চলছে সেটা এই তৃতীয় পুরুষের অর্থে।

ব্রাহ্মণী একদিন বললেন, 'লক্ষ্য করে দেখো এই লোকটির সঙ্গে স্বামীটির কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।'

'তাই নাকি? এসব ব্যাপারে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেলে বিপদ ঘটে।'

'ব্যাপারটা যেন কি রকম। স্বামীটি শুনেছি বেকার কিন্তু ঘড়ির কাটা ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে আসে।'

'তুমি কি বলতে চাও তার অনুপস্থিতিটা আলাপ-আলোচনায় স্থির করা?'

'তা নাও হতে পারে। কারো-কারো অত্যন্ত ভয় থাকে। নিজের একটা অসুখ আছে জেনেও কারো কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারে না। কি দেখব, কি চোখে পড়ে যাবে এ-রকম ভয়েই স্বামীটা বহু দূরে পালিয়ে যায়।'

'তৃতীয় পুরুষের বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তা অন্য কোনো পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে এই ভয়?'

'তাই মনে হয় না?'

ব্রাহ্মণী একটু ভেবে বললেন, 'ছেলেটার কিন্তু বড় দুর্গতি।'

'কি হয়েছে তার?'

'লেখাপড়া করার সুবিধা নেই, খেলার সঙ্গীসাথী নেই।'

'গলিতে ঢুকবার পাকে' একটা ছেলে ঠায় দুপুরে বসে থাকে, সেই নাকি?'

'হতে পারে। লোকটি বাসায় ঢুকেই ছেলেটাকে দেখতে পেলে দু-চারটে পয়সা দেয়। প্রথম-প্রথম ভাবতাম, আহা, তবু তো শিশুটার শখ মিটছে।'

'এখন কি মনে হয়?'

'এখন বৌটি আগে থেকেই ছেলেটিকে বাজারে পাঠাবার ছল করে সরিয়ে দেয় যেন।'

ইতিমধ্যেই শহরে একটা গোলমাল শুরু হল। এদিক-ওদিক থেকে দাঙ্গার খবর আসতে লাগল। এ-বাড়িতে যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। লোকজন আসতে লাগল। গুজগুজ ফিসফিস করে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। তার মধ্যে রাজনৈতিক ও বিপ্লবসূচক কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। স্বামীটি সহসা যেন দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আলস্য ত্যাগ করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মিছিলে যোগ দেয়া নয় শুধু মিছিল চালনা করছে তাও বোঝা গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর মস্ত একটা মোট পিঠে বেঁধে চিনে ফিরিওয়ালাদের ভঙ্গিতে সে ফিরে এল।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখলাম শহরের উত্তর প্রান্তে অন্য সম্প্রদায়ের কয়েকটি দোকান লুঠ হয়েছে।

পুলিশ এল, তারা বোধহয় খবর রেখেছিল। সকালে তিন-চারজন কনস্টেবল এবং একজন দারোগা এসে ধরে নিয়ে গেল স্বামীটিকে।

পুলিশ চলে যাওয়ার পরে বৌটি কিছুকাল কাঁদল। ছেলেটিও কাঁদল। ব্রাহ্মণী বললেন, 'শুনেছ? ছ মাসের জেল হয়েছে।'

'তা হওয়া উচিত।'

দু-একমাস ওদের কোনো খবরই আর রাখিনি। একদিন অবসর বুঝে ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'প্রতিবেশীর কি খবর?'

'বুঝতেই পারছ।'

'মানে?'

'আজকাল ছেলেটা সিনেমাতে যাওয়ার পয়সা পাচ্ছে। দিনের বেলায় তো বাজারের চারদিকেই ঘুরে বেড়ায়।'

'ছেলেটা কি সিনেমা বোঝে?'

'পয়সা পাচ্ছে, যাচ্ছে। বউটা আর কত বাধা দেবে। ছেলেটা সব সময়েই প্রায় অনুপস্থিত থাকছে। সে থাকলেও হয়তো হত।'

কিন্তু ওদের জীবনে একটি আমূল পরিবর্তন দেখা দিল এবং সেটা এল আকস্মিক ভাবে। আর একটি পুরুষ আবির্ভূত হল। তার মোটা গলা প্রায়

সব সময়েই উচ্চগ্রামে থেকে তার উপস্থিতি ঘোষণা করতে লাগল। আমার ঘরের মধ্যে থেকে তার বাজারে যাওয়া, বাজার থেকে ফেরা. সাংসারিক কত'ব্যাদির অন্যান্য সংবাদ পেতে লাগলাম।

একদিন বিস্মিত হলাম। তখন আমার আফিস যাওয়ার সময়। সহসা একটা হাসির শব্দ কানে এল। প্রথমে নিচু গলায় একজন, তার পরে আর একজন তাতে যোগ দিল। তার পরে সম্মিলিত হাসি উচ্চতম গ্রামের কাছাকাছি দমকে-দমকে পেঁছাতে লাগল। আমার মনে পড়ল, এই এতদিন ধরে আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে কেউ কখনো হাসেনি।

ব্রাহ্মণী বললেন, 'আজ খবর পেলাম চতুর্থ' পুরুষটি ছেলেটির জেঠামশাই। লোকটি অকৃতদার। বয়স হয়েছে। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও এই ছোট পরিবারটির গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতে পারে। দেশে ছিল। খবর পেয়ে এসেছে। ছোট ভাইয়ের উপরে যে অভিমান ছিল এখন তা নেই। আজ ছোট ভাইকে নিয়ে এল জেল থেকে।'

ব্রাহ্মণী খবর দিলেন. 'সেই তৃতীয় পুরুষটি কিন্তু বেকায়দায় পড়েছে।'

'কি হল ?'

'ব্যাপারটি আমার চোখে পড়ে গেল। তৃতীয় পুরুষটি বাড়িতে ঢুকছিল। এমন সময় ছেলেটির জেঠামশাই ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়াল। দুজনে কিছুকাল পরস্পরকে দেখে নিল। তারপর তৃতীয় পুরুষ বললে—কবে এলেন ? জেঠামশাই বলল—এই তো এলাম। তৃতীয় পুরুষটি বিড়বিড় করে কি বলে চলে গেল।'

এর মাসখানেক পরে ব্রাহ্মণী মন্তব্য করলেন, 'তোমার সেই যে কি একটা গল্প আছে না—ঐ যে কে এসে দেবদূতের মতো সাহায্য করছে। এও যেন তাই। এতদিনে মেয়েটার ভাগ্য ফিরেছে। শত হলেও সে তো আর পাঁচটি গৃহস্থ ঘরের বৌয়ের মতো। আজ ওদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হল উঠোনে। সবাই মিলে যখন পুজোর কাছে বসেছিল তখন আমার মনে হল, আহা ওদের ভালো হোক।'

কিছুদিন পরে রহস্য করে বললাম, 'কি গো, খবর কি তোমার প্রতিবেশীর ?'

'এখন আর কোনো খবর নেই। বেশ আছে ওরা। মেয়েটি সুন্দর করে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে।'

সত্যি, সংসার গুছিয়ে নেয়াই বটে। সন্ধ্যায় যেদিন গোলমাল কম থাকে ছেলেটার সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। সে তার জেঠামশাইয়ের কাছেই বেশির ভাগ সময় থাকে। সন্ধ্যায় আজকাল বই নিয়ে বসে। ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে বোঝা যায় ছেলেটা দ্বিতীয় ভাগ পড়ত এক সময়ে, এখন তাকে আবার প্রথম ভাগ থেকে শুরু করতে হবে। জেঠামশাইয়ের কাছে সে গল্প শুনবার বায়না ধরে। এরকম এক গল্প থেকে বোঝা গেল ওর জেঠামশাই এম-এ পড়ত, পরীক্ষা

দেয়া হয়নি।

কোনো একটি অবলম্বন না থাকলে মিছরী দানা বাঁধে না। এদের সংসারে তেমনি একটি আদর্শ অবলম্বন হয়ে উঠল। প্রায়ই তাদের কথাবার্তা থেকে একটা শব্দ কানে আসতে লাগল, সেটা ভদ্রলোক। ভদ্রলোক কি করে, কি করা তাদের পক্ষে উচিত, কোনটা তাদের পক্ষে অসঙ্গত, এইসব আলোচনা তারা করত।

কলঙ্কের ছোঁয়াচ নেই এমন একটি অর্থাভারগ্রস্ত প্রতিবেশীর কথা মনে থাকে না। আমি ওদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণী একদিন বিষয়টিকে একটি দার্শনিক তথ্যের চেহারায় উত্থাপন করলেন, 'আচ্ছা—'

'বলো।'

'বৌটির কথা ভাবছি। তার যেন নবজন্ম হয়েছে। কিন্তু এ তো শ্মশানে পুড়ে নবজন্ম পাওয়া নয়। স্মৃতির হাত থেকে কি করে রেহাই পাবে?'

'তুমি বোধহয় ভাবছ বৌটি তার আদিম পবিত্রতা ফিরে পাবে না। এবং আদিম পবিত্রতাকে তুমি বড় মনে করছ। কিন্তু বয়স্ক মানুষের পক্ষে অনুশোচনা বা পরিতাপদগ্ধ মন অনেক বেশি মূল্যবান।'

তথাচ আমি ভাবলাম—মদের যেমন নেশা আছে, মদ ছাড়ার পরও যেমন স্নায়ুগুলি অনেকদিন ধরে প্রতিক্রিয়াটির জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাতে থাকে মেয়েটির পক্ষেও তেমন কিছু হচ্ছে কিনা কে জানে। বাইরে সে এই অভাবগ্রস্ততাকে একটা সুন্দর কিছুর মতো আঁকড়ে ধরলেও আফিমের নেশার মতো সেই আর একটি জীবনের ছায়া তাকে ইশারায় ডাকে কিনা বলা সহজ নয়।

কিন্তু তখন-তখনই শুনতে পেলাম, 'খোকা পড়তে বোসো।'

'যাই জেঠা।'

কল্পনা করলাম ছেলেটা দুলে-দুলে পড়ছে।

সাধারণ একটা সংসারে যা হয়—ছেলেটা দুষ্টুমি করে, ছেলেমানুষি করে। আদৃত হয়, তিরস্কৃত হয়. দুরন্তপনার মাত্রা বেড়ে গেলে প্রহৃত হয়।

একদিন খুব শাসন করল ওরা ছেলেটাকে। তখন রাত প্রায় নটা হবে। কিছুক্ষণ আগে থেকে ওর জেঠামশাই এবং বাবা এদিকে-ওদিকে খুঁজছিল। ছেলেটা ফিরে এলে ওরা রাগ করে বলল, 'কোথায় গিছলি?'

'সিনেমায়।'

'সিনেমায়!'

'এইটুকু বয়সে সিনেমায়? কোনো ভদ্রলোকের ছেলে তা যায়?'

ওর জেঠামশাই খুব তিরস্কার করল। ওর বাবা ওকে দুম্‌দাম্ করে মারল। ছেলেটা চীৎকার করে কাঁদল। অবশেষে আহারাদির পর বোধহয় জেঠামশাই ওকে পাশে নিয়ে শুয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

আমার ছোট ছেলেটা তার নিকটতম দাদাকে বলল, 'আমি কিন্তু কখনো

ছিনেমায় যাব না। বাবা মারবেন।'

ছুটি-ছাটার দিনে মাঝে-মাঝে কানে আসত : 'আরে তুই কোথায় গিয়েছিলি আবার। এই-না তোকে ধারাপাত পড়তে বলে গেলাম। কি খাচ্ছিস? বাজারে গিয়েছিলি?'

এক-একবার ছেলেটা মার খেত জেঠার কাছেই। কিন্তু তার বাবা-মা শাসনের বাড়াবাড়ি করলে জেঠামশাই মাঝখানে পড়ে বলত. 'থাক, থাক, অতো মেরো না। একদিনেই কি শোধরায়?'

একদা ছেলেটি আমাদের ফ্ল্যাটে এল। শীর্ণ চেহারায় একটি আট দশ বছরের ছেলে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে এবং সে আমার ছোট ছেলের সঙ্গে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার সময়। ছেলেরা ঘরের মধ্যে বইখাতা গুছিয়ে নিচ্ছে এমন সময়ে সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল। ফুটপাত থেকে কেনা অত্যন্ত সস্তার নতুন প্যাণ্ট ও বেডৌল একটা নতুন কামিজ পরনে। পায়ে শাদা ক্যানভাসের নতুন জুতো। ওরা ছেলেটিকে অবশ্য যথাসাধ্য সাজিয়ে দিয়েছে। ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে আমার ছেলেদের পোশাক পরা দেখছিল। প্রতিবেশী ছেলেরা এক সঙ্গে স্কুলে যায়। আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের আভাস ছিল ছেলেটির মুখে।

কিন্তু আমার বিরক্ত বোধ হল। দরজার কাছে গিয়ে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তুমি যাও, এদের যেতে দেরি হবে।'

ছেলেটি নিচে গেল, এবং তার বইখাতা আঁকড়ে ধরে নেমে গেল।

সে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণীকে বললাম, 'মুশকিল হবে যদি ঐ ছেলেটি তোমার ছেলেদের সঙ্গী হয়। সিনেমার দরজায় ঘোরা, বাজারে ঘোরা ছেলেরা এমন অনেক বিষয় জানে শোনে যা ভদ্রলোকের ছেলেদের জানা উচিত নয়।'

'স্কুলে মেশা তো বন্ধ করা যাবে না।'

'মুশকিল, মুশকিল।'

ওদের নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমার মনে হল এই ছেলেটিকে অবলম্বন করে এরা উঠবার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু মনের এক কোণে এরা বুঝতে পেরেছে নতুন করে জীবন শুরু করা ওদের নিজেদের পক্ষে কোনো-কোনো কারণে আর সম্ভব নয়। আঘাতের ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত পেশী স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে আছে, ত্বকের গভীরে ক্ষতের চিহ্নটি এখনো আঘাতটিকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। নিজেদের সব সাধ, সব কামনা যেন ছেলেটির মধ্যে প্রস্ফুটিত দেখতে চায়।

আমার এত কথা মনে হওয়ার কারণ, আমি লক্ষ্য করতাম ছেলেটিকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে ওরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্ন নিচ্ছে। লক্ষ্য করতাম ওর যে কোনো ব্যাপার নিয়েই বাপ-মা ও জেঠামশাই কথা বলছে এক সঙ্গে।

একদিন ছেলেটিকে ওরা অত্যন্ত বেশি শাসন করল। তখন সন্ধ্যা হবে। জেঠামশাই বাসায় ফিরে বলল, 'খোকা আসেনি ?'

মা বলল, 'কই না তো।'

'ছেলে তোমার বেহাত হয়েছে, বাপু। ডাক্তারের দোকানে ওষুধ কিনে দিয়ে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ছাত্র পড়াতে গিয়েছি। সে দেড়-দুঘণ্টার কথা। বাপের অসুখ. তার ওষুধ, তা বলেও কি মায়া নেই।'

'কোথায় গেল ?'

'যাবে আবার কোথায়। বাজারে ঘুরছে। বাজারে ঘোরা অভ্যাস করিয়েছ তোমরা। ওটুকু ছেলেকে দিয়ে কি বাজার করাতে আছে।'

'বাজারে ঘুরবে পয়সা পাবে কোথায় ?'

'তুমি সত্যি করে বলছ তুমি পয়সা দাও না বৌমা ?'

'না।'

'তাহলে যা ভয় করেছিলাম তাই। আমার তোশকের তলে পয়সা প্রায়ই কমে যায়। এতদিন ভাবতাম আমার ভুল। চুরিও শিখেছে তাহলে।'

কিছু পরে ছেলেটি বাসায় ফিরল। ঘরে ওষুধ রেখে সে হাসিমুখে তার মাকে কি বলতে গেল। মা বলল, 'এদিকে শোন্।' ছেলেটা কাছে যেতেই 'অকারণে বাজারে ঘোরা তোমার ?' এই বলে চটাপট মা কয়েকটা চড় মারল। ছেলেটা কিছুটা নিরুদ্ধ অভিমানে কিছুটা বা রাগ করে উঠোনে এসে দাঁড়াল। জেঠা বলল, 'আহা মারো কেন, বৌমা। এদিকে শোন্।' এই বলে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। তিরস্কার করতে করতে রাগ বেড়ে উঠল তার। তারপর—'তুমি এই বয়সে চুরি করো' এই বলে সে দুমদাম করে ছেলেটিকে মারল। ছেলেটি এবার হাহাকার করে কেঁদে উঠল। বোধহয় সে চিনেবাদাম চিবোচ্ছিল, কষ বেয়ে শাদা ফেনার মতো চিনেবাদামের রস গড়াতে লাগল চোখের জলের সঙ্গে। বাবা ঘরে শুয়েছিল। সে উঠে এসে বলল, 'আহা কি করো।' বোধহয় কিছু আশ্বাস পেয়ে ছেলেটা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'বল্, চুরি করেছিস ?' এইবার প্রশ্নটা দুবার করে হঠাৎ সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে লাথি মারল ছেলেটিকে। ছেলেটা উঠোনে পড়ে গেল। তার উপরে উপর্যুপরি লাথি পড়তে লাগল। তখন জেঠা এগিয়ে এল—কিম্বা বোধহয় কোন এক সময়ে জেঠার কাছে ভালো ব্যবহার পেয়েছিল তার স্মৃতিতে ছেলেটা জেঠার কাছে এগিয়ে গেল। জেঠা দু-একটা কথা বলে আবার মারতে শুরু করল।

ওদের হুঙ্কার ও ছেলেটার আর্তকান্নায় এদিকের ফ্লাটের সবগুলি জানালা খুলে গিয়েছিল। উঠোনের ভিন্ন দিকে বাবা জেঠা মা দাঁড়িয়ে, মাঝখানে মাটিতে পড়ে ছেলেটি। এখন সে আর কাঁদছেও না, গোঙাচ্ছে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে একবার এর কাছে আর একবার ওর কাছে আশ্রয়ের জন্যে যাওয়ার

চেষ্টা করছে, প্রত্যেকের কাছেই নিদারুণ প্রহার খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি যেন উপলক্ষ মাত্র, তাকে আঘাত দিয়ে এই চক্রব্যূহ যেন কোন বিভীষণ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

কি হল জানি না। অনেক পরে এদিকের বারান্দায় ব্রাহ্মণীকে বসে থাকতে দেখলাম। আমার ছেলেরা বোবা হয়ে গেছে ভয়ে। তারা আলো কমিয়ে দিয়ে না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণী বললেন, 'এর চাইতে ট্রামের কনডাকটরের রাগা-রাগি ভালো ছিল। সে এই পল্লী থেকে বস্তিতে চলে গেছে সেও ভালো। জিতবার এমন চেষ্টার চাইতে হার মানা ভালো।'

দেখলাম ব্রাহ্মণীর চোখে জল। তিনি বললেন, 'তুমি বলতে চাও ওর বাবা আর কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সুযোগে চুরি করবে না? ওর মা সেই তৃতীয় পুরুষকে কখনো একেবারে পরিত্যাগ করেছে? ছেলেটার যে বাজারে যাওয়ার অভ্যেস সেটা ওর বাবা-মা করায়নি?'

আমি ভাবলাম—অভ্যাসটি কি রকম ব্যাপার। এই ছেলেটিও কি অভ্যাস ত্যাগের জন্যে চেষ্টা করছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষতের মতো তার জাগ্রত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যাস তাকে পুরানো জীবনের আবর্তে টেনে নামাতো।

ভোর রাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

ব্রাহ্মণী ধড়মড় করে উঠে জানালা খুলে দিলেন।

'আহা-হা; হায় হায়—খোকা আর কোনোদিন তোকে মারব না। চোখ মেল, ও খোকা।' বিকৃত কণ্ঠের মর্মভেদী শোকপ্রকাশ।

ব্রাহ্মণী মুখে আঁচল চাপা দিলেন কিন্তু কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন।

কাজটা বোধহয় ভুবনবাবুই করেছিলেন। পল্লীর ভদ্রতা রক্ষা সম্বন্ধে তার একটা বাতিক আছে। পুলিস যখন এল তখন বিছানার চাদর ঢাকা ছেলেটার পাশে তার মা ফিট হয়ে বসে আছে। তার বাবা মাটিতে মাথা ঠুকছে, তার জেঠা নিজের মাথার চুল টেনে টেনে উঠোনে উদভ্রান্তের মতো পাক খাচ্ছে আর বলছে—'ও হো হো।'

ওরা আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বনটির উপরে অত্যধিক নির্ভর করতে গিয়ে সেটিকেও হারাল যেন।

পুলিস-অফিসার আমাকেই প্রশ্ন করল।

সে কি আপনি দেখেননি? ভুবনবাবুরই বরং এদিকে জানালা নেই। আপনার জানালা থেকে তো সব দেখা যায়।'

'না। আমি দেখিনি। ছেলেটা অসুখে ভুগছিল শুনেছিলাম।'

মিথ্যাটা বলে পুলিসের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সাক্ষী দেওয়া আমার ধাতে সয় না।

ভূকম্পন

এক-একটি গ্রাম থাকে যার আগাগোড়া শুধু পুরাতনের চিহ্নে ভরা। শুধু পুরাতনই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক বলে মনে হয়। কোন এক রেলওয়ে স্টেশনে নেমে গোরুগাড়ির কনভয় (বহর) সাজিয়ে দেহাতি লোকজনের হাতে, মাথায়, পিঠে, বন্দুক ও জলের ব্যাগ, হ্যাজাগ ও কুইনাইন নিয়ে খুঁজে বার করার উপযুক্ত একটা গ্রাম।

ধ্বংসস্তূপ নয়, যে যথেচ্ছ বিহার করা যাবে, খুবলে খাবলে দেয়া যাবে। পথের দুধারের জঙ্গলের আড়াল থেকে হঠাৎ কোনো একটি প্রাণীর আবির্ভাব সব সময়েই প্রতীক্ষা করে চলতে হয়। এমনও মনে হয় পায়ের তলে এ জগতের কোনো প্রাণীর ঘরকন্না গুঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু এ সত্য নয় যে বিষাক্ত তীর উঁচিয়ে আসবে, তাদের বৈরিতা প্রকাশ পায় শুধু খানিকটা নির্লজ্জ কৌতূহল এবং খানিকটা অনাত্মীয়তার দৃষ্টিতে।

সভ্যতার অর্থ যদি হয় যাযাবরবৃত্তির বিপরীত অর্থাৎ একটি ভূখণ্ডে আবদ্ধ হয়ে চাষবাস করা, তাহলে এদেরও একটা সভ্যতা আছে। আসসেওড়া, ভাঁট, বিছুটি, বুনোলতার কালচে সবুজ রঙের জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে মনে হয়ে যায় এসে পড়েছি লোকালয়ে। দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে আলোর বৃত্তাভাস যেমন ঘরের মেঝেতে পড়ে, চারিদিকের নিরন্ধ্র জঙ্গলের মধ্যে কোনো-কোনো জায়গায় তেমনি পড়েছে সূর্যের ঝকঝকে আলো, আর ঠিক যতটুকু জায়গায় পড়েছে সেখানে ফাঁকা জায়গায় সরষে ফুল হলুদ হয়ে আছে, আর্যদের সূর্যমুখী ছন্দের মতো।

এটা প্রাণশক্তির প্রসার চেষ্টার চিহ্ন। প্রায়ই দেখা যায় এরকম ক্ষেতগুলির পাশে নতুন একটি কুঁড়ে। বহুদিনের পরিত্যক্ত কোনো ভিটায় কোদাল দিয়ে ঘাস চেঁছে, ঘটি-ঘটি গোবর জল ঢেলে, নল-খাগের দেয়াল, আমন গন্ধী খড়ের ছাউনি তুলে ছোট একটা কুঁড়ে। ঝাড় থেকে সদ্য কেটে আনা বাঁশের রঙে, সদ্যলেপা আঙিনার রঙে, কাঁচার একটা আমেজ যেন জড়িয়ে থাকে।

এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল সুরেন জেলের ছেলে ননী যখন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ফৌত হয়ে যাওয়া দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের ভিটায় ঘর তুললে। ঝগড়ার কারণটা তাদের পল্লীর পাশের একটা মেয়ে। জেলেপাড়ার লোকগুলি একদিন বৈকালে দেখতে গিয়েছিল ননীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। গত

আট-দশ বছরে এ গ্রামে বিবাহ একটিও হয়নি, রামেশ্বর ঢুলির নতুন-আনা তার চাইতেও বয়েসে বড় বৈষ্ণবীর সাথে কণ্ঠি বদলের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে। মনের অগোচর পাপ নেই, পুরুষদের সকলেই লুব্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভাবল এমন চেহারাটা হয়ে উঠেছে কে জানত, ম্যালেরিয়ার এমন অস্বীকার, দেহের এমন বন্ধুরতা ; ঘর তোলা যায় বটে ও জিনিস পাবার জন্য।

চঞ্চলতার আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল দু-তিন বৎসর পূর্বে। গ্রামের এককালীন জমিদার শিকদার বংশের ব্রহ্মোত্তর জমির উপরে একটা মাঝারি গোছের ধ্বংসস্তূপ, একটা মজে যাওয়া পুষ্করিণী, জঙ্গল হয়ে যাওয়া আম-কাঁঠালের বাগান। রাধা বৈরাগী শিকদার-বাড়ির অন্দরমহলের আঙিনার ঘাসে রোজই গরু বেঁধে দিত, বৃষ্টি ধরলে গরু আনতে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়-পরা একটি ছেলে দেখে। সংবাদটি সেই রটিয়ে দিল, গ্রামে কৌতূহলের সঞ্চার করে।

আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি বশে প্রাণীজগতের কোনো-কোনো স্তরে প্রতিবেশের সঙ্গে দৈহিক গঠন ও বর্ণের একটা সামঞ্জস্য এসে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রে সেটা বর্তমানেও হতে পারে এটা বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয় চিন্তা করা, (মানুষের অস্তিত্ব এমন শিলীভূত হয়ে পড়েছে যে তার আর বিবর্তন হবে না এরকম ধারণাই অনেকের) কিন্তু এদিকে যেন এটা হয়।

গ্রামের চেহারার সঙ্গে একটা সাদৃশ্য এসে গেছে শিকদার-বাড়ির ছেলেটির। শিকদারের জুতো ছিঁড়বার পর জুতো এলো না, জামাকাপড়গুলিতে সাজি মাটি কিম্বা সোডার লালচে দাগ পড়ে গেছে দু-তিনবার নিজে হাতে ধুয়ে নেবার পর। চেহারাও বদলে গেছে তার, তার ক্ষেত্রে এটা হল ম্যালেরিয়ায়, কিন্তু মনে হয় ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য প্রকারেও হতে পারত। ননী জেলের ক্ষেত্রে সেটা হল নৌকাডুবি। ননীর ঘরখানিতে মানুষের জবরদস্তির একটা ছাপ লেগেছিল। ননী পাশের গ্রাম থেকে হাট করে ফিরবার সময়ে আহার্য ছাড়া মেয়েমানুষের জন্য কোনোদিন সিঁদুর, কোনোদিন বা পান কিনে আনত : তার আঙিনায় আগাছার অঙ্কুর গজাতে পারেনি। হঠাৎ একদিন ননী মাছ ধরতে গিয়ে ফিরল না। দু-তিন মাসের মধ্যে ননীর ঘরের সঙ্গে চারিপাশের ঘরগুলির একটা সাম্য এসে গেল। সেই মেয়েটাকে এখন আর উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে দেখা যায় না। গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে রুক্ষ চুলে ছেঁড়া কাপড়ে মিশে গেছে। তার মুখে যেমন অশ্রু ও মাটিতে মেশান ক্লিন্ন দাগ পড়েছে, তেমনি বর্ষায় হেজে যাওয়ার দাগ তার ঘরের বেড়ায়।

শিকদার গ্রামে এসে প্রথম বছরটায় বেশ একটু বেড়ে উঠেছিল দেহের দিকে। দ্বিতীয় বছরে তাকে ম্যালেরিয়া ধরল। পনরো দিন পর-পর এখন তার জ্বর আসে বর্ষাকালটা ধরে, তারপরেও কিছুদিন। বছরের অন্য সময়ে দু-তিন মাস পর-পর হয়। প্রথমে জ্বর হলে সে একে ওকে অনুরোধ ক'রে কুইনাইন আনাতো

দূর থেকে, পথ্যাদি সম্বন্ধেও বাছ-বিচার করে চলত। পরে সে ঠিক করেছে কি লাভ কুইনাইন খেয়ে ; এখন সে জ্বর ছেড়ে গেলেই কুইনাইন খায়, সামান্য জ্বর গায়েও চলে।

শিকদার কেন এ গ্রামে এসেছিল খোঁজ করতে যাওয়া বৃথা, বোধহয় অনন্যোপায় হয়ে। গ্রামে এসে শিকদারের প্রথম রাত্রি কেটেছিল ভয়ে। সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে পৌঁছে থাকবার মতো ভালো একখানা ঘর খুঁজে নিতে সাহস পেল না সে। স্তূপীকৃত ইঁট, কাঠ-কাঠরার মধ্যে সাপের ভয়ে, বন্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গন্ধে সে ঘুমোতে পারেনি। অনেকবার ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তার।

পরদিন সে জীবন্ত মানুষের সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে গেল। প্রথমে সে একটা হোটেলের খোঁজে বেরিয়েছিল এই গ্রামে, তারপরে একটা ছোট দোকান খুঁজে পেয়ে খানিকটা চিঁড়ে আর গুড় কিনে এনেছিল। সেগুলি শুকনো চিবিয়ে খেয়ে জলের প্রয়োজনে এদিকে ওদিকে ঘুরে খিড়কির পুকুরের জলের দুর্গন্ধে কাঁদো-কাঁদো হয়ে যখন সে ফিরে আসছে তখন তার সঙ্গে এ বাড়ির আর দুটি, তিনটিও বলা যেতে পারে, প্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়। এক বুড়ি, তার মেয়ে হৈম, আর তাদের মতোই রোগজীর্ণ একটা গাভী।

বুড়ির সঙ্গে আলাপ হতে সে জেনেছিল বুড়ি এ বাড়িতে আছে তারই সুবাদে ; কি রকমে, বংশের কোন লতায়, তার কোন পিতামহী। 'আর হৈম তাহলে পিসিমা' সে হেসে বলেছিল। গাভীটি নাকি তার 'নিজের পিতামহের বিলেতি গরুর পঞ্চম পর্যায়ের বংশধর।

কিন্তু গাভীটির ইতিহাস শুনবার চাইতেও বড় কাজ ছিল তার। মাত্র আঠার উনিশ বছরের একটি ছেলে সে, রাত্রির ভয় ছিল। সারাদিন খুঁজে সে বাড়ির এক কোণে একটু আলো-বাতাস-ওয়ালা, একটু কম-ভাঙা ঘর খুঁজে বার করল। অনেক কষ্টে যোগাড় করা একটা মোমবাতির আলোয় সে রাত্রি চিঠি লিখল এক মুদিকে : ভাই, কাল আমি রওনা হব। দাদার আশ্রয়ে যাব না। তোমার দোকানে তোমাকে সাহায্য করলে কি আমায় খেতে পরতে দিতে পারবে? চিঠির কাগজে টপ্-টপ্ করে দুফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। যাকে কোনোদিন দেখেনি, সেই বাবার কথা মনে হয়ে অভিমান হতে লাগল।

বাড়ির ভাঙা দালান থেকে ইতিপূর্বে সে বার হয়ে এসেছিল, টিনের দেয়াল, টিনের ছাদ দেয়া একটা ছোট ঘর, পূর্বে বোধহয় ভৃত্যস্থানীয়েরা থাকত, সে খুঁজে পেয়েছে। নিজে সাফসুতরো করে সে আস্তানা করে নিয়েছে সেই ঘরে। একটা ছোট জলচৌকি খুঁজে পেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজের একখানা ব্যবহার-জীর্ণ ধুতি তার পরে বিছিয়ে মায়ের ফটো, চিঠি লেখার মতো খানিকটা কাগজ, একটা সস্তা ফাউন্টেন পেন রেখে দিল।

ব্যাধির বিষ কোন সুযোগে দেহে প্রবেশ করে ডাক্তাররাও সব সময়ে বলতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও কারণ হিসাবে কোনো একটি ঘটনাকে নির্দেশ করা যাবে

না। পচা, বুজে-আসা পুকুরে ছিপ ফেলে হঠাৎ একদিন ব্যাধিগ্রস্ত একটা মৃগেল মাছ পাওয়া থেকে এর সূত্রপাত হওয়া যেমন সম্ভব তেমনি হঠাৎ কোনো বংশানুক্রমিক প্রজা আবিষ্কার হওয়াতে। ভাত খাবার চালটা কোথা থেকে আসে শুনতে বসে সে জানতে পারল তার প্রজা আছে। অল্প বয়েসে নানা রঙিন কল্পনা মনে আসে, কিন্তু জমিদারির মান মর্যাদার ব্যাপারগুলি তার জানতে বাকি ছিল, ফলে সে পরদিন নিজেই গেল সেই প্রজার বাড়িতে। মানুষের যে পরিণতি সে দেখেছিল তাতে আর জমিদারি করার কোনো কথাই তার মনে হয়নি, ফিরে এসে নিজেকে দুয়ো বলে নিজের ঘরে বসে রইল।

বিষ প্রবেশ করার পর কিছু সময় ভালো কাটে, শেষ পর্যন্ত সবল দেহকেও আচ্ছন্ন করে। দু-তিন বছর পরে শিকদার গ্রামের একজন হয়ে গেল। শুধু ম্যালেরিয়ায় নয়, শুধু ময়লা পরিধেয় নয়, হাই তোলার ভঙ্গিতে, দুপুরের ঘুমোনোর বাঁধাধরা নিয়মে তো বটেই, কথা বলবার ধরনে, চিন্তার পদ্ধতিতেও সে গ্রামের একজন হয়ে উঠল।

এ বাড়িতে এসে বড় বলে প্রথমে যে ঘরখানায় সে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিল আবার সেইখানাতেই সে ফিরে গেছে। একটা বহুকালের পালঙ্ক থেকে উই তাড়িয়ে এনে পেতেছে ঘরে, সে পালঙ্কে শুয়ে-শুয়ে সে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। আস্তর প্রায় সর্বত্রই খসে পড়েছে, হঠাৎ দু চার বর্গফুট জায়গা কি করে বেঁচে গেছে, কি সুন্দর মার্বেলের মতো মসৃণ সে জায়গাটুকু। ঘরের সারি-সারি চারটি দরজার মধ্যে দুটিকে ভেতর থেকে ইট গুঁজে খাড়া রাখতে হয়, একটির পাল্লা দুটি আটকায় বটে তবে ঘুণে ধরেছে। চতুর্থটি হচ্ছে শিকদারের সম্পদ। এই দরজাটির পাশের দেয়ালের খানিকটা এখনও অটুট আছে, সিঁদুরের দাগে সেখানে একটি স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা, কোনো উৎসবের মাঙ্গলিক চিহ্ন। এত আপনার মনে হয় সেদিনের লোকগুলিকে।

মনের ইতিহাস স্তরে-স্তরে বদলে যায়, সবগুলি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আর একটা পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল একটা ভাঙা টিনের তোরঙ্গ সরাতে গিয়ে। কতকগুলি পুরানো কাগজ, হলুদ হয়ে যাওয়া ভিজে-ভিজে, খসে-আসা কাগজ বেরিয়ে পড়েছিল সেটাকে সরাতে গিয়ে। একটা চিঠি কোণে পড়েছিল, কাগজ ভিজে বটে, কিন্তু লেখার উত্তাপটা অনুভব করলে সে, অতীতকালের কোনো একজন পুরুষ একটি মেয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, স্ত্রী হতে পারে, নাও পারে।

বাড়ির এঘরে-ওঘরে অনেকগুলি বড়-বড় কাঠের বাক্স ছড়ানো আছে। টাকা পয়সা কিম্বা কি আছে এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে সেগুলি সে খুলেছিল। বাক্সগুলির উপরে ছাতা পড়ে গিয়েছিল, ভেতরের বাষ্প অবর্ণনীয়, কিন্তু বারে-বারে খুলতে-খুলতে বাষ্পজাতীয় কিছু আর এখন নেই, শুধু চামচিকে উড়ে-বেড়ানো বন্ধ ঘরের মতো সোঁদা-সোঁদা গন্ধ আছে। প্রথম দিকে স্কুলের

পাঠ্য হাইজিন বইয়ের কথা মনে হয়ে কত ভয়ই না করেছে তার।

ছেঁড়া-ছেঁড়া স্তূপীকৃত কুশাসন, পুজোর বাসনের টুকরো-টাকরা, খত, তেরিজ, পাট্টা, কত না জিনিস। সেগুলি রোদে দিয়ে ঝেড়ে পুঁছে তোলা হয়ে গেছে। নিজের জিনিস, কেউ হাতে তুলে না হয় নাই দিয়েছে, কেউ ফেলতে পারে! দুপুরে জ্বর বেশি হলে, বিকেলে ঘর থেকে বার হতে না পারলে কাগজগুলি সে পড়ে, অনেক কথা সে জানতে পারে, ভালো লাগে।

শুধু চিঠিপত্র নয়, বুড়িও তাকে অনেক কথা বলেছে। বুড়িকে এখন আর খারাপ লাগে না। খানিকটা কৃতজ্ঞতাও আছে ভালো লাগার মধ্যে, বুড়ি মাঝে-মাঝে সোরগোল করে, বাড়াবাড়ি করে ফেলে। রাধা বৈরাগী গরু বেঁধে দেবার জন্য একটা থান ইট কুড়িয়ে ঠুকছিল একদিন, দু-তিনটি আঘাতে ইটখানা দু-টুকরো হয়ে গেল; সেটা বুড়ির চোখে পড়াতে বুড়ি বাড়াবাড়ি করেছিল, শিকদারকে নিজে এসে থামাতে হয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টি থাকা ভালো বইকি—শিকদার নিজেও স্বীকার করেছিল।

কিরণ নামে একটি লোক জেলেপাড়ায় প্রতি বৎসরে একবার করে আসে। সে নিজেও জেলে, কিন্তু কি সম্বন্ধ এদের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া কঠিন। লোকে বলে তার মাতুল বংশের কে নাকি ছিল কোন কালে এই জেলেদের একজন। সে বংশের কেউ নেই। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে কিরণকে আসতে দেখা গেছে। তখন জ্বরে ভোগা রোগা একটা ছেলে ছিল সে। এখন কিরণ মস্ত কালো মাংসল দেহ, ঝাঁকড়া চুলে লাল গামছা জড়ানো একজন। সারা বৎসর ব্রহ্মপুত্রে আর পদ্মায় মাছ ধরে বেড়ায়। বৎসরে নিয়মিত একটি সময়ে, যখন অন্যান্য গ্রামে পুজোর সময়, কিরণ আসে। অত বড় দেহটার আড়ালে হয়তো একটা মন আছে যে মামাবাড়ির কথা ভুলতে পারে না। সে গ্রামে এলে সাড়া পড়ে যায়, সকলের সঙ্গে সব বয়েসের সঙ্গে তার হৃদ্যতা, সকলের কথা শোনে সে, ভরসা দেয়, তারপরে সপ্তাহ শেষ হতে না হতে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

শিকদার একবার শুনল কিরণ গ্রামে এসেছে, পুরানো কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সে দেখেছে কিরণের ফৌত হয়ে যাওয়া মাতুল রাইকিশোর তার প্রজা ছিল। তার ভিটাটা খালি পড়ে আছে। বিশ বৎসরে খাজনায় প্রায় বিশ টাকা পাওনা হয়েছে ভিটাটার দরুন। কিরণ ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, সে যদি মামার ভিটায় এসে বসে একজন লোক হয় গ্রামে, খাজনাটারও একটা বন্দোবস্ত হয়। তলব হল কিরণের।

কিরণ এসে তার অতবড় দেহটা প্রণিপাতের ভঙ্গিতে নুইয়ে বলেছিল, 'কর্তা অধীনের ব্যাজ্জাতা মাপ করতে হবে। আপনি আছেন এখবর গতবারেও পাইনিকো।'

তার হাসিভরা বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে শিকদারের সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, গল্পগাছা করে সে যখন চলে যায় তখন অন্য আর একজনের সাহায্যে কথাটা

পেড়েছিল সে।

পরের দিন সকালে কিরণ এল, যাত্রাগানের নটের ভঙ্গিতে চক্চকে ভিক্টোরিয়া মার্কা বিশটা টাকা শিকদারের কাছে রাখল, তারপরে দরজার বাইরে কাকে ইশারা করল। বাইরের লোকটি হাতে ঝুলিয়ে আনতে কষ্ট হয় এত বড় একটা মাছ নামিয়ে দিল, বাঁকা থেকে।

শিকদার যদি শহরের লোক হত, ভাবত কিরণ তাকে পরিহাস করল, তার অস্বচ্ছলতার সঙ্গে নিজের দেবার ক্ষমতার তুলনা করে। শিকদার খুশি হল, এতদিনে একজন তবু সম্মান করল।

চলে যাবার দিন গ্রামের সকলের সঙ্গে দেখা করে, তাদের ফরমাস টুকে নিয়ে কিরণ নিজে থেকেই এল শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে। হৈম-র মতো তাকে কিরণদা বলতে পারে না শিকদার কিন্তু মনে হল বলতে পারলে ভালোই লাগত বোধহয়। কথায়-কথায় শিকদারের স্বাস্থ্যের কথা উঠল। কিরণ বললে 'কর্তা আপনার ঐ বুড়ি গাইয়ের দুধে বিষ আছে, কেমন খয়রা রঙ দুধের দেখেছেন না?'

কর্তার মনটা জমিদারের খোলস থেকে বাইশ বছরের সরল মন নিয়ে বেরিয়ে এল, 'কি করব, ভাই, তাহলে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়।'

কিরণ কোনো কথাই শুনলে না, শিকদারকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল গ্রামের বাইরে মুসলমান পাড়ায়। সেখানে বন্ধুস্থানীয় একজনকে বলে শিকদারের সারা বছরের দুধের ব্যবস্থা করে দিল। যখন সে নদীর ঘাটের দিকে চলে যাচ্ছিল তখন শিকদার বলেছিল, 'আচ্ছা কিরণ, গ্রামে তুমি থাক না কেন? বেশ লাগে তুমি থাকলে।'

কিরণ প্রথমে পরিহাসের মতো করে বলেছিল, 'মামাবাড়ি, আজ্ঞা কর্তা, সাত-দিনের বেশি থাকতে নেই।' কয়েক পা গিয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে অপেক্ষাকৃত গভীর সুরে বলেছিল, 'নদীতে থেকে খারাপ অভ্যাস হয়ে গেছে। রোদ আর শুকনা মাটি ভালো লাগে না আজ্ঞা।

কিরণের কথাগুলি তার মনে লেগে থাকল, তবে কিরণের গতিমান জীবনের সঙ্গে তার আবদ্ধ জীবনের তুলনা তখন-তখনই সে করলে না। সেটা হয়েছিল পরে একদিন স্বপ্নে, আনন্দ বোধ হয়েছিল তার স্বপ্ন টুটবার পরও কিছুক্ষণ ধরে। কিরণের সঙ্গে আলোকোজ্জ্বল নদীর বুকে চকচকে জল থেকে চকচকে মাছ তুলে আনবার স্বপ্ন।

কিন্তু এদিক দিয়ে তুলনা না করলেও তুলনার আর একটা উপাদান চোখে পড়ল তার, মুসলমানপাড়ার মাঠ পার হতে হতে সে দেখতে পেল তাদের সোনালি খড়ে নতুন করে ছাওয়া বাড়িগুলি। অনেক দূর অবধি মাঠের পরে মাঠ বিছানো, লাঙ্গলের কর্ষণে আলগা জমি, ঢিল গুঁড়ো করা—আগাছার ক্ষুদ্রতম অঙ্কুর উপড়ে ফেলে উর্বর করে তোলা। রোদ এসে পড়েছে বাঁকা হয়ে

বোধহয় গত রাতের শিশিরের বিন্দুগুলিতে পড়ে দূরের জমিগুলি রেশমি রঙে চকচক করছে। রেশমের কাপড় যেন বিছানো আছে জমির উপরে! রেশমের মতো নরম ঝুরঝুরে মাটি, রেশমের মতো মসৃণ তল সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে প্রায় উলঙ্গ লোক পৃথিবীর বুকের কাছে বসে মাটির গায়ে হাত বুলিয়ে যেন এই মসৃণতাটুকু অনুভব করছে। ক্ষেতের পাশে তেল চুকচুকে বীর্যবান চেহারার কতগুলি গরু-মোষ। কয়েকটি উলঙ্গ শিশু নরম মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করছে, পড়ে যাচ্ছে, ধুলো উড়াচ্ছে, মাখছে। ওদের মোরগগুলি জমিতে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে, আর দশদিকে চেয়ে উদ্ধত লাল ঝুঁটি খাড়া করে ডেকে উঠছে কর্কশ দম্ভে।

ঠিক ঘুমও নয়, জাগ্রত অবস্থাও নয়, ঘুমের সেই প্রারম্ভে মনে হতে লাগল তার—তাই বলে বাড়িটাকে ভেঙে চাষের জমি করা যায় না, কিম্বা আম-কাঁঠালের গাছগুলি কেটে। রোদ আসবার পথ একটু করে দেয়া যায় কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ি কখনো আবরণহীন হতে পারে না. মাঠের মাঝখানের তোলা চাষার কুঁড়ের মতো।

বোধ করি মনের যে অংশটিতে মুসলমান পাড়ার মাঠগুলির রৌদ্র-উদ্ভাস ভালো লেগে উঠেছিল তার উদ্দেশ্যে ক্ষমাভরা হাসি পেল। আর কিরণ জেলের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয় পুরানো প্রতিষ্ঠা ও অভিনব স্বচ্ছলতার মধ্যে। আমাদের গ্রামটার পাশ দিয়ে নদী ছিল. সেই নদী সরে গেল খানিকটা চর রেখে, সেই বন্ধ্যা চরে এসে বাস করতে শুরু করল চ'রো মুসলমানরা ; দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার নদী সরে গেল চর ফেলে, আবার নতুন চ'রোর দল এল। চ'রোরা চির-দিনের ভূমিহীন, তাই এখানে সস্তার দু'কাঠা জমি পেয়ে খুব করেছে। কিন্তু চ'রোর দল? কে না জানে তাদের পাপের অশেষ কাহিনী। অনুকরণ করার কথা কেউ কোনোদিন ভাবে না, এমন কি প্রথম পর্যায়ের চরের অধিবাসীরা যাদের জমির পূর্বদিকে চর উঠে, তাদের বাসস্থানটুকুকে পুরানো প্রতিপন্ন করে গ্রামের সামিল করে দিয়েছে, তারাও দ্বিতীয় পর্যায়ের চ'রোগুলির সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ স্বীকার করে না। এ তো বয়েস বাড়বার ক্রমিক ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ের চরের চাষাদের বাড়িগুলিতে এখন টিনের ছাদ উঠেছে, তাদের বাড়ির চারিপাশে আম-কাঁঠালের গাছগুলি ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। কয়েকটা বাড়ির মাঝখানে একটা উচ্চ অভিলাষী বটের মাথাও চোখে পড়ে। যদি গাছ-গাছড়া এতই খারাপ, ফাঁকা মাঠ এতই ভালো, নতুন জমি একটু পুরানো হওয়া মাত্র কেন এমন গাছের কথা মনে হয়। এরপর নদী যখন আরও সরে যাবে তৃতীয় পর্যায়ে চর উঠবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের চ'রো লোকগুলি হবে গৃহস্থ, পুরানো প্রতিষ্ঠায় তারা অবাক হয়ে দেখবে অর্বাচীন আগন্তুকদের।

একদিন একটি ঘরের ছাদে উঠে কাস্তে দিয়ে লতা ঘাস কেটে নামতে-নামতে শিকদার একটা ছোট ডুমুর গাছ আবিষ্কার করলে ছাদের আলসেতে। গাছটা

কেটে ফেলতে গিয়ে ফলন্ত ডুমুরগুলি দেখে শিকদার হৈমকে ডাকল।

হৈম এসে বলল, 'বা, গাছটা কেটে কি হবে, থাক না বরং বেশ শূন্য-উদ্যান হয়ে আছে।' সে বললে, 'ঘরটা যে নষ্ট হচ্ছে তা দেখিস না, সব তাতে তোর মশকারা।'

হৈম মুখে-চোখে গম্ভীরতা আনবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'এখন দেখছি বটে।'

শিকদার অতি সন্তর্পণে গাছটা কাটল, শিকড়ের চারিদিকের ইঁটগুলি খসে যাবে এই ভয় হয়েছিল, কিন্তু ভালোও লাগে হৈম-র এমন দু একটা পরিহাস।

কিন্তু পরিহাস-রসিকা নয় হৈম। তার হাসির কথা মনে হলে তার রাগের কথাও মনে হয়, শুধু রাগই নয়, সংকীর্ণতা ও কলহপরায়ণতার কথাও। এক-দিন, সেদিন জ্বর হয়েছিল শিকদারের, জ্বরের ঘোরে সে শুনেছিল হৈম ঝগড়া করছে কার সঙ্গে। একটু পরে বুঝতে পেরেছিল মায়ের সঙ্গেই হচ্ছে। ভাষার কদর্যতা সেদিন এতটা বেড়ে উঠেছিল যে শিকদার ছুটে গিয়েছিল হৈমকে শাসন করতে।

হৈমর মাথা যখন সুস্থির থাকে তখন তার মনটা শুধু হাসিতে প্রকাশ পায় না, মাঝে-মাঝে সুন্দর গল্পও করে সে, সে সব গল্প রাজারাণীর রূপকথা হয়, আদিরসাত্মক গ্রাম্য উপকথাও হয়, কখনো বা তার চোখে-পড়া কোনো ঘটনা।

একদিন হৈম বললে, 'অনেকদিন আগে ওরা এসেছিল, সকলের কথা মনে নেই; ওদের মধ্যে বছর বাইশ বছরের একটি ছেলে আর তার সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েটির কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটির, আর তেমনি সুন্দর ছেলেটি। কিন্তু হলই বা বড়লোক, অত নির্লজ্জ হতে হবে? মেয়েটি যে ছেলেটির বউ এ বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু হোক বউ কোমর জড়িয়ে ধরে হেঁটে না বেড়ালে বুঝি চলে না?'

'বোধহয় মেয়েটির ভয় করছিল।'

'কেন,' বললে হৈম, 'আমরা দুটি মেয়েমানুষ যে বাড়িতে রাতের পর রাত কাটাচ্ছি সে বাড়িতে দিনের বেলা ভয় কিসের?'

'তারপর কি হল?'

'তারপর আর কি? হাসাহাসি, "ওরে বাপরে" বলে আচমকা চমকে ওঠা, 'যাও' বলে রাগ করা। অনেকগুলি ফটো তুললে যাবার সময়ে।'

'যাবার সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলে মেয়েটি। ওর স্বামী নাকি ছবি আঁকেন, অনেক পয়সাও পান এঁকে। বললে ও ছেলেটিও নাকি শিকদার। এ বাড়িরই কোনো একটা ছেলে।'

'এ বাড়ির ছেলে, বলিস কি, তাহলে তো আমাদের গর্বের কথা।'

'গর্বের না ছাই, কোলকাতায় থাকে, যেয়ো একদিন দেখা করতে, দেখা করে কি রকম।'

'তোর মনটা খুব ছোট।'

ঝঙ্কার দিয়ে হৈম বললে, 'তুইতো বড় মন নিয়ে খুব বুঝলি।'

কিন্তু শিকদারের সাধ হয়েছিল সেই ছেলেটির কথা শুনতে, হৈমকে ঠাণ্ডা করতে বলল. 'তোর কথাই ঠিক, দেখা করবে কেন ?'

কথাটা হৈমকে ঠাণ্ডা করবার জন্য শুরু করলেও সেই শিকদার ও এই শিকদারের পার্থক্যটাও নজরে পড়ল।

হৈম নিশ্বাস ফেলে বলল. 'এ বাড়িতে থাকলে কিছু হয় না।'

এরকম ধরনের কথা হৈম অনেকদিনই বলে। শিকদার তখন তাকে ঠাট্টা করে বলে, 'মেয়েদের মনই ঐ রকম নিজের বাড়িতে বসে না, দিন এলে দেখব পরের বাড়িতে গিয়ে কত সুখী হস তুই।' কিন্তু এমন উদাহরণের পর এমন করে নিশ্বাস ফেলে বলে না। প্রায় সপ্তাহকাল বিমর্ষ লাগল শিকদারের, পুকুর-পাড়ের কলার কাঁদিটা চুরি হয়ে গেল তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদিন হৈম ঝগড়ার ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে দেখল, শিকদার মাদুর পেতে বসে কি করছে। খরখর করে হৈম বললে, 'লাটসাহেবের মতো ঘরে বসে আছ, ওদিকে জেলেরা নেমে পুকুরের মাছ শেষ করল।'

শিকদার সামনের বইখানা নেড়ে চেড়ে বলল, 'মাছ কোথায় পুকুরে, কাদা ঘাঁটতে চায় ঘাঁটুক।' হৈমর মন তখন কড়া সুরে বাঁধা ছিল, সে বললে, 'তাহলেই হয়েছে, বাইশ বছরের খোকা হয়ে পড়তে বসলেই হয়েছে।' পুরুষকে উত্তেজিত করা কঠিন নয়। শেষ পর্যন্ত শিকদার উঠে গিয়ে জেলের সঙ্গে ঝগড়াও করেছিল। অশ্রাব্য দু-একটা কথা তাকে শুনতেও হয়েছিল, বলতেও হয়েছিল।

শিকদারের শিরায় তখন জমিদারি ফিরে এসেছে, বললে, 'দেখাচ্ছি মাছ ধরা।' সকালের রোদ মাথার উপর দিয়ে যখন হেলে পড়েছে তখনও দেখা গেল কাদা জলে একবুক দাঁড়িয়ে বাঁশের খোঁটা আর কঞ্চি, বাবলার ডাল আর বেলের কাঁটা সারা পুকুরে পুঁতে দিচ্ছে।

যখন মাথায় জল ঢেলে সে খেতে বসল তখনই হৈম লক্ষ্য করেছিল, তার চোখ দুটি লাল হয়ে আছে। হু-হু করে জ্বর এল খেয়ে উঠতে না উঠতে। লেপ কাঁথা গোটা কয়েক চাপা দিয়ে চেপে ধরে হৈম যখন বললে. 'আমার জন্যই জ্বরটা হল।' শিকদার কাঁপুনির মাঝে-মাঝে তৃপ্তস্বরে বললে, 'ঘরে বাইরে দুদিকে নজর রাখা ভালো। নতুবা সবই লুটে-পুটে নেবে।'

মানুষের মনের কোথায় কোন সম্পদ থাকে সেটা হারিয়ে না গেলে বোঝা যায় না কি ছিল সেটা, কতটুকু সার্থকতা ছিল তার। শিকদার একদিন হাহাকার করে উঠল, এক ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে অনভিজ্ঞতার বলটুকু হারিয়ে ফেলে নেমে আসতে হল বয়স্ক মানুষের পর্যায়ে। পাঁচ-ছদিন সে মুখ তুলে চাইল না, কথা বললে না হৈমর সঙ্গে।

একদিন দেখা হল ঠাকুরঘরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে, প্রদীপ দিয়ে হৈম গড় হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রণাম করছে। শিকদারের মনে হল দোষ স্খালনের জন্য কিছু একটা বলা উচিত। হৈম প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতে শিকদার দেখল তার চোখে জল, তারও কান্না এল। কি বলা যায়, কি বলা উচিত কে জানে। শুধু নামটাই মুখ দিয়ে বেরল।

দু-চোখে জ্বালাময় অশ্রু নিয়ে হৈম শিকদারের ঘরে গেল। শিকদারের মনে হচ্ছিল সে হয়তো সবটুকু দায়ী নয়, কিন্তু তার মতো পাপও বোধহয় কেউ করেনি, দায়িত্বের সামান্য অংশ তার হলেও। কিন্তু হৈমও জানত না, শিকদারও না, প্রথম অভিজ্ঞতার অভিনবত্বেই তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, অনুশোচনায় নয়। তেমনি তারা জানত না গতিহীন ক্ষয়গ্রস্ত জীবনে যেখানে উদ্ভিন্ন করে কর্মের পথে বৈরাগী করে দেবার সূর্যালোক এসে পড়ে না, সেখানে সাথীত্ব রিরংসার নামান্তর, মুখ তুলে দেখবার মতো প্রাণসূর্যের উদয় নেই যাদের দিগন্তে, পঙ্কিল হয়ে উঠবেই তাদের জীবন।

কিন্তু প্রতিঘাত করবার মতো কিছু একটা শিকদারের মনের অন্য কোথাও ছিল। বুড়ি বললে একদিন, 'দাদু. তোমার বাড়ি. তোমার ঘর, তুমি বাড়িতে থাক না এতটুকু; কি হয়েছে তোমার?'

উত্তর না দিয়ে শিকদার কালিপড়া লণ্ঠনটা হাতে করে সেই টিনের ঘরটার দিকে চলে গেল বাহিরের আঙিনায়। বাড়ির ভেতরে আর সে থাকে না। লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে মায়ের ফটোটা চোখে পড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠল শিকদার। ফটোটার কাছে মাথা রেখে চোখের জল শেষ করে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হলে বলল সে, 'কি হবে আমার মা? কি হল আমার এ গ্রামে এসে! সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হবার আগে যেন প্রাণটা আমার বেরিয়ে যায়।'

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে পৈতাতে আঙুল জড়িয়ে ঘুমে ভেঙে না-পড়া পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করল সে।

একদিন রাত্রিতে হৈম এসে দাঁড়াল তার পাশে, কি রোগা হয়ে গেছে হৈম এ কয়েকদিনে; মুখরা, কুৎসিতভাষিণী, কোপনস্বভাবা নয় সে আর। চলবার ভঙ্গিতেও দুঃখের একটা দাগ পড়েছে যেন।

হৈম বললে, 'আজ রাত্রিতেও খেলে না। কদিন থেকেই দেখছি খাওয়া কমে গেছে। দোষ তো তোমার একার নয়। (এখানটায় হু হু করে জল নেমে এল দু-চোখে, ঠোঁট দুটিতে আঁচল দিয়ে চেপে ধরল হৈম।) তুমি চলে যাও অন্য কোথাও। মা'র একটা ব্যবস্থা হলে যে দিকে দুচোখ বায় চলে যাব। তার-পরে তুমি ফিরে এস। যাব, সত্যি আমি যাব।'

শিকদারের মন বিমুখ হয়েছিল, হৈম ঘরে ঢুকতে নিজেকে শাসন করবার জন্য হৈমর প্রতি রূঢ় হয়ে উঠল সে, কিন্তু হৈম চলে গেলে ভাবল সে—আহা তার মতোই দুঃখ পাচ্ছে বেচারা, সে তো তবু কুৎসিত ভাষায় একদিন গালি

দিয়ে উঠেছিল, হেম শুধু মাথা নিচু করেই চলে।

একদিন শিকদার ভোরের দিকে দরজা দিয়ে এসে পড়া আলোর দিকে চেয়ে ভাবল, পালাবে সে, শহরে যাবে।

কিন্তু গ্রাম থেকে পালানো আর নিজের মন থেকে পালানো এক কথা নয়।

শহরের ছোট একটা হোটেলে খেয়ে, হোটেলের চাল-ডাল রাখবার ঘরে ঘুমিয়ে দু-চারদিন কাটল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে সে ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে। মোটর গাড়ির ড্রাইভাররা বড়-বড় বাসগুলি কি অদ্ভুত কায়দায় বা নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গেঞ্জির কলে ঘূর্ণ্যমান গতির মাঝখানে বলিষ্ঠ দু হাত নিয়ে কি সুন্দর কাজ করে লোকগুলি। তাদের হাসি গল্পে, চীৎকার করে কথা বলায় কি থাকে, ওদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে। ইতিমধ্যে একজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপও হয়েছে তার। এমন বলিষ্ঠ চেহারা এমন দিলখোলা কথাবার্তা! টাকা নেই—নাই থাকল, এ রকম একটা ভাব।

গ্রামে আসবার আগের দিন পর্যন্ত শিকদার গুরুজনদের মুখে শুনেছে—লেখাপড়া শেখ নতুবা ঘাস কাটতে হবে। এই অবস্থায় তার মনে হল লেখাপড়ায় অবহেলা করেই তার এ দুর্গতি। পরিচিত এক দোকানদারকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এখানে যারা কলেজে স্কুলে পড়ে সবাইতো বড়লোকের ছেলে নয়, শহরেরও নয়। তাদের লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা হয়।' দোকানদার সব খোঁজ রাখে না, তবু বললে, 'হয়ে যায় কোনো রকমে।'

কোর্ট কাছারীর কাছে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন কাছারীর এক বুড়ো কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পেয়াদার কাজ করে সে, কিন্তু সেই একমাত্র রাজকর্মচারী যে মাঝে-মাঝে গ্রামে যায়। গত ফাল্গুনে সেসের মোকদ্দমার নোটিশ দিতে গিয়েছিল শিকদার-বাড়িতে। শিকদার তাকে আদর যত্ন করেছিল। গোপনে নিজেই পুকুরের কাদা খুঁজে একটা রোগা কালবাউস ধরেছিল। অতিথির জন্য।

পেয়াদা শিকদারকে দেখতে পেয়ে একটু আনন্দিত স্বরেই তাকে ডাকল। গরীব পেয়াদা, পেয়াদারা গরীবই হয়, চা খাওয়ালে পথের ধারে একটি দোকানে। যথোচিত সম্বর্ধনা করে নিয়ে গেল সে তাদের আফিস ঘরে, 'চলেন বাবু, আমাদের বাবুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। জমিদারির কাজে ওনাদের সাথে আলাপ থাকলে অনেক সুবিধা হবে।'

শিকদার ভেবেছিল পেয়াদাকে একবার একথা ও কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করে নেবে গরীব ছাত্রদের কোনো ব্যবস্থা হয় কিনা, কিন্তু পেয়াদাকে এর পরে আর কিছু বলা যায় না। আফিসের বাবুরা তার মলিন বস্ত্র, মলিন চেহারা দেখে তার সঙ্গে আলাপ করেনি, কিন্তু সেটা বোধ হল না, বরং এতগুলি ভদ্রলোকের মাঝখানে বসে থাকতে-থাকতে সে একটা তৃপ্তিই বোধ করল, আভিজাত্যের তৃপ্তি।

হোটেলের ঘরে শুয়ে সেদিন রাত্রিতে হৈমর কথা মনে হল। হৈম বলেছিল, চলে যাবে; কোথায় যাবে সে, পৃথিবীতে কেই বা আছে। বোধহয় আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেছে মনে।

সারারাত ছটফট করে শিকদার পরের দিন সকালে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। কিন্তু এমনি মানুষের মন, পথের ধারের এক দোকান থেকে ছেঁড়া-খোঁড়া একখানা এ্যাল্‌জেব্রা বই কিনলে সে।

মানুষের মন বুঝতে না পেরে খানিকটা বিস্ময়ের মধ্যে অনুভূতিকে জাগ্রত করে রাখবার চেষ্টা করি মাত্র। এমন হতে পারে শিকদারের গ্রামে ফিরে যাবার আকর্ষণের মূলে যেমন ছিল আভিজাত্যবোধ তেমনি হয়তো কিছু একটা ছিল বেছে-বেছে এ্যালজেব্রা বই কিনবার মূলেও। হয়তো স্কুলে যখন সে পড়ত তখন এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা কঠিন বোধ হত তার। আজ বোধহয় অবচেতনায় অনুভব করেছে—কঠিনটাকে জয় করতে পারলে সহজ পথটুকু অক্লেশে সবার উপর হয়ে যাবে। শিশুর মতো এত সরল এদের অনুভব!

সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে পা দিয়ে দেখলে হৈম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

শিকদার বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে?'

মাথা নিচু করে কুণ্ঠিত স্বরে হৈম বললে, 'হঠাৎ চলে গেলে, আট-দশদিন খবর নেই।'

শিকদার নিজের ঘরে বসে ভাবল হৈমর মনে ঘৃণাটা আর নেই বোধহয়। শোকতাপ ভোলা যায়, এ তো সামান্য ব্যাপার। বিয়ে দিতে হবে তার। কিন্তু কথাগুলি নিজের মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পেছনের টানে যেন পা আটকে গেল,—এর চাইতে বড় প্রবঞ্চনা আর কি আছে, হা ভগবান, হা ভগবান।

পরের দিন সকালে হৈম স্নান করে ঘরে এসে বলল, 'এখন বেরোনো হবে না। তিন টাকা ছ-আনা খাজনা আদায় করবার জন্য এই রোদে তিন মাইল হাঁটতে হবে না।'

'টাকার দরকার।'

'একটা চাকর ঠিক করেছি তাকে বলে দাও।'

হঠাৎ হৈমর স্বর বদলে গেল, রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'এখনও মরিনি কিন্তু ঠিক একদিন গলায় দাঁড় দেব, তোমাকে যেতেই হবে এখান থেকে বেরিয়ে।'

বিকালের দিকে হৈম আবার এল চোখের জল মুছতে-মুছতে।

'মা কি বলছে, শুনেছ? বলছে—অনেকদিন পরে তুমি বাড়ি এলে, আমার নাকি চুল বাঁধা দরকার।' অন্যমনস্ক ছিল বলেই হয়তো তাৎপর্যটা প্রথম ধরতে পারেনি শিকদার। একটু পরে দুঃসহ ক্রোধে জ্বলে গেল তার মন। কি একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে অসীম লজ্জায় মাথা নীচু করলে সে: মনের একান্তে এরকম একটা আশা তারও হয়েছিল।

দুজনে দুজনকে এড়িয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ করে, তবু এতবড় বাড়িটা কেন,

গোটা গ্রামখানাতেও আর কে আছে? শুধু কথা বলবার প্রয়োজনে দু'জন দু'জনকে খুঁজে বার করে। কে খাজনা দিল না এর আলোচনার জন্য যেমন, পুরানো একখানা সাপ্তাহিক কাগজ হাতে এলেও তেমনি, কিম্বা শুধু মাত্র একটু খাওয়া-ও-ঘুমানোর বাইরে কথা বলতে গেলে।

একদিন জ্বরের ঘোরে শিকদার অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন বললে বোধহয় ঠিক বলা হয় না। জ্বরের মোহাবস্থায় ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্মৃতিজাত মূক কল্পনা মিশে গিয়ে যে অবস্থাটা হয় তেমনি। দেয়ালের দিনপঞ্জীর গায়ে কালিয়দমনের ছবি ছিল। সহস্রশীর্ষ নাগরাজের মাথায় কিশোর কৃষ্ণ, চারিদিকে প্রার্থনারত নাগকন্যা। কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জ্বরের সংমোহটা এসেছিল। অর্ধনির্মিলিত চোখে শিকদার যেন দেখতে পেল ওদের মধ্যে সুন্দরতম মুখখানি যার সেই নাগকন্যা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে স্পর্শের গণ্ডির মধ্যে। নাগকন্যার অধমাঙ্গের কুণ্ডলীকৃত ঘৃণা যেন তাকে পরম লালসায় বেষ্টন করছে। ঘৃণায়, ভয়ে, পলায়নের বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠায় মোহটা টুটে গেল। তবু খানিকক্ষণ ধরে মনে হতে লাগল নাগকন্যার মুখখানায় যেন বেদনার অশ্রু ছিল, যেন সে মুখটা হৈমর মতো। মনে হল শিকদারের যেন নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে নাগকন্যাকে সে অপরিসীম আঘাত করেছে।

দেয়ালের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হল তার, ভয়ে ও ঘৃণায় হৈমকে সে কষ্ট দিয়ে কি করবে, হৈমর চোখের জল দেখে হাত বাড়িয়ে তার মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরতে হয়, কাছে এগিয়ে আসে হৈম। হয়তো বা নাগকন্যার প্রতি তার সরীসৃপ অবয়বের জন্য যে স্বাভাবিক ঘৃণাটা আছে সেটা কেটে গেলে তার স্পর্শও তেমনি সুখদ হবে। কিন্তু পরে হয়তো বিষের যাতনায় ছটফট করতে হয়। কেন হৈম মেয়ে হল, এই অভিযোগ জানিয়ে পরম শূন্যে সে পাশ ফিরল।

এ ঘটনাটা বিচিত্র হলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়তো সম্ভব, কিন্তু বিচিত্র বোধহয়, মানুষের সমগ্র জীবনের রূপ এমন একটি প্রতীকে ফুটতে পারে স্বপ্নের মাঝখানে। নিজের জীবনের কদর্যতা এখন শিকদার দেখতে পায়। প্রথম দিকের অভিনবত্বজাত মোহ তার আর নেই, কিন্তু নির্মম হয়ে দূরে সরে যেতে পারে না, দূরে সরে যাবার কথা মনে হলেই মনে হয় নির্মমতার চূড়ান্ত হবে। হৈমর চোখে জল যেমন, তেমনি কারো চোখের জলে মনের একটা কোণকে দুর্বল করে দেয়। পুরাতনের জীর্ণতার বেষ্টনের ঘৃণা ও আকর্ষণ যুগপৎ অনুভবে আসে।

চেষ্টা করেছিল শিকদার, মনের সামনে ছিল ছোটবেলায় শোনা কথা—লেখা পড়া করে ভদ্রলোক হতে হয়। এছাড়া অন্য পথের কথা কেউ তাকে বলেনি। পুরস্কার দেবার ভঙ্গিতে হৈম পর্যন্ত একদিন বলল, 'আরও বেশি করে পড়,

অনেক বয়েস হয়েছে, একটু বেশি না খাটলে কি করে হবে। পড়া শেষ হলে আমি এসে গল্প করব।'

কিন্তু হৈম না জানলেও শিকদার বেশ জানত, একখানা ছেঁড়া এ্যালজেব্রা কেন, তার সঙ্গে ট্রানশ্লেসন বইখানা জুড়ে দিলেও ম্যাট্রিক পাশ হয় না। শুধু অর্থের অভাবই নয়, বলে দেবার লোকের অভাবই নয়, তার চাইতেও বড় একটি অভাব ছিল শিকদারেরও জানার বাইরে। ছাত্রের মন তার ছিল না। সাধারণ ছেলেদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকলে হয়তো সে লেখাপড়া করত, চাকরী করত ; অসুবিধাগুলিকে জয় করা তার ভাগ্যলিপি নয়।

কিছুদিন পর দেখা গেল হৈমও আর পড়তে বলে না তাকে, সেও বোধহয় বুঝতে পেরেছে অসম্ভাব্যতা।

শুধু একদিন একটা বিদ্রোহের ভাব মনে এসেছিল : পুকুরপাড়ের খানিকটা জায়গা সাফ করে কয়েকটা বেগুন গাছের চারা লাগিয়েছিল শিকদার। গাছ গুলির গোড়া থেকে ঘাস নিড়িয়ে দিচ্ছিল শিকদার আর হৈম সেগুলি জড়ো করে-করে বাইরে ফেলে দিচ্ছিল। শিকদার বললে, 'মুসলমান পাড়ার মাঠগুলি দেখেছ হৈম, কেমন রোদ আর কেমন তেজ মাটির।'

'আমাদের এটাও তেমনি হবে। একমাসের মাথায় ফল না ধরে—'

শিকদারের মনে শুধু রৌদ্রদৃপ্ত ভূমির কথাই ছিল না, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট-ভাবে ওদের দারিদ্র্য উদ্ভিন্ন জীবনের যে দৃঢ়তা ও দীপ্তি অনুভব করেছিল, দেখেছিল, সেটাও ফুটে উঠেছিল।

শিকদার বললে, 'আমরা যদি ওদের মতো হতে পারতাম, ভালো ছিল। সুখী হতাম। কুঁড়ে ঘর তুলতাম, দেহে স্বাস্থ্য থাকত। আর বোধহয় তোমাকে, তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী হতে পারতাম।

শিকদারের স্বরের উত্তাপে হৈমর মুখ পাংশু হয়ে উঠল, নিষেধ ও কান্নায় মেশানো একটা অস্ফুট শব্দ করে সে প্রায় ছুটে পালাল শিকদারের কাছ থেকে এবং বোধহয় তার রচনা করা স্বপ্নের কাছ থেকে।

কিন্তু বিদ্রোহটা সকলে করতে পারে না, হৈমর পক্ষে শিকদারের সহায়তা পেলে তবু হয়তো সম্ভব হত, শিকদার নিজেই পারত না। নতুন মাটিতে আবরণ-হীন আকাশের তলে শীর্ণদেহে সামান্য কিছু নিবিড় প্রাণরস সে সঞ্চয় করতে পারে না। বুড়ি একদিন বলেছিল, 'আ, ছি, হৈম, তোরা দুজনেই শিকদার, সূয্যিঠাকুর দেখবে যে রে ; কখন ভোর হয়েছে।' ঠিক তখনই হৈম ও শিকদার সাধনার ফলে রাত্রির দুর্বার আহ্বানকে বিমুখ করতে পেরেছে। ক্রুদ্ধ শিকদার বেত হাতে করে বুড়িকে মারতে গিয়েছিল, হৈম কাছাকাছি ছিল না তাই কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হয়নি। কিন্তু শিকদারের মনের মধ্যেও বোধহয় অমনি একটা বুড়ি ছিল, ভগ্নস্তূপের একখানা থান ইঁট দু-টুকরো হয়ে গেলে কুৎসিত ভাষায় যে গালাগালি করতে পারে, সূয্যি ঠাকুরের চোখে পড়ে যাবার

ভয়ই যার পাপকে মনের গোপনে পাঠিয়ে লোলুপ করে রাখে।

তথাপি এই মানুষের সন্তানগুলিরও জীর্ণতার গুটি কেটে বাইরে আসবার সুযোগ ঘটে যায়। ঘটিয়ে দেয় যেন কেউ। ভূকম্পনের মতো কোনো নির্দয় আঘাত। ভূকম্পনে শুধু ধ্বংসস্তূপই ভেঙে পড়ে না, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও গুঁড়িয়ে যায়, কিন্তু ভূকম্পন যার সৃষ্টি সেই শুধু বলতে পারে ধ্বংসের তুলনায় নতুন সৃষ্টি বড় হয়ে উঠবে কিনা ভবিষ্যতে।

ভূকম্পন এসেছিল : কিরণ জেলে অসময়ে গ্রামে এসে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে কেন কেউ জানত না। একদিন রাত্রিতে শিকদারকে ঘুম থেকে তুলে বলল, 'চলেন, কর্তা আজ্ঞা, নৌকা ছাড়ব।'

মুসলমানরা আক্রমণ করেছে এ জেলার সব হিন্দুপল্লী। অসংখ্য মৃত্যু ঘটছে, মৃত্যুর চাইতেও বীভৎস পাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিরণের পেছনে এক-দল ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, পুরুষ, শিশু, ভীত, কান্নাকাতর। দিগন্ত আগুনে লাল হয়ে উঠেছে। সমস্ত মাটিটা যেন আঘাতে-আঘাতে টলছে, যন্ত্রচালিতের মতো ওরা হরিবোল বলছে।

ভূকম্পনের পর কি হয় সেটা অন্য গল্প, তবু শুনুন।

প্রায় একমাস পরে একদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর শিকদার দেখল উপুড় হয়ে নদীর পাড়ে শুকনো বালিতে শুয়ে আছে সে। সনাতন জেলের এক বছরের ছেলেটা তার পিঠে বসে চুল ধরে টানছে। তার মনে পড়ল এটা একটা জেলের পল্লী, পেছনে সারি-সারি কুঁড়ে চোখে পড়ছে তাদের।

ভূকম্পনের মতো দৃশ্যপট মনে পড়ল তার, পালিয়ে এসেও রেহাই পায়নি। জেলেপাড়ার সুস্থ ও সমর্থ বলতে ছিল যারা কেউ নেই তারা আর। অবশিষ্ট গুটি কয়েক শিশু আর চার-পাঁচটি মেয়েছেলেকে নিয়ে সে এসে আশ্রয় পেয়েছে এই পল্লীতে কাল রাত্রিতে। অনেক মৃত্যুর মধ্যে কিরণের মৃত্যুটা মনে পড়ে, পাঁচ ছ-জন মিলে যখন তাকে ঘিরে ফেলল তখন আহত হয়ে উদ্যত খড়্গের আঘাত এড়ানোর জন্য ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটাই নাড়তে পারছিল শুধু।

হৈমর কি হল কে জানে। অনেক দূর অবধি দলের সঙ্গে ছুটে এসেছিল সে। শেষবার আক্রান্ত হয়ে দলটা যখন ছুটে পালায় তখন হৈম পড়ে গিয়ে আহত হয়ে ডেকেছিল বারবার—'ওগো দাঁড়াও।'

(শিশুটি আবার চুল ধরে টানাটানি করছে।) আহা কি দারুণ মৃত্যু এর মায়ের যদি হৈম থাকত বাঁচত মা-মরা ছেলেটা, হয়তো বাঁচবে নিজে-নিজেই। খোলা নদীর বুকে ও পরিষ্কার বালিতে রোদ চকচক করছে—বাঁচবে এটা।

কাল রাত্রির স্বপ্নটার কথাও মনে হল শিকদারের—ঘরের দাওয়ায় বসে জালে গাব লাগাচ্ছে যেন সে নিজে আর হৈম এসে পরিহাসভরে ডাকছে তাকে জেলের পো বলে, কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে কপালে সিঁদুর আঁকতে-আঁকতে সূর্যকে সাক্ষী রেখে।

চোখ থেকে হাতে, হাত থেকে বালিতে পড়ে চোখের জল শুকিয়ে যেতে লাগল দাগ রেখে-রেখে।

রাজনীতি সমাজবিজ্ঞান ও আবহাওয়া নিয়ে খুব খানিকটা আলোচনা মিনিট দু-এক আগে শেষ হয়েছে। শব্দতরঙ্গ যদি দৃশ্যমান হত, দেখা যেত প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণ্যমান কতগুলি স্রোত লোকগুলিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। ঠিক তখনই, যখন আদৌ উচিত নয়, মুখোটি বললে, 'মজুন্দার, একটি কায়দাখিটক গল্প ছাড়।'

'আমার আবার গল্প তার আবার কলাকৌশল', বলে মজুন্দার বললে, 'সে-বার তখনও আমি কোম্পানির কাজ করে বেড়াই সাইকেল তখন আমার বাহন, আর—'

'তোমার ব্যক্তিগত ডিটেইলস্ বাদ দাও। তুমি কোন কোম্পানির কাজ করতে তাও আমরা জানতে চাইনে। তোমার চাকরি সম্বন্ধে যা বলবে স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবে অসম্ভব হলেও আমরা মেনে নেব।'

'সেটা কি কোনো যুক্তির কথা।'

গল্পটা মাঠে মার খায় দেখে ভট্টাচার্য্য বলল, 'তুমি স্রেফ গাঁজা বলে গেলেও আমাদের আপত্তি নেই। মোদ্দা গল্প হওয়া চাই।'

'হ্যাঁ। যদি গণ্ডগ্রামে সাইকেল করে গিয়ে তুমি এজলাশ খুলে বস এবং নরহত্যার বিচার করতে শুরু কর তাতেও আপত্তি নেই। শুধু নিজের কথা বলবে না।'

মজুন্দার বললে : (সে যে গল্পের গোড়াপত্তনের লাইন পঞ্চাশ কেটে বাদ দিল বাধ্য হয়ে, তা বোঝা গেল) বড় সাহেব তার করে খবর দিল—এগোও, রাম অফিস এবং শ্যাম অফিস দুটিই পাকিস্তানের বর্ডারে। তাদের স্থানীয় কর্তা টাকাপয়সা কাগজপত্তর সমেত পাকিস্তানে চলে যাব যাচ্ছি করছে,' ব্যবস্থা কর।

টাকা পয়সা নিতে পারে কাগজপত্তর নেবে কেন? এমন নয় কাগজপত্তর ফেলে গেলে তার দুর্নীতির নজির হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করে ফায়দা হবে, পাকিস্তান গেলে উদ্ধার করা যাবে না।

মজুন্দার ফোন মারফত এ-যুক্তি দিয়ে প্রত্যুত্তরে সাহেবের গালি শুনল।

অগত্যা মজুন্দার রওনা হল।

দাঙ্গা ব্যাপারটির সম্বন্ধে মজুন্দারের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, যেমন ছিল না বাঙলাদেশে বাস করেও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। যখন সে শুনল দাঙ্গাবিধ্বস্ত

নয়, দাঙ্গাউদ্দীপ্ত গ্রামের উপর দিয়েই তাকে যেতে হবে তখন তার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত কটু হয়ে উঠল।

মাস চৈত্র। ঘরে বসে চৈতালি যারা করে তাদের মানসিক প্রবণতা ঐ কথাটা থেকেই বোঝা যায়। এমন একটা মাসকে 'লি' প্রত্যয়ান্ত করে যারা মধুরগন্ধি করার চেষ্টা করে তারা কি-কি নেশা করে না এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায়।

চৈত্রের রোদে মাটি ফেটে গেছে, দিগ্‌মণ্ডল পুড়ে তামাটে, সবুজের অভাবে চোখ ক্লান্ত, রৌদ্র-উদ্বেল বাতাসের তরঙ্গ চোখে পড়ছে বলে মনে হয়, নিশ্বাস গ্রহণ করলে অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। ট্রেন চলছে, থামছে খুশি মতো, যাত্রীরা খুশি মতো থামাচ্ছে। সেকেন্ড ক্লাস ছোট কামরাটায় অজস্র যাত্রী। মনে পড়ছে মাথার উপরের বাঙ্কের এক দিকের কব্জা যাত্রীর ভারে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে সহযাত্রীদের বলল মজুমদার—তোমরা তো পাকিস্তানের থেকে পালিয়ে এসেছিলে, তবে আবার পাকিস্তানেই যাচ্ছ কেন! প্রথমে সকলেই চুপ করে রইল, তারপর সমস্বরে উত্তর দিল—একবর্ণও বোঝা গেল না। মজুমদারের একটা কথা মনে হল : এই যাদের রূপ, তাদের নাকি কেউ হরণ করে! আদি-রসকে যদি দেশছাড়া করতে হয় এদের হাতে বরণডালা দিয়ে পাঠিয়ে দিও। কি দাঁত, আর কি চুল!

বিরুবাবু ইতিমধ্যে একখানা খবরের কাগজ কিনেছিল। গাড়িটা একটু থামতেই সে দিয়ে গেল। বলল, 'আপনার তো অসুবিধা হচ্ছে স্যার।'

'তা একটু হচ্ছে।'

'আর দুই স্টেশন।'

অর্ডারলি জগতে বিরুবাবু সিংহ। তাকে অর্ডারলি-শার্দুল বললে অত্যুক্তি হয় না। মজুমদার কিছুদিন আগে বিরুবাবুকে বলেছিল, 'বিরু তোমার পোশাকটা পর না কেন? দেখো তো, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সার্কেল অফিসার সকলেরই অর্ডারলি কেমন ইউনিফর্ম পরে।'

'ওরা, স্যার, পশ্চিমা।'

বিরুবাবু একটু ভেবে বলেছিল, 'শুধু এই শহরে স্যার। শহরের বাইরে যেখানে ইউনিফর্ম পরতে বলবেন পরব। শহরে আমার আত্মীয়স্বজন আছেন অনেকে...' এই হচ্ছে বিরুবাবুর জীবনের ফিলোজফি।

মুখোটি বলল, 'তোমার অর্ডারলিকে আমার কাছে ট্রান্সফার করে দাও না, দেখি কি রকম সে পোশাক না পরে। হ্যাঁ।'

ভট্টাচার্য আবার বললে, 'থামো মুখোটি, নিজের জীবনদর্শন লোকের সামনে কাটতে বোস না।'

বিরুবাবু দু-স্টেশন বাদে তাড়াতাড়ি সাইকেল দুটি গাড়ি থেকে নামাল,

ছোট বিছানা দুটি নামাল। তারপরে আমরা রওনা হলাম।

ভট্টাচার্যের ধমক কাজ করেছে। মজুমদার গল্পকে কয়েক ধাপ একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ভট্টাচার্য তাকে থামিয়ে বলল, 'সেদিন খবরের কাগজ কিনেছিলে, বললে না? খবরের কাগজে খবর কি ছিল?'

'খবরের কাগজ তখনও খোলা হয়নি।'

'সেটা খোল।'

বিরুবাবু মজুমদারকে স্টেশনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে খবর আনতে গেল গ্রামে। সেই সুযোগে মজুমদার খবরের কাগজ খুলল। এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি অক্ষরে লেখা ব্যাপার সব। গাদিপোতা গ্রাম লুঠ। পাকিস্তান থেকে লোক এসে গাদিপোতা লুঠ করে গেছে। একজন নিহত, অন্তত দশজন আহত। একটি স্ত্রীলোককে নাকি নিয়ে গেছে তারা। মজুমদার রওনা হবার সময়ে এতসব জানবার সুযোগ পায়নি। তাহলে সে কি করত, ছুটি নিয়ে পালাত কিনা বলা যায় না। এখন মজুমদারকে যেতে হবে সেই গাদিপোতায় এবং গাদিপোতা ডিঙিয়ে সানকিডোবায়।

মজুমদার নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। দূরে একটা গাছতলায় গাভী তার বাছুরের গা চাটছে, একটি কাক ঠোঁট দিয়ে তার পাখা পরিষ্কার করছে। স্টেশনের একটি বাবু পান চিবোতে চিবোতে এক ঢাউস খাতায় যোগ অঙ্ক করছে। অথচ কিছু দূরে, সামান্য কিছু দূরে এরকম ব্যাপার ঘটছে, যার জন্য কোলকাতার খবরের কাগজে দেড় ইঞ্চি লম্বা হরফে খবর ছাপা হয়েছে। খবরের কাগজে উদ্ধৃত ঘটনার মধ্যে অবতরণ করতে কি রকম লাগে তা মজুমদার জানত না। খবরের কাগজ হাতে তার গা শিরশির করে উঠল।

বিরুবাবু এসে বলল, 'থানায় না গেলে খবর পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ আগে সদরের হাকিম-সাহেবেরা, পুলিশ-সাহেবেরা জিপে করে গেছেন, এই পথ দিয়ে। চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে মাটির রাস্তায়।'

থানায় পৌঁছে মজুমদার দেখলে—থানায় লোক নেই। একটিমাত্র কনিষ্ঠবল হাফপ্যাণ্ট পরে, গলায় পৈতা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রেষ্ঠবল, মধ্যবল সবাই অনুপস্থিত।

'কোথায় গেল সকলে?'

'গাদিপোতায়।'

'হুঁ।'

থানা থেকে বেরিয়ে মজুমদার বিরুবাবুকে বলল, 'এটাতো গ্রাম, এখানে বাপু তোমার আত্মীয়স্বজন নেই তো?'

'তা নেই।'

'উর্দি'টা পরলে কি খুব অসুবিধা হবে তোমার ? পথটা ছায়ায় ঢাকা বলেই বোধ হচ্ছে, খুব গরম লাগবে না তোমার।'

'আপনি যখন বলছেন।'

বিরুর মুখের দিকে চেয়ে মজুমদারের মনে হল কাজটি সুন্দর হল না। বললে, 'মন খারাপ করে কোনো কাজ করা অনুচিত। বিশেষ করে এই শেষ দিনে।'

'শেষ দিনে ?'

'পথের দিকে তাকিয়ে দেখ। গাড়ির চাকার দাগ দেখে মনে হচ্ছে, ছোট একটা ট্রাকটর চালিয়ে গেছে লোকে। রেমার্ক পড়েছ বিরু ? পল যখন ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টে গিয়েছিল সেও বোধহয় এমনি চাকার দাগ দেখতে-দেখতে গিয়েছিল।'

'আমরা কি ফিরব না !' বিরু পেছনে আসছিল, সে ঘন-ঘন পেছন দিকে তাকাতে লাগল।

'কে বলতে পারে ? তাহলেই দেখ উর্দি'টা গায়ে থাকাই ভালো। লোকে চিনবে, তুমি না বলতে পারলেও, তুমি একজন সরকারী কর্মচারী, কর্তব্য কাজে যাচ্ছিলে। তুমি কোনো পক্ষেই দাঙ্গায় যাচ্ছিলে না।'

বিরু সাইকেল থেকে নেমে বলল. 'এখানেই অপেক্ষা করুন স্যার, কারো একটা জিপ গাড়ি পেলে উঠে পড়া যাবে। জিপগুলিকে আজকাল খুব লোকে মানে।

'তা হয় না, জিপ গাড়ি এখন পূর্বদিকে যাবে, আমাদের যেতে হবে পশ্চিমে।'

বিরু শুকনো মুখে বলল, 'উর্দি পরলে কি কিছু সুবিধা হবে স্যার !'

'তা হবে। কোলকাতায় দাঙ্গার সময়ে ক্রিশ্চানদের কেউ কিছু বলেনি।'

'উর্দি পরলে কি আমাদের ক্রিশ্চান বলে মনে হবে ?'

'কারো-কারো হতে পারে মনে। তা হোক আর না হোক, আমরা হিন্দু-মুসলমান নয় বলে মনে হবে।'

বিরু ঝোলা থেকে উর্দি বার করে সাইকেলের হাতলে বেঁধে নিল। গায়ে না উঠলেও ঝোলা থেকে মুখ বার করল উর্দি।

এরপর সাইকেল চালানো যেন অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হল। উর্দি'পুরঃসর বিরুর পেছনে সাইকেলে চলল মজুমদার।

ছোট একটা আম-কাঁঠালের বাগান পার হয়ে রাস্তাটা একটু প্রশস্ত হয়েছে। এতখানি পথটা ছিল পেটানো মাটির, এখন হল ঝুরঝুরে বালির। সাইকেল কষ্টে চলছে। বেশি জোরে প্যাড্‌ল করলে সাইকেল ডান-বাঁ যেদিকে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে, সামনে এগোচ্ছে না। এমন সময়ে মজুমদার তাদের দেখতে পেল। গুরুসদয় দত্তর পদাতিক বাহিনী। কালো কপালে লাল সিঁদুর-পরা রায়বেঁশের দল। মালসাট্ করে কাপড় বাঁধা। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, সেটা এদের দেহের পুষ্টি আর উচ্চতা।

মজুমদার বলল, 'বিরু আরও এগোবে ?'

'কপালে সিঁদুর রয়েছে স্যার, এরা হিন্দু।'

'তুমি ঠিক বলেছ ? অবশ্য আমি যখন কিছু বুঝতে পারছি না, তোমার বুদ্ধি নেয়া ভালো। তাহলে উর্দিটাকে কি করবে ?'

'কেন, স্যার, উর্দি—'

'তুমি একটু ভেবে দেখ, বিরু, এরা যদি কংগ্রেসী হয়।'

'দেশ তো এখন স্বাধীন, কংগ্রেসী মানেই তো সরকারী।'

'দেখো অভ্যাসটা প্রায় স্বভাবের মতো। এরা যদি সরকার বিরোধী হওয়ার অভ্যাস্ না ছেড়ে থাকে। মনে কর এমন নির্জন পথে যদি বেয়াল্লিশের কথা ওদের মনে হয়ে যায়।'

বিরু একটু চিন্তা করল। তারপর তার ঝোলাটা কায়দা করে সাইকেলের হাতলে রেখে উর্দিটা ঢেকে দিল। বিরুর মুখ শুকনো।

লোকগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল তাদের গতি অত্যন্ত মন্থর, যেন তৃণতৃপ্ত করটক রোমন্থন করতে-করতে পরিক্রমণ করছে।

এদের পার হয়ে মজুমদার বলল, 'এরা কারা বিরু ? এমন চেহারা বাঙলা-দেশে প্রায় দেখা যায় না।'

'এরা গোয়ালা, স্যার। পরের ধানের জমিতে গরু ছেড়ে দিয়ে, ক্রেতাকে জল খাইয়ে আর নিজেরা খাঁটি দুধ খেয়ে জলখাওয়াদের চাইতে তুলনায় মোটা-সোটা হয়েছে।'

'বেশ বলেছ, বিরু। তোমাকে আমি এর আগে একদিন ইনট্যুসনের কথা বলেছিলাম। এ ব্যাপারেও তাই। এদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে রোমন্থনেব কথা মনে হচ্ছিল।'

মুখোটি বলল, 'শুধু বিরুর নয়, তোমার মুখও শুকিয়ে যাচ্ছিল, তা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু এবার গন্তব্যে পেঁছে যাও।'

মজুমদার বিনা প্রতিবাদে বলল : আমাদের অফিসের দরজায় পেঁছে দেখলাম ধুলোয় ধুলোময়। তিন-চারদিন কেউ ঝাড়-পোঁছ করেছে বলে মনে হল না। কেউ কাজ করতে চেয়ারে বসেছে বলেই মনে হল না।

লোকটি ধারে কাছেই ছিল। এসে বসল। মজুমদার বলল, 'মিঞা আপনি নাকি কাজ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।'

'আমাকে বিদায় দিন।' ঠিক এই তিনটি শব্দ বলতে-বলতে লোকটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মজুমদার অবাক। মজুমদারের বিরুবাবু অবাক। আফিসের হিন্দু কর্মচারীরা অবাক। তারপর অবশ্য শুরু হল ইনস্পেকশন। সোজা কথা

নয়, পুলিশ খবর দিয়েছে টাকা-পয়সা নিয়ে পালাচ্ছে পাকিস্তানে। সে ইনস্পেকশনকে নির্মম ছাড়া আর কিছু বলতে পারা যায় না। খাতাপত্র দেখা, আদায়, খরচের খুঁটিনাটি ওজন করা, সম্ভব অসম্ভব জেরা করা। কিন্তু এতটুকু সন্দেহ করার মতো কিছু পাওয়া গেল না, পক্ষান্তরে অন্য দশটা আফিসের চাইতে কোম্পানির উন্নতির দিকেই যেন এর নজর।

ইন্সপেকশন শেষ করে কপালের ঘাম মুছে মজুন্দার বলল, 'মিঞা আপনি যাবেন কেন ?'

বোবার মতো চেয়ে রইল লোকটি। মজুন্দার আপাদমস্তক দেখল তার। কালো-কালো চেহারার রোগরোগাটে একটা লোক। অথচ কি নিষ্ঠায় কাজ করেছে! মজুন্দার বললে, 'আপনাকে সদরে নিয়ে যাব। আপনি সেখানে কাজ করুন। সেখানে দাঙ্গা হবে না, এর গ্যারাণ্টি আপনাকে দিতে পারি।'

ভূতগ্রস্তের মতো লোকটি মজুন্দারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে একটা চাপা কোলাহলের শব্দ এল। কোলাহল কান্নায় পরিবর্তিত হল। ধুলোর ধোঁয়া উড়ছে ধূসর রঙের। তার মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল সারবন্দী হয়ে মানুষেরা যাচ্ছে। প্রায় সকলেই কৃষক, তাদের সঙ্গে তাদের ইহকালের সম্বল, আর শিশু এবং মেয়েরা। মেয়েরা সত্যি-সত্যি বুক চাপড়াচ্ছে।

মজুন্দার বলল, 'এরা যাচ্ছে কেন, কোথায় যাচ্ছে ?'

নতুন যে লোকটিকে চাকরি দেয়ার সম্ভাবনা আছে সে বলল, 'পাকিস্তানে যাচ্ছে।'

'কে এদের উৎখাত করল ?'

'কাল গাদিপোতা লুঠেছে পাকিস্তানীরা, আজ পলদহ লুঠবে হিন্দুস্তানীরা।'

স্থানীয় আফিসের কিছুক্ষণ আগেও যে কর্তা ছিল সে অকস্মাৎ হাহাকার করে কেঁদে উঠল আবার। যার চাকরি পাবার সম্ভাবনা সেই বলল, 'মিঞা, চাকরিতে ইস্তাফা দেবেন না। ছুটি নিন সাহেবকে ধরে। গোলমাল কমলে আসবেন।'

'তা হয়, স্যার ?'

'হয়। তাও হয়।' মজুন্দার তাতেই রাজী হল।

কাজ শেষ হয়েছে। বিরু ততক্ষণে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। সে এসে বলল, 'এ গ্রামে ডাকবাংলো নেই, স্যার।'

'তাহলে—'

'জমিদার-বাড়িতে আজ রাত কাটাতে হবে। কাল সকালে গাদিপোতা দেখে সে আফিসের খোঁজখবর নিয়ে…'

'সে আফিস কেন ? সেখানে তো বাপু হিন্দুই আছে। সে তো পাকিস্তানে পালাবে এমন সম্ভাবনা নেই! তার ইনস্পেকশন ডিউ হয়নি। কেন মিছে

লোককে উত্যক্ত করা।'

মুখোটি বলল, 'এ কি রকম গল্প হচ্ছে মজুমদার। কথার পরে কথা বলে যাচ্ছ। এমন বেকায়দার গল্প নিয়ে পড়তে তোমাকে দেখিনি।'

মজুমদার বললে, তাহলে গবেষণা শোনো ঃ

জমিদার-বাড়িতে আসা গেল। জমিদার-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপই একমাত্র খাড়া আছে বলে মনে হল। চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডী নেই, একদিকে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা পোয়াল। অন্যদিকে একটা ছোট ঘর। ঘরে অনেকগুলি নতুন বালতি দেখলাম। একটা পিঠভাঙা চেয়ার যোগাড় করেছিল বিরু। বিরুকে বললাম, 'হ্যাঁ হে, রাতে কি এই ঘরে থাকতে হবে? ওটাতো বালতির দোকান।'

বিরু বললে, 'বালতির দোকান নয়। পুলিশের বর্ডার আউটপোস্ট।'

'বালতি কেন?'

'কাল রাত্রিতে আগুন লাগিয়েছিল ঘরে। তাই আজ সদর থেকে এস-ডি-ও-র জিপে এসেছে বালতি।'

'বাহ্ বেশ খবর নিয়েছ। আপাতত একটা বালতি নিয়ে দেখো কিছু জল যোগাড় হয় কিনা।'

বিরু বালতি নিয়ে গেল এবং শূন্য বালতি নিয়ে ফিরে এল। জমিদার বাড়িতে জল তুলবার কোনো ব্যবস্থা নেই; বিরু পুকুর থেকে জল আনতে গেল।

'কোথায়?'

'ঐ তালগাছটার নিচে হবে।'

এমন সময়ে বর্ডার আউটপোস্ট হঠাৎ গমগম করে উঠল। একজন দারোগা চার-পাঁচজন কনেস্টবল নিয়ে ফিরল।

'কে আপনি', বলে যে সুরে বিওপির কর্তা কথা শুরু করেছিল, মজুমদারের পরিচয় পেয়ে সে সুর বদলালে। সে বললে, আমাদের উপরে হুকুম আছে আপনাদের কোম্পানিকে সব রকমে সাহায্য করতে। ঐ যে খবরটা পেয়েছিলেন সেটা আমিই দিয়েছিলাম। সাইকেলে লোক গেল রহমৎগঞ্জের থানায়, রহমৎগঞ্জ পিং-পিং করে বেতারে খবর দিল আপনাকে।'…রামভজন কনেস্টবলকে ডেকে বলল, 'সাহেবের থাকার জায়গা উপরে করে দিও।'

'উপরেও ঘর আছে নাকি।'

'আছে।'

'চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ঘর!'

'চণ্ডীমণ্ডপ নয়। এটা বোধহয় দরবার-ঘর ছিল।'

মজুমদার মনে-মনে হাসল কথাটা শুনে। একটা অভাব মজুমদার অনুভব করেছিল, সেটা চায়ের। মজুমদার দেখল বিওপির একজন চৌকিদারের সাহায্যে

উনুন জেবলে বিরু মস্ত একটা হাঁড়ি তুলে দিয়েছে উনুনে। কিছুক্ষণের মধ্যে মস্ত এক গ্লাস চা এনে দিল। মজুন্দারের মনে পড়ল সিকিমের এক গ্রামে এরকম চা সে খেয়েছিল। যাকে এক কথায় গুড়-টি বলা যায়।

চা খেতে-খেতে মজুন্দার বিওপির কাছে জানতে চাইল ব্যাপারটা।

'গোলমালটা হঠাৎ লাগল। কোথাও কিছু নেই ঝড় শুরু হল। একদল লোক এসে গাদিপোতা লুঠ করল। আমরা ছিলাম না, হাটে গিয়েছিলাম। কয়েকটা খড়ের চালায় আগুন দিল ওরা। একজন লোক খুন হয়ে গেল। দু-তিনজন জখম হল। পরের দিন সকালে শুনলাম একটি মেয়েছেলে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আপনারা থাকতেই এরকম ব্যাপার হল!'

'আমরা পরদিন অনেক চেষ্টা করেছি। এই তো কজন সিপাহি, এই নিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে আধ মাইলেরও বেশি ঢুকে গিয়েছিলাম। ট্রেঞ্চে এগিয়ে যাবার মতো বিলের শুকনো খাদ ধরে ধরে এগিয়ে-এগিয়ে ওদের গ্রামের মাতব্বরের বাড়ির নিচে পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সঙ্গে দুটি মাত্র বন্দুক।'

'সাহসের কাজ করেছেন। মেয়েটি কে? তার বাপ-মা স্বামী-ভাই নেই? তারা কি করল।'

'কেউ নেই।'

'সে কি? শহরের মেয়ে হলে না হয় বুঝতাম স্কুলমিসট্রেস বা ঐ রকম কিছু?'

'এও কতকটা তাই, স্যার। কয়েকজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সঙ্গে তার নিজের বাড়িতে বাস করত। জোতজমা আছে। জোতজমার আদায়পত্তরও নিজেই করে। অনেক গরু আছে। গরুর রাখাল ছোঁড়ারাই একমাত্র পুরুষ যারা তার বাড়ির ভেতরে যেতে পারে। ছানা তৈরি হয়ে রোজ সন্ধ্যায় চালান যায় রহমৎগঞ্জের মিষ্টি দোকানে।'

'জাতিতে গোপ?'

'তাও নয়। আমি এদিকে নতুন লোক। আমার কাছে রহস্যপূর্ণ। ওদিকে নিরক্ষর মেয়েটি।'

মজুন্দার কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা আমাদের কোম্পানির লোকটি কি সত্যিই টাকা-পয়সা নিয়ে পালাত?'

'আমাদের তাই সন্দেহ হয়েছিল।'

'আমার কিন্তু সে রকম সন্দেহ হল না। বরং আমি সন্দেহ করে এসেছি মনে করেই লোকটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। টাকা-পয়সার ব্যাপারেও লোকটা খুব পরিষ্কার।'

'লোকটি ভয়ঙ্কর। তার পরামর্শেই পলদহের মুসলমান চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালাল।'

'সকলে চলে গেছে ?'

'যারা আছে তারা কাল সকালে যাবে।'

'কেন, কাল সকালে যাবে কেন ? কি যুক্তি ! এদিকের লোকেরা যদি লুঠই করবে তবে তো আজ রাত্তিরেও পারে। যদি আজ রাত্তিরে না হয়, তবে কাল সকলকে চলে যেতে দিয়ে লুঠ করবে কেন ?'

বিওপির মাথার উপরে একখানা ঘর ছিল। সেই ঘরে মজুমদারের স্থান হল। বিরু ঘরটাকে ঝাঁটপাট দিয়ে মজুমদারের বিছানা পেতে দিল। বর্ষাকালে ঘরটির দেয়াল বেয়ে জল পড়ে ছাদ থেকে তা বোঝা যায়। দেয়ালের পনেরো আনা আস্তর নেই। ইঁটগুলির গায়ে শেওলার দাগ। ঘরের মেঝে এককালে বোধহয় রক্তের মতো লাল ছিল। এখন ভাঙাচোরা মেঝেটা সুরকির মতো রঙ নিয়েছে। কড়িকাঠে লেখা ঠিকানাটা মজুমদারের চোখে পড়ল। শ্যামচাঁদ রায় পিতা মৃত লক্ষ্মীকান্ত রায়, সন ১২৫১ সাল। একশো বছরের আগে কোন এক বিলাসী শ্যামচাঁদ এই বাড়ি তৈরি করেছিল। বড়-বড় জানলাগুলি তার তদানীন্তন আধুনিক রুচির পরিচয়। একটি জানালার শিক নেই, পাল্লাও একটি মাত্র আছে। মজুমদার বলল, 'ওটা তো ভালো নয় বিরু, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে যেতে পারে।'

'এ বাড়িতে ছেলেমেয়ে নেই।'

'তোমার জমিদার-বাড়ি এটা, জমিদাররা কোথায় ?'

'জমিদাররা পঞ্চাশ বছর আগে ফৌৎ হয়ে গেছে, এখন এ বাড়ি তো ফোরং সার। বিওপির জন্য সে আট টাকা ভাড়া পায়।'

'তাদের কেউ নেই ?'

'আছে বোধহয়।'

লণ্ঠনটা কাছে এগিয়ে দিয়ে বিরু বলল, 'আপনি তাহলে লেখাপড়া করুন, স্যার। আমি ওদিকের যোগাড় করি। আর একটা কথা, নিচে যেন নামবেন না। নিচে যাবার দরকার হলে ডাকবেন, সিঁড়িটা খুব ভাঙা।'

বিওপির ঝকঝকে নতুন ডিজের আলোয় বসে মজুমদার তার বালিশের তলা থেকে বই বার করল। মজুমদার খুব পড়ুয়া তা নয়, বিশেষ করে ফরাসি বই তাকে বানান করে-করে পড়তে হয়। সেজন্যই বেকায়দায় না পড়লে তার পড়া হয়ে ওঠে না। আজ তার সঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেই' ছিল।

সময়টা কতটুকু পার হল বলা কঠিন, সহসা একটা আর্ত চিৎকারে মজুমদার ভয়ে শিউরে উঠল। 'বিরু, বিরু !'

বিরু একটা মোমবাতি নিয়ে উঠে এল। 'ও কিছু নয়, স্যার। এখনও পাকিস্তানের দিকে যাত্রীরা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কোনো বিপদে পড়ল হয়তো।'

'কি সর্বনাশ! রাত করে যাচ্ছে কেন?'

'অনেক দূরের দূরের গ্রাম থেকে এরা পাকিস্তানে যাচ্ছে। এই গ্রামে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেছে। এটা মুসলমান প্রধান গ্রাম ছিল। ওরা রাত্রিতে এখানে আশ্রয় পাবে ভেবেছিল।'

জিভ দিয়ে টাকরায় আঘাত করে ক্ষোভসূচক একটা শব্দ করে মজুমদার বইয়ের দিকে নজর দিল। বিরু নিচে চলে গেল।

ভট্টাচার্য বলল, 'যখন একদল মানুষ রাত্রির অন্ধকারে বিপদে আর্তচিৎকার করছে তখন তুমি থেই-এর বর্ণনা পড়ছিলে। দেহ ও মন—প্রেম কার অবলম্বন, এই মনোজ্ঞ আলোচনায় ডুবে ছিল। সে-ক্ষেত্রে তোমার রাত্রির আহার ও নিদ্রা ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। কাজেই ও পর্ব দুটি বাদ দিয়ে যাও তুমি।'

মজুমদার তার পাইপে তামাক গুঁতোতে-গুঁতোতে বলল, 'আপত্তি ছিল না। একটা খবর তোমাদের দিয়ে রাখি, দরকার হলে পলদহ-গাদিপোতা স্মরণ কোর। অমন সুঘ্রাণ কোনো গ্রামের ঘিয়ে নেই। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তারা বলল—পলদহের পলিমাটিতে অজস্র কলাই হয়, আর গাছসমেত কাঁচ কলাইসুঁটি খেয়ে থাকে গরুগুলি শীতকালভর। সে জন্যই এত সুঘ্রাণ ঘিয়ে। জাফরান নেই, এলাচ যৎকিঞ্চিৎ, তবু সেই রাত্রির ঘিভাত আর মোরগঝোলের কথা আমি বহুদিন ভুলতে পারব না। খেতে-খেতে মনে হচ্ছিল ঘরের দেয়াল-গুলিও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। জমিদারদের যখন ভালো অবস্থা ছিল তখন আহার্যের এমন সুঘ্রাণ ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় দেয়ালের গায়ে লেগেছে কিনা কে জানে!'

বিরু এঁটো সরাতে এল। মজুমদার বললে, 'বিওপির লোকেরা কোথায় থাকবে!'

'সারা গাঁয়ে টহল দেবে। শুধু দুজন ঘরে ঘুমাবে আর একজন বন্দুক নিয়ে দরজায় পাহারা দেবে।'

'দরজা মানে তো আমার এই সিঁড়ির মুখে!'

'হ্যাঁ।'

মজুমদার আহারাদির পর আরও কিছুক্ষণ 'থেই' পড়ল। তারপর আলোটা কমিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই দেখল বিরু ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

'চা হয়েছে, স্যার, মুখ ধুয়ে নিন।'

মজুমদার হাতমুখ ধুয়ে দেখল—প্রচুর আহার্যের ব্যবস্থা করে ফেলেছে বিরু ইতিমধ্যে। মজুমদার চা পর্ব শেষ করতে-করতে বিরু সাইকেল দুটি একটু ঝাড়পোঁছ করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল রাস্তার ধারে। অতঃপর মজুমদার গাদিপোতার দিকে চলল। পথ দেখিয়ে দেবার জন্য গ্রামের একজন লোক সাইকেল সমেত বিরু যোগাড় করেছে।

কোথাও শুকনো মাটির খটখটে সমতল পথ, কোথাও ঝুরঝুরে বালির, কোথাও বা গরু-গাড়ির খাদে অসমান রাস্তা। কিছুদূর যাবার পর দু-তিনটে দগ্ধাবশেষ বাড়ি পড়ল চোখে। ছোট ছোট মাটির দেওয়ালগুলি আর পোড়া বাঁশের খুটিগুলি কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গের লোকটি বলল—এগুলি করফুদ্দিন পুড়িয়ে দিয়েছে। এগুলি হিন্দু গোয়ালাদের বাড়ি। আর কিছুদূর গিয়ে একটা আম-কাঁঠালের ঘেরার মধ্যে আর একটা দগ্ধাবশেষ বাড়ি দেখা গেল। সঙ্গের লোকটি বলল, এটি মুসলমানের বাড়ি, কাল পুড়েছে।

রাস্তা বল পথ বল, সেটা সোজাসুজি জলে গিয়ে নেমেছে।

'এরই নাম পলদহ।'

'এর থেকেই গ্রামের নাম? কিন্তু জল কোথায়?'

পলদহর খাত শুকিয়ে গেছে। সোজাসুজি ডাইনের দিকে খানিকটা জায়গায় জল চকচক করছে। তার উপরে একটা ছোট সাঁকো। সাঁকোর ওপারে ছোট-ছোট বাড়ি, দু-তিনজন লোক একটা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, একজোড়া বলদ জুড়ছে একজন লাঙ্গলে। পায়ের তলে পলদহর খাত, একজাতীয় লম্বা ঘাস এবং কলাইজাতীয় লতা লকলক করছে। চৈত্রেও শুকিয়ে যায়নি ঘাস। পলদহর মাটিতে পলির সার আছে। হাঁটু সমান উঁচু আগাছা, শিশিরে ভেজা বোধহয়, পায়ে লাগছে, দুই একটি পচা পাতা ও ঘাসের ডগা জোঁকের মতো গায়ে লেগে যাচ্ছে।

মজুন্দার বলল, 'তোমরা রাস্তা ভুল করেছ। ঐ সাঁকো দিয়েই গ্রামে যেতে হবে। এদিকে সোজাসুজি গ্রাম কোথায়?'

সঙ্গের লোকটি হাঁ-হাঁ করে উঠল। ওদিকে পাকিস্তান।

'আমরা তো পাকিস্তানেই যাচ্ছি তাহলে।'

'না, স্যার। সামনের ঐ বড় অশথ গাছটায় নজর রাখুন। ঐটের ডান দিকে পাকিস্তান বাঁদিকে পলদহ। অশথ গাছটার ডানদিকে গেলেই ওরা ধরে ফেলবে।'

মজুন্দার এই যাত্রীদলের নেতা। সে সাহস দেখিয়ে বলল, 'ধরা মুখের কথা নয়।' একটু পরে বলল, 'অকারণ গোলমাল বাধিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তোমাদের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে অশথ গাছের ডালপালা ধরে পলদহ থেকে উপরের মাটিতে উঠতে যাচ্ছ। তার দরকার কি? ওরা মনে করতে পারে তোমরা অশথ গাছটার ডানদিকেই উঠে পড়ার চেষ্টা করছ। এখানে দাঁড়িয়ে অশথ গাছটার বাঁদিকে দশ গজ দূরে অন্তত কোনো জায়গা লক্ষ্য করে চল।

'আগে তাহলে এক বুক কাদায় গিয়ে পড়তে হবে।

'তা হবে কেন? ওদিকে তো জলের চিহ্নও নেই।'

'ঢোল কলমি আর কচুরির জঙ্গল দূর থেকে মাঠের মতো দেখাচ্ছে।'

'তাহলে?'

'অশত্থর বাঁ-কোন ঘেঁষেই উঠতে হবে।'

কি সর্বনাশ! কিন্তু মজুন্দার দলের নেতা হিসেবে ফিরে দাঁড়াতে পারে না। সে গল্প জুড়ে দিল, 'আচ্ছা, বাপু তোমাদের এই শুকনো জায়গাটার নাম পলদহ হল কেন? এখানে কি কোনো কালে পলা পাওয়া যেত?'

'আজ্ঞে, তা আমরা বলতে পারব না। তবে বর্ষার পর আশ্বিন-কার্তিক মাসে এখানে চিংড়ি পাওয়া যায়, এক-একটা একপোয়ার ওপর।'

'তা বেশ। আচ্ছা তখন তো জল থাকে। জলে তো দাগ কাটা নেই, মাছ ধরতে-ধরতে তোমরা পাকিস্তানের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ো না তো? নাকি তখন অশত্থগাছের ছায়া দেখে সীমা ঠিক করো?

'তা হবে কেন, গোটা বিলটাইতো হিন্দুস্থানে।'

গাদিপোতায় পেঁছাল মজুন্দার। পরে সে শুনতে পেল, পলদহর দুপারেই গাদিপোতা, এপার গাদিপোতা, ওপার গাদিপোতা। একটি তৃতীয় গাদিপোতা তৈরি হয়েছে, পাকিস্তানী গাদিপোতা। অশত্থগাছের গোড়ায় দুটি কৃষক গরু বেঁধে দিচ্ছিল। লক্ষ্য করে মজুন্দার দেখল দুজনেই অশত্থের ডান দিকে। মজুন্দারের গলা শুকিয়ে উঠল। বন্দুক-টন্দুক হাতে নেই তো! মজুন্দার বললে, 'আর দেরি নয়, সাইকেল চাপ।' যারা গরু বেঁধে দিতে এসেছিল তারাও বোধ হয় মজুন্দারকে আশা করেনি। বলা বাহুল্য মজুন্দার দলপতি হিসেবে নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে এসেছিল এতক্ষণ। গরু ছেড়ে কৃষক দুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ভট্টাচার্য বললেন, 'কি আজগুবি, দুজনই দৌড়ালে। কিন্তু বন্দুক দূরের কথা, বর্ষাফলা, ধনুক ব্যবহার করলেই তো মারাত্মক হতে পারত। দৌড়ানোটা কি নিরর্থক হয়নি!'

মজুন্দর বলল, 'একেবারেই নিরর্থক নয়। গাদিপোতার হাটে পেঁছাতে সোয়া ঘণ্টা লাগার কথা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল। পথে কিছু বিপদ হয়নি। একটি মাত্র ঘটনা ঘটেছিল।

সঙ্গের লোকটি হাঁ-হাঁ করে তেড়ে উঠেছিল। তার উদ্দেশ্য মজুন্দার, সেই আগে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা সামান্যই, রাস্তাটা সেখানে একটা বাঁক নিয়েছিল, ফলে বাঁক ঘুরতে সামনের চাকাটা একটু বেশি জায়গা নেয়াতে মজুন্দারের সামনের চাকা পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছিল।

গাদিপোতার হাটের পরিস্থিতিটা খুব চমৎকার। বড় একটা খেলার মাঠের উপরেই ইতস্তত ছড়ানো গুটিকয়েক তাঁবুর মতো ইতস্ততবিক্ষিপ্ত খড়ের ছোট-ছোট চালা। পনেরোদিনে একদিন হাট বসে। চালাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় দোকানদারদের। ছোট দোকানদাররা খোলা আকাশের নিচেই বসে। মাঠের এককোণে মজুন্দারের কোম্পানির আফিস। মাটির দেওয়াল, টিনের ছাদ। আভিজাত্য আছে। কিন্তু একসময় ছিল যখন হাটের আশেপাশে যতগুলি

ঘর ছিল তার মধ্যে আভিজাত্যে গরিষ্ঠ ছিল মজুমদার কোম্পানির আফিস। মজুমদার দেখতে পেল তাদের আফিসের হাত ত্রিশেক দূরে প্রকাণ্ড একটা খড়ের আটচালা তুলেছে।

মজুমদার সঙ্গের লোকটিকে প্রশ্ন করল, 'ওটি কোন আফিস ?'

'পেট্রোল।'

'সে কি, এখানে মোটর চলে নাকি !'

'সে পেট্রোল নয়। ধানচালের পাহারা।'

'তাই বলো, সরকারী আফিস।'

আফিসের স্থানীয় কর্তাকে ডেকে পাঠানো হল। সে এলে কাগজপত্তর দেখল মজুমদার। এ লোকটি বেশ। অল্পবয়সী একটি ছোকরা। কাজকর্মে পলদহের মিঞার চাইতে কাঁচা। কাগজপত্রে কিছু ভুল বার হল, কিন্তু তার হাসিখুশি মুখ দেখে মজুমদার সন্তুষ্ট হয়ে ভুলগুলি নিজেই শুধরে দিল। ছেলেটির পিঠে একটা বন্দুক বাঁধা। বেশ লাগল মজুমদারের। এই রকমই তো চাই। বর্ডারের লোকদের তো এমনি চেহারাই হওয়া উচিত। হাসিখুশি মুখ, বলিষ্ঠ চেহারা, পিঠে বন্দুক বাঁধা। কাগজপত্তরে ভুলভ্রান্তি কিছু থাকাও স্বাভাবিক।

বিরু তার নিজের কাজে গিয়েছিল। সেই বলল, 'আহারাদি এখানেই হবে।' রান্নার বাসন পাওয়া মুশকিল। তা হোক। স্থানীয় কর্তার উপরে মজুমদার এত খুশি হয়েছে যে তার বাড়িতে খেতে আপত্তি নেই।

কাগজপত্তর উল্টে দেখতে দেখতে একটা সোরগোল কানে আসছিল। প্রশ্ন করে মজুমদার জানল—ব্যাপারটা বর্ডার চেকিং। 'বর্ডার চেকিং! এখানে কি কাস্টমস্ আফিস আছে ?'

'না, স্যার। ঐ পেট্রোলম্যানই চেক করছে ?'

'ওকে চেক করবার ক্ষমতা দিল কে ?'

'কে দেয়, স্যার। এদিকের মধ্যে ওই একমাত্র সরকারী কর্মচারী।'

এমন সময়ে বাইরে থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ উঠল। মজুমদার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে সঙ্গে উর্দিপরা বিরু, এবং মজুমদার কোম্পানির স্থানীয় কর্তা, তার পিঠে বাঁধা বন্দুক।

দৃশ্যটা এই রকম : কোম্পানির আফিসের পেছন দিকটায় এক সারি লিচু গাছ। তারপরই একটা উপত্যকা। পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ক্রমশ ঢালু উপত্যকা দেখলে যেমন বোধ হয় প্রায় সে রকম অনুভব হবে সেই লিচু গাছগুলির কাছে দাঁড়িয়ে সবুজ মাঠগুলি দেখলে। এদিকের জমিটা উঁচু। খানিকটা উপত্যকার মতো ঢালু জমি তার ওপারে, আবার ক্রমশ উঁচু হয়েছে জমি। আর সবটাই সবুজ ঘাসে ঢাকা।

লিচু গাছগুলির নিচেই বাদানুবাদ চলছে। গুটি চারেক পুরুষ, গুটি সাত-আট শিশু-বালক-বালিকা, তিনটি নারী এক পাশে, অপর পক্ষে চার-পাঁচজন

পুরুষ। প্রথম পক্ষীয়দের মলিন বেশ, দুজনের কাঁধে বাঁক। বাঁকের থেকে ঝুলছে দুটি ধামা। ধামায় কি আছে বোঝা যায় না। মলিন কাপড়চোপড় তার চাইতেও মলিন কাঁথাগুলি চোখে পড়ছে। দুজন পুরুষের মাথায় ধামা। সেগুলি থেকেও ছেড়াখোঁড়া কাপড়চোপড় চোখে পড়ছে। মেয়েগুলির হাতে কাঁখে ছোট-ছোট পুঁটুলি। একটি ছেলের মাথায় জড়ানো একটি পাটি। এ পক্ষের একজনের পরনে খাকি হাপপ্যাণ্ট ও সার্ট। অন্য কয়েকজনের বর্ণনা দেবার মতো কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের একজনের নাম বিষ্টু ঘোষ, তা মনে আছে মজুন্দারের।

দ্বিতীয় পক্ষ বলল, 'সব মাল নামাও!' ধামাগুলি, বাঁক দুটি, পুঁটুলিগুলি সব জড়ো হল। নির্মম হাতে সেগুলি পরীক্ষা করল। ধামাগুলির একটিতে পাওয়া গেল সের দু-তিন চাল। বিষ্টু ঘোষ ঢেলে রাখল। বিষ্টু ঘোষের এক সাথী নির্মমভাবে একটা কাঁথা পড়পড় করে টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

'এই, তোল বাঁক, যাও।' বাঁকওয়ালা দুজন উপত্যকার ঢালুতে গিয়ে দাঁড়িয়ে এদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।'

একটি মেয়ের ছোট পুঁটুলিটার ভেতরে একটা ছোট কাঁসার বাটি ছিল, কলাপাতায় মুখ বাঁধা। 'খোল বাটি!'

'কিছু নেই, একটুকু চিড়ে ভেজানো।'

'বটে? চিড়ে ভেজানো। ও যদি আফিম না হয় কি বলেছি।'

'জে, কোলের ছাওয়াল আছে দুটে। জল কোথায় পাব, খাতে চালে কি দেব তাই জলে সলে দুটে চিড়ে ভিজায়ে নিছি।'

'হুঁ। ফাঁকির আর জায়গা পাওনি। বাটিটা কাঁসার, ভালো কাঁসা। ওটাকে পার করতে চাও।' বিষ্টু ঘোষ চিড়েটা উপুড় করে ফেলে সঙ্গীর হাতে বাটিটা দিয়ে দিল।

হঠাৎ মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চিড়ের শোকে। মজুন্দার লক্ষ্য করে দেখল দেড় বছর আর মাস দুয়েকের দুটি রোগা-রোগা শিশু রোদে পুড়ে নেতিয়ে আছে দুজনের কোলে।

একে-একে সবাই পার হল। একটি মেয়ের পরীক্ষা তখনো শেষ হয়নি। যারা পার হয়েছিল তারা মেয়েটির জন্য দাঁড়াল না। মেয়েটি যুবতী।

'এই, জামা খোল।' মেয়েটি অ'-অ' করে কান্নার উপক্রম করল।

'চুপ কর বুবী। কি আর করছিস তাই বল? ওরা তোর কে, ওদের সঙ্গে যাচ্ছিস?'

মেয়েটি বোধহয় সত্যি বোবা—হাত পা নেড়ে আঁ-আঁ করে কি বোঝানোর চেষ্টা করল।

হঠাৎ মজুন্দারের রাগ হল। সে কোম্পানির লোকটির হাত থেকে বন্দুকটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই রাসকেলরা।' বিষ্টুর দল হকচকিয়ে গেল।

'কে তোমাদের বর্ডার চেক করার হুকুম দিয়েছে।'

'আজ্ঞে-আজ্ঞে' বলে কি বলতে গেল লোকগুলি।

'ছেড়ে দাও ওকে।'

বিন্টু কম লোক নয়। সে বললে, 'ও পাকিস্তানে গিয়ে মরবে, স্যার। কার হাতে পড়বে ঠিক কি? দেখলেন না, ওর সঙ্গীরা পর্যন্ত দাঁড়াল না।'

'ওরা ওর সঙ্গী নয়, তাই বোঝা গেল। ছেড়ে না দিলে খুন হয়ে যাবে। খুন হও আর না হও এখুনি আমি অ্যারেস্ট করব।'

বুবীকে ছেড়ে দিল। বুবী উপত্যকা বেয়ে দৌড়াতে লাগল। এবং বিন্টুর দলের একজন লোক কিছুক্ষণ পরে উপত্যকার পথ ধরল।

বিন্টু ডেকে বলল, 'এরফান, বকনাটাকে তেইড়ে দিস।'

এরফানের হাসির শব্দে বুবী থমকে দাঁড়াল। রাখাল যেমন গরু তাড়ায় তেমনি বিকট শব্দ করল এরফান। বুবীটা বোধ হয় জড়বুদ্ধিও। মজুমদারের মনে হল গরুতাড়ানোর শব্দে বুবী ভুল পথ ধরে ছুটতে লাগল দলের দিকে না গিয়ে।

বিরু এসে বলল, আহারাদির পর যখন একটু বিশ্রাম করাও শেষ হয়েছে মজুমদারের, 'আমাদের স্যার এবার ফিরতে হয়।'

'এত রোদে?'

'বেলা থাকতেই যেতে হয়। বর্ডার জায়গা, বেলা থাকতেই পলদহ যেতে হবে।'

'তা বটে, চল,' অশথ গাছটার কথা আমার মনে ছিল না।

কোম্পানির লোকটি ভদ্রতার খাতিরে সঙ্গ নিল। খানিকটা যাবার পর সে-ই প্রস্তাবটা উত্থাপন করল, 'স্যার একটু শিকার খেললে হয় না।'

'শিকার, এদিকে শিকার কোথায়?'

'ধানক্ষেতগুলিতেই ভরুই পাখি পড়ছে, স্যার। এখনও খেতে চাষ পড়তে দেরি আছে, এসময়ে ভরুই পাখির ঝাঁক পড়ে খেতে।'

মজুমদার ইতস্তত করতে লাগল।

মুখোটি মুখ খুলল, 'মজুমদার তুমি হিপোক্রিট। বর্ডার পার হতে যার আতঙ্ক সে শিকারের কথায় ঐ পরিস্থিতিতে ইতস্তত করে না।'

ভট্টাচার্য বলল, 'মুখোটি, একটা দিক ভাবো। মানুষ মজুমদারের মতো বোধশূন্যও হতে পারে। যখন গ্রামের লোকগুলির মুখ আতঙ্কে শুকিয়ে যাচ্ছে তখন নীরোর মতো বাঁশির অবতারণা করতে সবাই পারে না। যখন মানুষ মরছে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে, তখন মরা-মরা খেলাও খেলতে পারে।'

মজুমদার বলল: সত্যি-সত্যি একটা ধানের খেতে নেমে কোম্পানির

লোকটি বলল, 'আপনি প্রথম ফায়ার করুন স্যার।'

'আমি? না, তুমি কর। চৈত্রমাসে আমি প্রাণীবধ করতে চাই না।'

লোকটি চার-পাঁচবার খেত থেকে খেতান্তরে গিয়ে ফায়ার করল, কিন্তু একটি পাখিও পড়ল না।

হঠাৎ মজুমদার বলল, 'দেখি, দাও তো দেখি।'

মুখোটি বললে, 'দেখলে ভট্টচার্য, এটাপ্যাঁল মজুমদার। যখন দেখল বন্দুকওয়ালা শিকার জানে না তখন মজুমদারের প্রাণীবধ না করার প্রতিজ্ঞা আর রইল না। আনাড়ির সামনে নিজের স্বল্পবিদ্যা দেখানোর লোভ।'

মজুমদার বলল : এমনি করে শিকার করা ও এগোনো চলতে লাগল। এক সময়ে দেখা গেল পথের দুদিকে মাটি উঁচু। বোধ হয় পলদহর খাত বেয়ে চলেছে। কিছু চাষও হয়েছে এ অঞ্চলে পলদহর খাতে। বলতে ভুল হয়ে গেছে, ভরুই পাখির কিছু-কিছু বিরুর থলিয়াটায় জমা হচ্ছিল। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার। ভরুই পাখিকে বসা অবস্থায় ফায়ার করতে নেই। ঠিক যখন তারা উড়তে শুরু করবে ; সেই মৌমাছির ঝাঁকে গুলি ছাড়, পাখি পাবে। শব্দেই ওরা কাহিল।

অনর্গল বন্দুক ফোটানো চলল। ভরুই খেত ফুরালো তো হরতেলের গাছ পাওয়া গেল। কিন্তু হরতেল গাছেব লালচে পাতার আড়ালেও যেমন সবুজ পাতার আড়ালেও তেমনি নিশানা করা দুষ্কর। হরতেলের পর জল পাওয়া গেল। পলদহর জল। খেলনার হাঁসের মতো ছোট ছোট বুনো হাঁস ভাসছে পাঁচটা ফায়ার করে একটা পাওয়া গেল সংগ্রহ করার মতো।

কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করল মজুমদার—এ কোথায় এসেছে তারা। পলদহের জল ধরে চলতে চলতে সামনে সাঁকো। আট-দশ হাত দূরে কতগুলি বাড়িঘর খড়ের, দু-চারজন লোক তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

সহসা বিরু বলল, 'সাঁকো পার হন স্যার।'

সপারিষদ মজুমদার সাঁকোটা প্রায় ছুটতে ছুটতে পার হল। সাঁকো পার হয়ে পলদহর আগাছা ঢাকা খাত পেয়ে মজুমদার বলল, 'কোথায় এলাম বিরু!'

'আজ্ঞে, হিন্দুস্থান।'

'ওটা তাহলে—'

'আজ্ঞে তাই। খুব বাঁচা গেছে।'

পলদহর গ্রামের পথে উঠে দাঁড়িয়ে মজুমদার একটা চুরুট ধরাল। প্রায় ত্রিশজন চাষী স্বল্প-পরিসর পারানি নৌকার পাটাতনে বসবার মতো গাদা-গাদি করে বসে আছে। রাস্তা বন্ধ। দুপাশে দুটি বাড়ির বাঁশের প্রাচীর। দু মাথায় দুজন দুজন চারজন সিপাহি বন্দুক তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিওপির কর্তা মজুমদারকে দেখতে পেয়ে বলল, 'গাদিপোতা থেকে

ফিরলেন। আপনার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। বন্দুকের শব্দ শুনেছিলাম।'

বিষয়টি জানা গেল। মজুমদার বিলের জল ধরে চলতে-চলতে পাখি শিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল যখন তখন তার সেই অবিরাম গুলি চালনার শব্দে পাকিস্তান গাদিপোতার লোকরা মনে করেছিল পাকিস্তান-সদর থেকে সৈন্য বাহিনী এসে পড়েছে, তারাও লাঠি কাস্তে নিয়ে সাঁকো পার হয়ে চড়াও হয়েছিল। এদিকে বিওপির এরাও বন্দুকের শব্দে ভীত হয়েই ব্যাপার কি দেখার জন্য এসেছিল। ত্রিশজন লোককে এরা ধরে ফেলেছে।

মজুমদার হো-হো করে হেসে পথ চলতে লাগল। সেই বিওপির উপরতলার ঘরে। জামা জুতো খুলে বসতে না বসতে চা জলখাবার এসে গেল তার। তার কোম্পানির স্থানীয় কর্তা পথে লোক রেখেছিল স্যারের গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখার জন্য। চায়ের জল সেই ঠিক রেখেছিল। বিরু বলল, 'স্যার মাস্টার্ড নেই, সরষে খুব ভালো করে গরম জল দিয়ে এক রকম তৈরি করছে। দেবে ?'

'তা দিক।'

মুখোটি বললে, 'স্ক্যাণ্ডাল! এখনো মাস্টার্ডের কথাও ভোলনি তুমি ?'

মজুমদার বললে : চা খেতে খেতে একথায় সে কথায় সেই মেয়েটির কথা উঠল—যাকে নাকি ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কোম্পানির নতুন লোকটি বলল, 'মেয়েটির নিজেরও দোষ আছে। কাউকে কেয়ার করে না। পুরুষমানুষের মতো নিরংকুশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় তাহলে।'

'তাই বা বলি কি করে স্যার, গ্রামের একটি লোকও সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না। বদ ছোকরাগুলিও তাকে বেশ মেনেই চলে। বছর দশেক আগে একবার একটা কথা উঠেছিল—তার বিয়ে হবে। ঢলাঢলির পর্ব নাকি চলছে বিয়ের আগে। কিন্তু কোথায় কি সব মিথ্যে হয়ে গেল।'

'গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে তাকে ?'

'তা করুক আর না করুক। তাকে নিয়েই গোলমাল। গোলমালের কারণই সে। তাকে ধরে নেবার জন্য হামলা, তার জন্যই গ্রামে এত উত্তেজনা।'

ওরা চলে গেলে বিরু বলল, 'আপনার ঘরের ওপাশে আর একটা ঘর আছে, ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার করছে। একজন সিপাহি বলল—ওটাকে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তা করুক। আজ রাত্রিটা না করলেই হল।'

মজুমদার বললে, 'আজ রাত্রিতে যদি করে, আর ঐ ত্রিশজন লোককে যদি রাখে তবে মুশকিলই করবে। তবে ওদের কোনো কাজে অমত করতে যেয়ো না। আমরা উটকো লোক।'

রাত্রিতে আর একবার আকণ্ঠ সুস্বাদু সুপক্ক আহারে পূর্ণ করে বিওপির ঝকঝকে আলোয় 'থেই' পড়ল মজুমদার। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে

পড়ার আগে মজুমদারের মনে হল পাশের ঘরে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ও রকম মনে হয় একা পড়ো বাড়িতে থাকতে।

মজুমদার থামল।

মুখোটি বলল, 'ভ্রমণকাহিনী শেষ হল?'

মজুমদার বলল, 'অনেক রাত্রে অনেক স্বপ্ন দেখে থাকে মানুষ। সে রাত্রিতে স্বপ্ন অনেকে দেখেছিল।'

মুখোটি বলল, 'তুমিও দেখেছিলে?'

মজুমদার সে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিল, কে একজন ঘরের মধ্যে এল, আলোটা হাতে তুলে কমিয়ে দিল।

'তোমার মনিব্যাগ খোয়া গিয়েছিল?'

'তা যায়নি।'

মজুমদারের পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তার মনে হল সেই কে একজন তার পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মজুমদার চোখ খুলেও যেন তাকে দেখতে পেল। সেই অবগুণ্ঠনবতীর মুখখানা অন্যদিকে ফিরানো ছিল। মজুমদারের মনে হল সে চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু তার মনে হল সে তো স্বপ্নই দেখছে। তার চিৎকার শুনে যারা আসবে তাদের কাছে কি বলবে! স্বপ্নর কথা? মজুমদার দাঁতে দাঁত চেপে প্রহরগুলি কাটাতে লাগল। কি অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন! অতগুলি প্রাণী বধ করার ফলই বোধ হয়। আর মসলা সংযুক্ত আহার্যের ফল। স্বপ্নের মধ্যে এসব তর্কবিতর্ক করল মজুমদার।

স্টেশনে পৌঁছে সিগারেট ও কাগজ কিনে আনল বিরু।

বলল, 'আপনার পাশের ঘরে কেউ একজন ছিল স্যার?'

মজুমদার চমকে উঠল।

'কাল আপনি শুনলে সেই মেয়েটি এসেছিল। আমাদের বন্দুক নিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়ার ফলে পাক গাদিপোতার লোকরা, মানে যার বাড়িতে তাকে আটকে রেখেছিল সে বাড়ির মেয়েরা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল। মেয়েটি বিওপির লোকদের কাছে হাসতে হাসতে বলল—তারা নাকি তাকে অলক্ষ্মী বলে গালিও দিয়েছে; অনেক গল্প করার পর মেয়েটি ওপার গাদিপোতায় ফিরতে চাচ্ছিল।'

বিওপির লোকরা তাকে উপরের কয়েদখানায় রাত কাটানোর জন্য অনেক অনুরোধ করল। 'দেখি তো' বলে মেয়েটি অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়েছিল।

মুখোটি বলল, 'তুমি একটি মহৎ মিথ্যাবাদী। তুমি কি বলতে চাও গল্পটার কোথাও এতটুকু সত্যপ্রয়োগ আছে?'

মজুমদার বলল, 'গল্পে সত্য থাকে না বলে তোমাদের অভিযোগ উড়িয়ে

দেয়া যায়। কিন্তু তার দরকার নেই। গল্পের মজুন্দারের সম্বন্ধে গল্পের মধ্যে তোমরা যে সব উক্তি করেছ সেগুলিও গল্পের অংশ বলে ধরে নেয়া যাক। নাটকের স্বগতোক্তি যেমন, তেমন তোমাদের উক্তি।'

ভট্টাচার্য বলল, 'মেয়েটির অন্তরের কথা তো আমরা বলতে পারিনি। সে কী বীর্যশুল্কা ?'

মুখোটি বলল, 'নাকি সেই তথ্য ? সে নিজে থেকে যখন আসে তখন বরদাত্রী। জোর করে পেলে সবংশে নিধন।'

মজুন্দার বলল, 'একটা স্বপ্ন না বলার কি যুক্তি আছে ? সব শুদ্ধ মিলে একটা ভ্রমণ কাহিনী।'

মজুন্দার আবার চুরুট ধরাল।

তাঁতী বউ

সব দেশের একটা যুগ আছে যাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ আর একটি আছে যাকে বলা হয় আলোকের যুগ। বাঙলা দেশে অধিকন্তু একটা আছে যা আনাড়ির তোলা ফটোগ্রাফের মতো গভীর অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ। সেই যুগের গল্প একটা বলছি :

অভিমন্যু বসাকের ছেলে গোকুল বাপের ব্যবসায়ে উন্নতি যতটা করলে অবনতি তার চাইতে কম করেনি। অভিমন্যুর ছিল আটপৌরে ঠেঁটি আর বচকানা কাপড়ের ব্যবসা, পয়সা যা পেত তাতে দিন চলে যেত, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে তাঁতী-বউয়ের নামে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছে। যতদিন পারা যায় গোকুল কাঁধে লাল গামছা দুলিয়ে খসবু-দেওয়া পান খেয়ে নিছক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছু করল না। বাপের শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে সে যন্তরপাতিগুলি নিজের মতো করে গুছিয়ে নিল ; লোকে অবাক হল দেখে, যে গোকুল অপদার্থ হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে সে বাপের আসনে বসে বাপের মতো ঠেঁটি আর বচকানা বুনে যাচ্ছে যেন কতদিনকার অভ্যাস।

লোকে বলে পরিবর্তন তারপরে যেটা হল তার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল, কাজেই বাপের শোক গা-সহা হতেই গোকুল একদিন তাঁত ঘরে সব উল্টে পাল্টে ভেঙে-চুরে ফেলল যখন, তখন তারা আদৌ অবাক হল না। তবু গোকুল তাদের অবাক করল। তিন গুরুবার পার হয়ে যাবার পরে চারের বারে গোকুল বিকেলবেলায় কাঁচ কলার পাতায় কি একটা মুড়ে নিয়ে গ্রামের জমিদার-বাড়ির দিকে রওনা হল। সে জমিদারের কাছে গেল না, গিন্নিমার কাছে গেল না, সোজা গিয়ে উপস্থিত কাজলার (দীঘি) ঘাটে যেখানে জমিদারের নতুন আনা বেটার বউ আর নতুন-বিয়ে-হওয়া মেয়ে ইশারায় স্বামীর গল্প করছে। গোকুল যখন ফিরে এল তখন তার হাতে বেটা-বউয়ের হাতের দুগাছা রুলি। এই হচ্ছে গোকুলের মসলিন বুনবার প্রথম কথা। গঞ্জে পাঠাবার মতো সরেস জিনিস তার তাঁতে উৎরাত না, বিশেষ করে ফুলের কাজগুলোতে সোনার আঁশ খাটাতে সে পারত না, বড় জোর শাদা সুতোর বুটি উঠত ; আর বহরে সেগুলো শাজাদীর দরবারী শাড়ি হত না, কাজেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া বড় বেশি কারো চোখে পড়ত না তার কারিগরি ; বড় জোর সকালে কোনো স্বামী দেখতে পেত, রাত্রির শুকনো মালাগাছির সঙ্গে বিছানায়

পড়ে আছে মাকড়সার শাদা জালির মতো কি একটা।

গোকুল মাঝারি গোছের গুণী কিন্তু বড় রকমের খেয়ালি ছিল। বড় গুণীর বড় খেয়ালে যা ঘটে খেয়াল মিটবার পর তার জের থাকে না। কিন্তু মাঝারি গুণী বড় খেয়াল ধরলে, কিম্বা মেজ গুণী মেজ খেয়ালে হাত বাড়ালে খেয়ালের জের অত সহজে মেটে না। সাধারণ ঘরের মেয়ে একরাতে মসলিনের সাত পাক পরলে সকালে বিছানা ছাড়বার সময়ে স্বামীকে না-জানিয়ে বিছানার একপাশে আলগোছে মসলিন খুলে রেখে যেতে পারে না এও তেমনি আর কি। গোকুল তার খেয়ালে জড়িয়ে পড়ল।

শীতের গোড়ায় ইঁদিল-শাহীতে পরগণার হাট বসত একমাসের জন্য। সব হাটেই সেকালে নানা ধরনের পণ্য আসত, পরগণার হাটে কতগুলি বেশি দামী জিনিস আসত। সে সবের জন্য এ হাটের একটা দিক আলাদা করা থাকত। অন্য সব দোকানের পসরা ফুরিয়ে যাবার পর হাটের এদিকে ভিড় লাগত। জমিদারেরা নিজে আসতেন, এমন কি উজিররাও কেউ কেউ আসতেন কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। এদিকে বাঁদী বান্দার দোকান। টাকা দিয়ে বান্দা পাওয়া যেত যোয়ান, বুদ্ধিমান, কৌশলী, পাঠান, মোবলা, খোজা, হিন্দু যার যে রকম চাই। বাঁদীও পাওয়া যেত মুলতানী, গুজরাটি, আফগানি, শাদা, গোলাপী, শ্যামলা, কখনো বসরা থেকেও আসত। এসব দোকানের বর্ণনা ইতিহাস যা দিয়েছে তার চাইতে ভালো বলা যায় না। আনারকলি, নুরজাহাঁ এসব দোকানের বেসাতি।

গোকুল মসলিন ক'খানা বেচে ফেলেছে, দোকান-ছেড়ে সে মেলায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কি-কিনি কি-কিনি ভাব। অন্য যে দু-একজন গুণী এসেছে তারাও ঘুরছে। কিন্তু হাটের একটা দিকে সে কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছে না। লাঠি-বল্লম নিয়ে এক-এক দল লাঠিয়াল তো আছেই, খোলা কিরিচ হাতে পাহাড়ের মতো উঁচু ঘোড়ায় চেপে ঝকঝকে সাঁজোয়া পরা সিপাইও আছে কয়েক দলে। গোকুল ভাবল, বোধহয় রাজা-মহারাজেরা কেনা-কাটা করে এখানে। কিন্তু ভয়ে কৌতূহল চাপা যায় না। মেলার শেষ দিন এসে গেল, গ্রামের সঙ্গীরা চলে গেল কিন্তু গোকুলের যাওয়া হল না। ওদিকের সব দোকান উঠে গেছে, এদিকেরও দু-একটা মাত্র অবশিষ্ট। প্রথমে সিপাইরা গেছে, তারপরে গেল লাঠিয়ালরা। একদিন গোকুল দেখল এবার এগোনো যায়।

একটা মাত্র দোকানই খোলা ছিল, দোকান ভেঙে চলে যাবে বলে একটা চাকর গালিচা পর্দা জড়ো করে গাঁটরি বাঁধছে। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না, অবশেষে সাহসে ভর করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের দোকান গো ?'

বুড়ো দোকানি ফুরসি টানতে-টানতে বলল, 'মাল তো নেই বাপু, আর তুমি কিনবেই বা কি ?'

'যা হয় কিছু, খালি হাতে মেলা থেকে ফিরব ?'

'তা দেখ, বাপু, এদিকে এস। আমার দুর্নাম গেয়ে বেড়িও না, ভালো মাল নেই, বেছে নিয়ে যাবার পর না-পছন্দ এক-আধটা আছে।' এই বলে মানু দোকানি দোকানের ওঁচা ভাঙা মাল হাতখালি করবার জন্য যে কোনো দামে ক্রেতাকে গছানোর ভঙ্গিতে গোকুলকে ডেকে নিল।

পর্দা তুলে গোকুল দেখল কোনো মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয়, মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলো দেখা যায় সারা গায়ের শ্যামল চামড়ার নিচে। গোকুল বুঝল কিসের দোকান এটা, কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসল, 'আমি কিনব।'

কেন বলল একথা গোকুল সেদিনও বলতে পারেনি, কোনোদিনই বলতে পারবে না। তার একার সংসারে ঝি-বাঁদীর কি বা কাজ। গ্রামের লোকেরা বলে সে খেয়ালে একাজ করেছিল। মসলিন বিক্রির টাকা বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বলল, 'আমার কেনা হল।'

পথে দুর্বল রোগা মেয়েটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কষ্ট যত না হল তার চাইতে বেশি হল রাগ। সে যে ঠকেছে, গ্রামের লোকেরা আর একবার তাকে বোকা তাঁতী বলবে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। সমস্ত শরীরের হাড়গুলো নড়বড় করছে। আধময়লা ডুরে ঠেঁটি পরবার ধরনটাই বা কী! চোয়ালের হাড়গুলোর নিচে চোখ ডুবে গেছে, কাঁধের হাড়ের জোড়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে। কঙ্কালের গড়নের মধ্যেও একটা ছন্দ থাকা উচিত। যেন কোমর নেই এত সরু জায়গাটা, গোকুল ভাবছিল মচ্ করে একটা শব্দ হবে, তারপর দু-টুকরো হয়ে যাবে মেয়েটি। সে বললে, 'আস্তে চল, বাপু।' তার মনে হতে লাগল, মুচিরা মাঝে-মাঝে যেমন বুড়ো গরু হাঁটিয়ে নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে এও যেন তেমনি। হাতে করে তুলে ফেলে দেবার মতো হলে সে ছুঁড়ে ফেলে দিত তার বোকামির নিশানা কারো চোখে না পড়ে এমন জায়গায়।

পথে ঘাটে বেরুলে লোকে ঠাট্টা করবে এই ভয়ে গোকুল ঘরে বসে তাঁত বোনে, আর কিছু কাজ যাতে হয় সে উদ্দেশ্যে মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সবল করে তোলার জন্য যখন তখন তাকে ধমকে-ধমকে খাওয়ায়। মেয়েটা কাঁদে আর খায়, আর মাঝে মাঝে রোদে রাখা লাটাই ঘরে তোলে, ঘরের লাটাই রোদ্দুরে দেয়। গোকুল তার দিকে চেয়েও দেখে না। চোখের কোনায় যদি হঠাৎ কখনো পড়ে, সারা শরীর রিন-রিন করে ওঠে : কি বিশ্রী, কি বিশ্রী।

মানুষ যেমন হঠাৎ একদিন মরতে পারে, তেমনি হঠাৎ একদিন বাঁচতেও পারে।

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার পর থেকে পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো বর্ষা নেমেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গোকুল ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় হিসাব দেখছে। আজকাল সে বুড়িয়ে গেছে যেন, বাঁদীটাকে কিনে যে লোকসান হয়েছে তাই উশুল করতে গিয়ে সেই যে টাকা-পয়সার হিসাব নেমেছে ক্রমশই

তাতে জড়িয়ে পড়ছে।

মেয়েটি চট পেতে বারান্দায় শোয়। কাদনের বৃষ্টিতে মাটির দাওয়া কাদা-কাদা, তবু তারই মধ্যে সে শুয়ে থাকে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেলে ক্রমে দেয়ালের কাছে সরে আসে। সারা শরীর জলে ভিজে যায়, হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে ঘুমের আশা ছেড়ে কোনো কোনো রাত্রিতে সে দাঁড়িয়ে কাটায়।

গোকুলের চোখে তন্দ্রা এসেছিল। পর-পর তিন চারবার প্রবল বজ্র গর্জনের সঙ্গে ঝাঁ-ঝাঁ করে বৃষ্টি নামল। বারান্দার দিকের জানালা দিয়েও বৃষ্টির ছাট এসে গোকুলের গায়ে লাগছিল। সেটা বন্ধ করার জন্য উঠে এগিয়ে যেতেই তার কানে কান্নার শব্দ এল। কে বা কাঁদছে, ভয় পেয়ে ছেলে-মানুষের মতো, অসহায় অব্যক্ত কান্না। অদ্ভুত লাগল গোকুলের। অথচ তেমন লাগবার কথা নয়, বাড়িতে আর একটি প্রাণ, আছে, এই তিমির ঘন দুর্যোগের রাতে বাইরে বৃষ্টির নিরাশ্রয় ধারার মধ্যে। বাঁদী কাঁদে এমন করে মানুষের মতো?

দরজা খুলে দিল গোকুল তবু নড়ে না বাঁদী। অন্ধকারের মধ্যে নজর ঠেলে দিয়ে গোকুলের লজ্জা বোধ হল। ঘরে ঝুলানো সকালে তাঁত থেকে নামানো শাড়িখানা হাত বাড়িয়ে বাঁদীর দিকে এগিয়ে দিয়ে গোকুল ঘরের অন্ধকারে সরে গেল। সেখান থেকে হুকুম করলে বাঁদীকে ঘরের ভিতরে আসতে।

বিছানায় বসে সে ভাবতে লাগল কি বিড়ম্বনায় সে পড়েছে খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে। মানুষ, হোক সে বাঁদী, এমন নির্বোধ হয় কি করে? লাথি আর মিষ্টি কথার তফাত বোঝে না। অবশ্য গোকুল পরখ করে দেখেনি, লাথির অপমান বুঝতে হলে খানিকটা বুদ্ধি থাকা দরকার। খিদে পেলে যে খায় না, খিদে না থাকলেও খাও বললেই যে খায়, গোবর ঘেঁটে হাত ধোবার ইচ্ছা হয় না যার, পায়ের নখ উল্টে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলেও যাকে বলে দিতে হয় হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ কর—সে যে কি পরিমাণ নির্বোধ। শুধু নির্বোধ নয় নির্বাকও।

গোকুল রাগ করে বলল, 'কাপড় পরেছ, তবে ঘরে আসছ না কেন? ঘরে এসে দরজা দাও, ঘর ভিজে গেল জলে। কি আপদ!'

বাঁদী ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

গোকুল রাগ চড়িয়ে বলল, 'এবার ওই কোণটায় শোও, শুয়ে চোখ বোজ, চোখ বুজে ঘুমাও। আরও বলে দিতে হবে?'

বাঁদী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, অন্ধকারেও মনে হল কি যেন বলতে চায় সে।

গোকুল বলল, 'যাও, শোওগে যাও।' কিন্তু একথার পরও বাঁদী যখন নড়ল না বরং হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল দরজার পাশে গোকুলের মনে হল বাড়ির কুকুরটির মতো বাঁদীটিও তার। উঠে গিয়ে প্রদীপ তুলে সে দেখল বাঁদীর চোখ দিয়ে

জল পড়ছে। একটা মিষ্টি কথা বললে তার প্রভুত্ব বোধ হয় খর্ব হবে না, বললে সে, 'কেঁদো না, বাপু, সবার জীবনই সুখের হয় না।'

বাঁদী উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের আলো তার সর্বাঙ্গে পড়েছে। সবজে মোটা মসলিনের অন্তরালে বাঁদীকে দেখে গোকুল নির্বাক হয়ে নিজের থুতনি চুলকাতে লাগল। হাড়ের কাঠামোর উপরে মেদমাংস লেগেছে এ খানিকটা গোকুল প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু কি বিশ্রী কি বিশ্রী করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে বলে সে কোনো দিনই এ পরিবর্তনের আভাস পায়নি। বক্ষের বৃত্তাভাস, নিতম্বের বিস্তৃতি, উরুর মসৃণতা, আর সব ছাপিয়ে তার চোখ দুটি।

গোকুল কিছু ভেবে না পেয়ে বাঁদীর হাত ধরে বলল, 'ভয় নেই তোমার।' তার মনে হল এত করুণ, এত কিশোর! এ কি কখনো ভাবা গেছে এ এত অল্পবয়সী। গোকুলের মনে হল এত স্নেহ দিতে পারে একে তবু না-হয় স্নেহের শেষ, না হয় তা জানানো। বিছানায় বসে গোকুল তাকে পাশে বসাল। বারে বারে বলল, 'কাঁদিসনে, কাঁদিসনে।' কোথা থেকে সাহস পেয়ে বাঁদী দু-হাতে গোকুলকে আঁকড়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

সকালে তাঁত ঘরে গিয়ে গোকুল প্রথমে কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করল যা জীবনে করেনি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? শিরা-উপশিরাগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেত চন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে। মনের খানিকটা অংশ জুড়ে (গোকুলের মনে হল বুকে) যে শুভ্রতা কমনীয় হয়ে উঠছিল, স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল তার একবার অনুভব হল সেটা শুভ্র উরুদেশের ছায়া। ঘরে ফিরে এসে সে দেখল তার শয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাঁদী। রাত্রির স্বপ্নের সঙ্গে দিনের আলোর মিল দেখে সে অবাক হল একটু। গোকুল ফিরে গেল খানিকটা বাদে আবার ফিরে আসবার জন্য।

গোকুলের তাঁতঘর থেকে দিবারাত্রি গান শোনা যায়, যে গান গলা নিরপেক্ষ, সুর নিরপেক্ষ, চাষী হলুদে ধান কাটতে যে গান গায় কতকটা তেমনি।

অল্প বয়স যতদিন থাকে মানুষ প্রবীণ গৃহস্থের অনুকরণ করতে ভালোবাসে, যেমন ছোট-ছোট মেয়েরা করে খেলাঘরে। গৃহকর্তা হয়ে একদিন রাত্রিতে গোকুল বাঁদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শোন্ বলি তোকে। একটা জিনিস আমাদের নেই। একটা ছেলে না হলে যেন চলছে না, তাই নয়। বড় খালি-খালি, শুধু দুজন।' বাঁদী বড়-বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল মাত্র।

দু-চারদিন বাদে গোকুল কথাটা আবার বললে তাকে, বাঁদী শিউরে উঠে বললে, 'না।'

'নয় কেন?'

বাঁদী গোকুলের কাছে সরে এসে থরথর করে কেঁপে উঠল।

কথাটা গোকুল ভুলল না। কখনো বাঁদী না শুনবার ভান করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে, কখনো গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক মিনতি করে।

বাঁদীর ছোট-খাট শরীরটার মধ্যে একটা ছোট মন আছে সেটা গোকুলের গলা শুনলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। দোকানির তাঁবুতে যত মেয়ে ছিল সবার চাইতে সে ছিল ভীরু। মানুষ দেখলে তার জিভ জড়িয়ে আসে কথা ফোটে না, স্তম্ভিত হয়ে যায় ভিতরটা।

এক রাত্রিতে বাঁদীর করুণ দৃষ্টিতে মন ভিজল না গোকুলের, সে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। বাঁদী জানাতে চায় গোকুলকে সুখী করতে না পেরে সে দুঃখী, সেটুকু জানানোর জন্য বাঁদী শব্দ করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোকুল ধমক দিয়ে উঠল, 'কি আপদ ঘুমাতে দেবে না।'

সারা রাত বাঁদী বসে রইল, সারা রাত তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নিজের উপরেও রাগ হচ্ছিল তার।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে গোকুল পরের দিন রাগ করল না। শুধু বলল, 'আমার মনে হয়, ও তুই পারবিনে, সব মেয়ে পারে না।'

মিষ্টি কথায় বাঁদী অভিমান করে পাশ ফিরে রইল। সামান্য মাত্র, বেশি করতে সে ভয় পায়।

একদিন গোকুল নরম করে বলল, 'এই দেখ কি এনেছি, এইটে হাতে বেঁধে দিই আয়, সিদ্ধি-থানের মাটি আছে এতে, দেখি তার পরে কি হয়।'

বাঁদী উঠে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হবে?'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ।'

কিছুদিন পরে বাঁদী গোকুলকে নিজে থেকে বলল, 'ফকির এসেছে ও গাঁয়ের মাঠে, যাব?'

'যাবি কেন! ও বুঝেছি। তা তোর বুঝি ভরসা নেই কবচে। কিন্তু কি করে যাবি? সে নাকি সন্ধ্যার পরে একা-একা এলো চুলে নতুন শাড়ী পরে যেতে হয়। ভয় করবে রে। ও মাঠে রাতের বেলা গাঁয়ের লোক যেতে ভয় পায়। তা আমিও না হয় কিছু দূর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে পারি।'

'না যেতে হয় না।'

'তাই বলেছে ওরা? যাস তবে তাই।'

বাঁদী গিয়েছিল। নতুন শাড়ি পরে, কপালে খয়ের-টিপ এঁকে, চোখে কাজলের রেখা দিয়ে। যে রকম লোকে বলেছিল ঠিক তেমনি করে এলো চুলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিল। যদিও বাড়ি থেকে সাত পা যাবার আগেই সে ভয়ে ঘামে নেয়ে উঠেছিল।

ভোরবেলার একটু আগে সে ফিরে এল। গোকুল আলো নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বাঁদীকে দেখে চমকে উঠল। কোথায় খয়েরের টিপ, কোথায়

চোখের কাজল। পরিক্লান্ত সর্বহারা দৃষ্টি।

আশঙ্কার সঙ্গে কিছুটা পরিহাস মিশিয়ে গোকুল বলল, 'ডাকাতের হাতে পড়েছিলি নাকি রে?'

'না।'

'ভয় না হয় নাই পেলি, পেয়েছিস কিনা আমি জানছি। আহা-হা পড়ে গিয়েছিলি সাঁকো থেকে। ঠিক তাই, ঠোঁট কেটে গেছে, এই তো কাপড়ও ভিজে।

'না।'

'রাগ করেছে পাগলি। সত্যিরে আমার জন্য এত কষ্ট হ'ল তোর।'

'না।'

গোকুল বাঁদীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল; নতুন গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছিয়ে শাড়ি পালটিয়ে বিছানায় বসাল তাকে।

'আমি জানি। অভিমান হওয়া তোর অন্যায় নয়। আমাকে সুখী করার জন্যে তুই যে সাহস দেখালি, যে কষ্ট করলি তারপর তোকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। তুই বলেই পেরেছিস। আর কেউ তাঁতীর জন্য এতটা করত না।'

'না, না।'

বাঁদী দু-তিন মাস কথা বললে না, ভালো করে রাঁধল না, খেল না, চুল বাঁধল না। শুধু আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটাল। গোকুল দূরে-দূরে থেকে ভাবল, অভিমান করবেই তো বাঁদী, সে কি সোজা কথা রাত করে ওই ভয়ের মধ্যে যাওয়া।

একদিন পাড়া থেকে বেড়িয়ে ফিরে গোকুল বলল, 'শুনেছিস, তাঁতীবউ, তোর সেই ফকিরটা মরে গেছে। গলায় বাঘে না কিসে কামড়েছিল, তার ঘাতেই দু-তিন মাস ভুগে-ভুগে মারা গেল। ভেবেছিলাম একদিন ভালো করে সিন্নি দিয়ে আসব, হল না তা।'

বাঁদী দপ করে জ্বলে উঠল, 'গোরে দেয়নি বোধহয়, যাও যাও, এখনো দিয়ে এস সিন্নি।'

'রাগ করলি তুই? দেখতো কত বড় দয়া করেছে ফকির আমাদের। মন্তরে ফল হতেও পারে তো?'

চৌকাঠ চেপে ধরে বাঁদী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন তার নিজের স্বরের তীব্রতার প্রত্যুত্তরে গোকুলের রোষের আশঙ্কায় তার মুখ বিবর্ণ হয়েছে।

কিন্তু গোকুল রাগ করল না। এমন হয় সংসারে, অনুগৃহিতার একটি মাত্র আত্মদানের ফলে তার স্থান অনুগ্রহিতার সমপর্যায়ে উঠে যায়। গোকুল অপ্রতিভ হয়ে পালিয়ে গেল।

একদিন বাঁদী কথা বলল। নিজে থেকে গোকুলকে ডেকে লজ্জায় মুখ লাল করে বলল, 'হবে, পাবে তুমি এতদিনে।'

তারপর একটু কাঁদল বাঁদী। সারা মুখ বিকৃত হয়ে দুর্বার লবনাক্ত অশ্রুর

বন্যা নেমে এল।

গোকুল বলল, 'কাঁদ, কাঁদ। আনন্দে কান্না পায়।'

তাঁতীদের মধ্যে যারা গোকুলকে খাতির করত তার ওস্তাদীর জন্য তারা এল। ওপাড়া থেকে জেলেদের রহিমবুড়ো এল জন কয়েক সাকরেদ নিয়ে; যে দোকান থেকে মাঝে-মাঝে গোকুলের মসলিন বিক্রি হয় ধনীদের মধ্যে এল সে।

রাঙা পাড় কোরা ঠেঁটি পরে বাঁদী (এখন সে তাঁতীবউ) বসেছে রকে। কোলে ছোট্ট ফুট্‌-ফুটে, টুলটুলে একটা ছেলে। গোকুল সকলের সামনে জোড় হাত করে দাঁড়াচ্ছে। সকলে এগিয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করছে। গোকুল কারো কথা শুনল না, রহিম বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে ছেলের মাথায় বারবার মাখিয়ে দিয়ে বলল, 'দোয়া কর, চাচামিঞা, তোমার মতো হাত হয়।' একমুখ হেসে বুড়ো বলল, 'হবে রে হবে, বাপের বেটা হবে।'

সকলে চলে গেলে গোকুল ঘরে গিয়ে বসল। শোবার ঘরের ওদিকটায় একখানা নতুন কাঁঠাল কাঠের চৌকি পড়েছে—সোনার মতো রঙ তার। একরাশ রঙিন কাঁথার ভাঁজ স্তরে স্তরে সাজানো। গোকুল পাড়ার অনেককে বানাতে দিয়েছিল, আজ নিয়ে এসেছে। তাঁতীবউ তখনও বাইরে বসে ছেলে কোলে করে। গোকুল ডাকল 'ঘরে এস বউ, খোকনমণির ঠাণ্ডা লাগবে।'

তাঁতীবউ হাসে, তাঁতীবউ কথাও বলে।

একদিন সে ছেলে শুইয়ে এসে বসল গোকুলের পাশে।

'খুশি হয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে, এখন আর তেমন করে মনে পড়বে না, তাই নয়।'

'বাস রে কত কথা শিখেছিস তুই।'

তাঁতীবউ হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বলল, 'তুমি খুশি হলেই হল।'

দিন যায়, রাত্রি যায়। গোকুল ছোট চৌকিখানার কাছে ঘোরে আর ছেলেকে দেখে আর ষাঁড়ের মতো চেঁচায়, 'বউ দেখসে দুধ তুলছে।' কখনো বলে, 'দেয়ালা কাটছে দেখে যারে, দেখে যা।' কখনো নিজেই রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বলে 'একটা কথা বলি, হাসবি না। খোকা আমাকে চেনে। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়ে।'

রাত্রিতেও ওই একই কথা হয়। গোকুল বলে, 'এই তো উঠে বসবে, চাঁদির একটা গোট বানিয়ে দেব। কিন্তু তোর ছেলে কি ভদ্রলোক ভেবেছিস? ফোকলা মুখের নালে-নালে বুক ভসে রাখবে।'

সোহাগের বুক থেকে তাঁতীবউ অনুযোগ করে, 'দিনরাত তোমার ওরই কথা।'

গোকুল বলে, 'যার জন্যে ওকে পেলাম সে বুঝি ফেল্‌না।'

চাঁদির গোট গড়াল গোকুল, ছেলে কিন্তু উঠে বসবার কোনো লক্ষণই দেখাল না। পাঁচ মাস গেল, সাত মাস গেল, বছর ঘুরে এল, ছেলে বাড়ল না পর্যন্ত। দেখলে মনে হয় যেন কত কালের বুড়ো, হাসে না পর্যন্ত।

গোকুল বউকে ডেকে বলে, 'একি হল রে?'

তাঁতীবউ প্রবোধ দেয়ার সুরে বলে, 'সেরে যাবে বড় হলে দেখো।'

রাতে ছেলে ঘুমায় না। কি একটা কষ্টে সারা রাত কাঁদে, সারা রাত কাতরায়। তাঁতীবউ বাইরে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়। তাঁতীও উঠে আসে।

তাঁতীবউ বলে, 'একি হল ছেলে?'

তাঁতী বলে, 'কপাল।'

ওঝা এল। কবরেজ-হেকিম। চিকিৎসা হল কিন্তু সবাই যেন ছেলের ভ্রূকুটি দেখে ফিরে যায়। শেষে অনেক ধরনা দিয়ে অনেক কষ্টে গোকুল সিদ্ধস্থানের ঠাকুরাণীকে নিয়ে এল। অনেক কথা, অনেক মন্ত্র, অনেক তুক সারা সকাল, সারা দুপুর চলল। সারাদিন না খেয়ে আগুনের কাছে ঠায় বসে থেকে তখন গোকুলের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে, তাঁতীবউ ঢলে পড়েছে, দেয়ালের গায়ে। সন্ধ্যা লাগা-লাগা সময়ে সিদ্ধা মুখ খুলে বলল, 'তুই বউ বদলা, গোকুল। এ বউয়ের রিষ্টি যোগ আছে। এর কাছে ভালো ছেলে তুই সাতজন্মেও পাবি না।'

গোকুল বোধ করি ঝিমিয়ে পড়েছিল, প্রথমবারে তার কানে যায়নি কথাগুলো। সিদ্ধা স্পষ্ট করে বলবার জন্য আবার বলল বউ বদলানোর কথা। এবার লাল চোখ মেলে গোকুল সিদ্ধার দিকে চাইল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরো, বেরো। ভণ্ডামি করার জায়গা পাওনি।'

সিদ্ধা চলে গেল। সারা দিন স্নান খাওয়া হয়নি তবু সে রাত্রিতে খাওয়ার জন্য কেউ উঠল না। গোকুল যজ্ঞস্থান থেকে একটু সরে এসে মাটিতেই শুয়ে পড়ল। চূড়ান্ত আশা ভঙ্গের এমন মূর্তি আর দেখা যায় না। তাঁতীবউ মাটির মূর্তির মতো বসে রইল। ছেলেটা রাত্রিতে কতবার কাঁদল, কেউ উঠেও দেখল না।

ব্যাপারটা গোকুলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। প্রথমে সে নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই যা দেরি হয়েছে—তাঁতীবউ আবার বাক্‌হীনা হয়ে পড়েছে। দিনকে দিন যেন সে বোকা হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগের পীড়াটাই তার ফিরে এসেছে।

তাঁতী একদিন ডেকে বলল, 'তুই কি আবার আগের মতো শুধু বোকা হয়ে থাকবি, শুধু কাঁদবি নাকি?'

তাঁতীবউ একটু হেসে পাখাটা নিয়ে বাতাস করতে লাগল।

'সারা রাত বসে-বসে বাতাস করবি নাকি? তার চাইতে ঘুমো না হয়। তোর মনও তো ভালো নেই। শুয়ে থাক আমার পাশে।'

তাঁতীবউ চুপ করে শুয়ে পড়ল।

গোকুল বলল, 'কেমন যেন আগের মতো, তোর নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই, শুতে বললাম আর টুপ করে শুয়ে পড়লি।'

তাঁতীবউ শত অনুরোধেও মুখ তুলল না; গোকুলের বুকে মুখ গুঁজে প্রাণপণে দু হাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল।

দিনকে দিন তাঁতীবউ শুকিয়ে যাচ্ছে। গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠে চোখ দুটিকে আগের চাইতে বিস্তৃত করে দিয়েছে। চলে যেন না-চললে নয়, বলে যেন না-বললে নয়।

একদিন গোকুলের মাথায় খুন চেপে গেল. রাগের মাথায় সে চিৎকার করে উঠল. 'নিকুচি করি তোর চোখের, কথা বলিস না কেন? জিভ ক্ষয়ে গেছে। চুলের মুঠি ধরে বের করে দেব পাজি কোথাকার।'

তারপর কোঁচার খোঁটে চোখ মুছতে-মুছতে নিজেই বেরিয়ে যায়।

এক রাত্রিতে গোকুল শেষ চেষ্টা করবার জন্য তাঁতীবউকে ডেকে নিল। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে কোলে করে বসল। দুহাতে মুখ তুলে ধরে অনেকক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকল। তার পরে বলল. 'অন্য বউদের মতো কথা বলতে তুই জানিস না, তা জানি। তবু যেমন বলতিস তুই নিজের তৈরি একটা-দুটো কথা তেমনি বল, বলতে হবে তোকে। বল আমাকে, সত্যি করে বল, আর ভালো লাগে না আমাকে।'

'লাগে।'

'লাগে তো? তবে কেন অমন করিস? এ ঘর সংসার কি তোর নয়?'

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

গোকুল ব্যাকুল হয়ে বলল, 'বল, যা বলতে চাচ্ছিস বল।'

তাঁতীবউ বলল, 'বউ বদলাও।'

প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তারপর হো-হো করে হেসে উঠল. খুব হাসির কথা যেমন বারবার আবৃত্তি করে তেমনি করে গোকুল বলতে লাগল, 'বউ বদলা, বউ বদলা ঘুমা তুই, বদলাতে হয় কিনা সে আমি জানি। এই ভেবে বুঝি দিনকে দিন বোকা হয়ে যাচ্ছিস।'

আর একবার কবরেজ গুণিন্‌, ওঝা নিয়ে মেতে উঠল গোকুল। একে পায় তো ওকে ছাড়ে. ওর খ্যাতি শোনে তো ছুটে যায়, ওর একটু দুর্নাম শোনে তো ছাড়িয়ে দেয় ওকে। ছেলেটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে আর বউকে ডেকে বলে, 'একটু উন্নতি হয়েছে, নারে?' বউ সাড়া দেয় না; সাড়া না দিলেও সে নিজেই বুঝতে পারে উন্নতি কিছুমাত্র হয়নি।

এমনি করে ছেলেকে দেখতে-দেখতে একদিন গোকুলের খুন চেপে গেল মাথায় আবার। হারামজাদা পাজি, ভাগাড়ের শকুন, বাঁদরের বাচ্চা কোথাকার। যেমন দেবতা তার বরও তেমনি। অমন মরকুটে ফকির না হলে এমন ফল হয় তার মন্তরে।'

ক্ষুদ্র প্রাণীটির জ্বালাময় নিদ্রাহীন আলো অন্ধকারের অভিজ্ঞতার হয়তো সে-দিনই শেষ হয়ে যেত, যদি নিজের কথাগুলি কানে যেতে কানে আঙুল দিয়ে গোকুল ছুটে না পালাত।

সারাদিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে গোকুল সন্ধ্যার পরে ফিরে এল। একটুখানি জোছনা উঠেছে সেদিন। উঠানে দাঁড়াতেই তাঁতীবউকে দেখতে পাওয়া গেল। জোছনার এক ফালির মাঝখানে সে বসে আছে, শান্তস্থির পটের ছবির মতো। স্নিগ্ধতার আশ্বাসে পায়ে পায়ে গিয়ে গোকুল বসল তার পাশে। সকালের তাণ্ডবের জন্য তার অনুতাপের অবধি নেই।

'ও বউ, কথা বল, তোর পায়ে ধরি। আমার দোষ—সব, বুঝতে পেরেছি। তোর দিকে আমি চেয়েও দেখিনি।'

'কি বলব বল।'

'কিছু কি তোর বলবার নেই? আমি কাছে এলেই তোর এত কষ্ট? আচ্ছা আমি যাই।'

'না বাসনে। আজ একটা কথা বলব তোমাকে। ও কোনোদিনই ভালো হবে না। ওর দোষ নয়, তোমার দোষ নয়। বোধহয়—'

'কি বোধহয়?'

'বোধহয় আমার রিষ্টি যোগ আছে।' কথাটা বলতে গিয়ে অস্ফুট কান্নায় তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল।

কথাটা নতুন নয়। অনেক আড়ম্বর করে, এর চাইতে অনেক দৃঢ় স্বরে সিদ্ধা বলেছিল। কিন্তু বাক্‌বিহীনার স্বরে এমন সব আশা নষ্ট হওয়ার সুর ছিল যে গোকুল আহতের মতো খাড়া হয়ে বসল।

'খালিস কি রে?'

'হ্যাঁ সত্যি। ওরা বলে—আমার মনে হয়...'

'ওরা ভুয়া দেয়। তাহলে আর আমি জানতাম না?'

'না জানতে না। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ।' তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল যেন সে তখনই যাত্রা শুরু করবে।

পরদিন সকালে উঠে গোকুলকে দেখা গেল না, তার পরদিনও না, তারপরও না। তাঁতীবউ বড় কান্নাই কাঁদল। দুদিন সে উঠল না, রাঁধল না, খেল না। মাঝে-মাঝে শুকিয়ে ওঠা স্তনটা শিশুর মুখে গুঁজে দিয়ে তার কান্না থামানোর

চেষ্টা করে। অনাহারের অবসাদে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে তাকে, তাও যেন সে বুঝতে পারে না। গোকুলের মুখ মনে পড়ে আর সব কিছু অন্ধকার হয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখে পাথর হয়ে যেতে যেতে তাকে এক সময়ে নড়ে উঠতে হল। পেটের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে বলেই রান্নাঘরের দরজা খুলতে হল তাকে। কিন্তু গোকুল নেই, কে তাকে বলবে রান্না করতে যেতে, কখন কি করতে হবে। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো ভয়ে নিচুস্বরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

দুঃখের গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন সে আঁ আঁ করে কাঁদে। এক একদিন সন্ধ্যায় বর্ষা নামে। বর্ষার শব্দের মধ্যে তার বোবা কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। হাটের থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে এমন দু-একজন তার কান্না শুনে তাড়া-তাড়ি হেঁটে গোকুলের বাড়িটা পার হয়ে যায়।

তারা বলাবলি করে কোনো দিন, 'গোকুলের বাঁদীটা বুঝি। গোকুল গেছে বিয়ে করতে শুনলাম। তা হবে। বেচারার বড় কষ্ট। একা একা ভয়-ভয় করে বোধহয়।

গোকুলের নাম শুনে তাঁতীবউ উঠে যায় ভালো করে শুনবার জন্য। শুনতে পায়—গোকুল গেছে বিয়ে করতে।

আকস্মিক আঘাত পাবার মতো একটি অস্ফুট শব্দ করে তাঁতীবউ সরে আসে জানলা থেকে।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গা ধুয়ে সে গোকুলের দেয়া ভালো শাড়িগুলো বের করে পরে। কপালে টিপ আঁকে, বিনুনি করে পিঠে ঝুলিয়ে দেয় চুল। খোঁপা বাঁধে না, গোকুল পছন্দ করত না। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসে প্রতীক্ষায়। গোকুল হাটে যাবার সময়ে এমনি করতে বলে যেত তাকে। কাজ করতে-করতে থেমে গিয়ে সে ভাবে—গোকুল কোন কাজটা কি রকম করতে বলে দিয়েছিল। ঠিক তাই করে সে।

কোনো-কোনো দিন সে ভাবে শুয়ে-শুয়ে, যদি কোনো দেবতা বর দিতো তাকে। এমন কি হয় না কোনো গুণিন এসে দু-হাতে তুলে একটা সন্তান তাকে দিয়ে যায়, একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটা ছেলে। দু-হাত ভরে নেয় সে তাহলে। বুকের মধ্যে টন্‌টন্‌ করে ওঠে তার। ঘুমন্ত রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেটাকে তুলে নিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়। কিন্তু সেও যদি ফকিরের মতো হয়। কথাটা মনে হতেই তাঁতীবউ আড়ষ্ট হয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে, গা ঘিন্‌-ঘিন করে ওঠে। ছেলেটাকে দুম্‌ করে বিছানায় ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মরেছে মরেছে, বেশ হয়েছে। বাঘের কামড়ে গলা ফুটো হয়ে মরেছে। তাঁতীবউয়ের চোখ দুটি শ্বাপদ হিংসায় চকচক করে ওঠে। রক্তে মুখ ভরে উঠল ভেবে—থু-থু করে উঠল তাঁতীবউ। না দরকার নেই।

কোনো গুণীর কাছে সে বর চায় না। শুধু গোকুল ফিরে আসুক। সে যদি বউ নিয়ে আসে, তাও আসুক।

তবু এক-একদিন স্বপ্নে দেখে সে একরাশ ফুলের মধ্যে ফুলের চাইতেও সুন্দর একটি ছেলেকে।

রাত্রির উঠোনে তাকাতে তার ভয় করে, তবু খুট করে একটু শব্দ হলেই সে উঠে যায় দরজার কাছে। মাঝরাতে উঠে বসে একদিন তার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। যদি তাঁতী ফিরে গিয়ে থাকে তার সাড়া না-পেয়ে। সেদিন থেকে সে দরজা খুলে রাখল। বিছানায় শুয়ে সে সারা-রাত ঘুমোতে পারল না। দরজা বন্ধ ঘরে গোকুলের পাশে শুয়েও যার ভয় যায় না, সেই আজ দরজা খুলে রেখেছে।

একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। গোকুলের প্রত্যাশায় বসে থেকে-থেকে মাঝরাতে ঘুমে গা এলিয়ে এসেছে, বসে-বসে ঢুলছে তাঁতীবউ—এমন সময়ে উঠোনে পায়ের শব্দ হল যেন। তাঁতীবউয়ের মনে হল সে বলবে—এস, আমি তোমার জন্যে জেগে আছি দেখ। আজই শুধু নয়। পাছে ফিরে যাও বলে প্রদীপ জেবলে রেখেছি, দরজা খুলে রেখেছি। কিন্তু কথা বলা হল না। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে দম বন্ধ করে দিল যেন। মনে হল কাঁদতে না পারলে সে মরে যাবে, তবু কাঁদল না। দেখবে সে প্রথম মুহূর্তেই তার তাঁতীকে, পোড়া চোখ বারবার করে মুছতে লাগল।

কিন্তু পায়ের শব্দ যখন একেবারে তার পাশে এসে থামল তখন সে মুখ তুলতেও পারল না। একটা সুন্দর সুবাস আসছে, তাঁতীবউ ভাবল—সুখে ছিল গোকুল তাই। কিন্তু অভিমান সে করবে না, মান করা তার সাজে না—কি আছে তার গরবী হওয়ার।

মুখ তুলে তাঁতীবউ বিস্ময়ে অভিনবত্বে দিশেহারা হয়ে গেল। স্বপ্নের মধ্যে যেন সে ভাবল—তুমি দেবতা, তুমি এলে। আমার দুঃখ, তাঁতীর দুঃখ, ওই ছেলেটির দুঃখ সব মিলে তোমাকে টেনে এনেছে। তাই এত সুবাস, তাই এত সুন্দর তুমি। তোমার মুখের দিকে চাইবার সাহস নেই আমার। তুমি তো আমার মনের কথা জানো।

অনভ্যস্ত কথা বলার পরিশ্রমেই যেন তাঁতীবউ হাঁপাতে লাগল। 'শোন, তাঁতীবউ, গোকুল ফিরবে না। তুই এত দুঃখ করবি কেন? আর গোকুল যদি ফেরেই কখনো যা দিয়ে তোকে সে কিনেছে তার চাইতে দশগুণ আমি তাকে দিয়ে দেব। বুঝতে পেরেছিস আমার কথা? আজই নয়···। চিনিস তো আমাকে, রাজবাড়িতে দেখেছিসও বোধহয়।'

দেবমূর্তি সাপ হয়ে কামড়ালেও তাঁতীবউ এতটা শিউরে উঠত না। পলকে দূরে সরে গিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পৃথিবী তখনো পায়ের তলায় দুলছে। তীব্র রূঢ় দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রাগ করে কি

বলতে গেল সে, কিন্তু অসীম ঘৃণায় সে বারবার বলল, 'ছি-ছি তোমাকে দেবতা বলেছি, ছি-ছি-ছি !'

'শোন, তাঁতীবউ ভেবে দেখ্ । সময় নে ।'

'ছি-ছি-ছি-ছি ।'

আগন্তুক কখন চলে গেল, কে তাকে তাড়িয়ে দিল এসব কিছু মনে নেই তাঁতীবউয়ের। প্রথম সাধারণ বোধ ফিরে আসতেই ভয়ের একটা আর্তশব্দ করে উঠে গিয়ে দরজার খিলগুলো এঁটে দিল সে।

এর বোধহয় প্রয়োজন ছিল। এমন বেহুঁস হয়ে, এমন কোমল প্রাণ নিয়ে যারা চলে, তারা না-পারে নিজে বাঁচতে না-পারে অন্যকে প্রাণ দিতে। ভয় যতক্ষণ না-আসে ততক্ষণ তার আশঙ্কা এমন আড়ষ্ট করে রাখে যে নিজেকে পিঁপড়ের মতো তুচ্ছ মনে হয়। ভয় এসে চলে গেলে আশঙ্কাটা কমে যায়, কিছুটা আত্মবিশ্বাসও আসে।

প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তাঁতীবউকে তার উঠোনের পৃথিবীর বাইরে পা দিতে হয়েছে। হঠাৎ কারো কথা শুনলে যার প্রাণ সুদ্ধ আড়ষ্ট হয়ে যেত এখন সে হাটে যায়। অপরিচিত দোকানির সঙ্গে দামদস্তুর করতে হয়। পয়সা উপার্জনের ফিকির সে নিজেই বার করেছে। জোলারা আসে তার কাটা সুতো নিতে। পাকা কারবারির মতো সে বাকিতে মাল দেয় না, কথার খেলাপ করে না।

কখনো-কখনো সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে গোকুলকে নিয়েও আলাপ হয়। মেয়েদের কাছে সে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে, এরকম অবস্থা হলে তাদের স্বামীরা কি করত। কেউ বলে—ফিরবে একদিন, এই রূপ ফেলে কেউ থাকতে পারে। সেদিন রাত্রিতে গোকুলের দেওয়া মসলিন পরে আরসি ধরে নিজেকে দেখে তার অবাক লাগে—তা কি হয়, এর জন্য কখনো কেউ ফেরে যদি এত দিনের এত কান্না তাকে ফেরাতে না-পেরে থাকে। অন্যদিন কেউ বলে—দেখ, কোথায় আবার বিয়ে-সাদি করেছে। সেদিন রাত্রিতে আরসির সামনে বসে সে ভাবে—কিছুই তো বদলায়নি। যেদিন প্রথম গোকুল তাকে বলেছিল—তোকে না হলে আমার চলবে না, সেদিনকার মতোই তো সব আছে। সে ভাবে—এ সবের জন্যই দায়ী সে। গোকুলকে সে নিজে ঠেলে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। কিন্তু সে তো তখন বুঝতে পারেনি তাঁতী আর কাউকে বিয়ে করলে কত কষ্ট। আর কি বোকা ছিল সে। গোকুল কথা বলতে যত অনুরোধ করত তাকে, তখন সে নির্বাক হয়ে যেত। এখন যখন মেয়েরা বলে রাত্রিতে কে কি বলেছে স্বামীকে তখন সে শোনে আর অবাক হয়ে যায়—এদের চাইতে অনেক মিষ্টি কথাই তো গোকুলকে সে বলতে পারত, গোকুলের কাছে গেলে মনেও হত।

তার ছেলেটা এখন হামা টানতে শিখেছে। হোক অনেক দেরিতে তবু

শিখেছে তো। পাড়ার সব ছেলেমেয়েগুলি এমন কিছু সুন্দর নয়, সবলও নয় সবগুলি। গোকুল এলে এসব সে বুঝিয়ে বলবে, গোকুল তো বোকা নয়, সে বুঝবে। সুন্দর ছেলে-মেয়েও আছে। এই তো সেদিন গাজনের মেলা থেকে সন্ধ্যার একটু আগে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে ফিরতে-ফিরতে দুটি ছোট-ছোট ছেলেকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কার ছেলে গো? নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকেও সাধ মেটে না তার। ঠিক এমনি চেয়েছিল গোকুল। এগিয়ে গিয়ে ছেলে দুটির সঙ্গের ঝিটিকে জিজ্ঞাসাও করেছিল সে। কিন্তু নাম শুনবার পর তার মনে হল যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। রক্তহীন মুখে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

সেদিনকার রাত্রির কথা মনে পড়ল। তেমনি চোখ, এখনি যেন তেমনি ক্ষুধাতুর হয়ে জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সত্যি দেবশিশুর মতো দেখায় ছেলে দুটিকে।

সহযাত্রীর প্রশ্নে উত্তরে সে বলল, 'কি যেন লাগল পায়ে।'

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষের মন। সেখানে একটা ক্লেদাক্ত আবিল সম্ভাবনা কি করে বাসা বাঁধল কখন। তাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁতীবউ সারা পথ সারা মন দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল—চাই না, চাই না, ছি-ছি-ছি। বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করল।

একদিন গোকুল ফিরে এল। তাঁতীবউ বসে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, এমন সময়ে গোকুল এসে দাঁড়াল তার পিঠের কাছে। তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল, কাঁদল না, বোকার মতো চেয়ে থাকল না, একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বস, হাত ধুয়ে আসি।'

হাত ধুয়ে আসতে একটু দেরি হল। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে হয়তো বা একটু কেঁদেছিল সে, অনেক দিনের অভ্যাস তো। মুখে চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে পাখা নিয়ে তাঁতীর পাশে বসে বাতাস করতে-করতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলে এতদিন, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? খাওয়া-দাওয়া ভালো হত না?'

কিছুক্ষণ পরে বলল, 'ভালো মন আমার, এতদিন পরে এলে প্রণাম করতেও ভুলে গেছি।'

নিচু হয়ে তাঁতীর ধুলোভরা পা বুকের 'পরে চেপে ধরল। গোকুল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, অন্ত খুঁজে পায় না।

তাঁতীকে সেধে-সেধে খাইয়ে ঘরে নিয়ে এসে বসল সে, যেন তার বাড়িতে গোকুল অতিথি। এক সময়ে হাসতে-হাসতে সে বলল, 'আমারই জিত হল দেখ। কই পারল ডাকিনীরা ধরে রাখতে আমার তাঁতীকে?' তাঁতী মুখ নিচু করে থাকে। দু-হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে তাঁতীবউ যেমন গোকুল এককালে তার ধরত।

কাজ করতে-করতে ফিরে এসে তাঁতীবউ বলে, 'কিন্তু ওরা কি লোক গো!'

'কারা ?'

'তোমার সেই ডাকিনীরা যারা তোমাকে ধরে রেখেছিল। তারা কি শুধু ছলাই জানে ? পুরুষটাকে কি খেতেও দিতে নেই।'

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে দেরি করে তাঁতীবউ ঘরে এল। গোকুল দেখে অবাক—মসলিন পরেছে তাঁতীবউ, চোখে কাজল। অথচ এ সবের জন্য অনুনয় বিনয় করে-করে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করেছে এককালে। তাঁতীবউ মুচকি হেসে গোকুলের কোলে গিয়ে বসল, নিজে সেধে মুখের পরে মুখ নামিয়ে আনল।

'একি গা পুড়ে যাচ্ছে যেন, জ্বর হয়েছে তোমার ?'

'হয়।'

'রোজ হয় জ্বর ? কি সর্বনাশ ! কি করে হল ?'

'জানিনে, রোজই হয়, বড় কষ্ট হয়রে।'

তাঁতীবউ লজ্জায় যেন মরে গেল, সজ্জা তার গায়ে পুড়ে উঠল। মসলিন ছেড়ে ঠেঁটি পরে সে ফিরে এল বিছানায়। তাঁতীকে নিজের পাশে শুইয়ে বলল, 'কষ্ট হচ্ছে মাথায় ?'

'হ্যাঁ।'

তাঁতীবউ ভেবে পায় না কি করবে। বুকের মধ্যে তাঁতীর মাথাটা টেনে এনে বলল, 'এখানে চোখ বুজে থাক, ঘুমিয়ে পড়বি।'

'আমি কি বাঁচব না বউ', গোকুল ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ছোট ছেলের মতো তাঁতীকে টেনে নিয়ে তাঁতীবউ বলে, 'ষাট, ষাট।'

একটু হাসি পায় গোকুলের, বলে, 'তুই যেন মা হলি। আমি সেরে উঠব। তোর কাছে থাকলে সেরে উঠব।'

কবরেজের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করে ওষুধ এনে দেয় তাঁতীবউ, সারাদিন চোখের আড়াল করতে পারে না তাঁতীকে। অবোধ শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে রাখে বুকের কাছে। কিন্তু জ্বর তবু কমল না, সন্ধ্যা হতেই জ্বর আসে। হাড়সার হয়ে গেছে তাঁতী। তাঁতীবউ ভেবে পায় না—কি করে এমন হল, কিসে সারে।

মাঝে-মাঝে মনে হয় তার মনের দুঃখেই এমন গা পুড়ে যায়। গত দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তাঁতীর কোনো সাধই সে পূরণ করতে পারেনি। ভাবে, তাঁতী যদি নাই বাঁচে ?

একদিন রাত্রিতে ঘুম ভেঙে তাঁতী দেখল বউ বসে-বসে নিঃশব্দে কাঁদছে।

'কাঁদছিস তুই ?'

'দূর, কই না, কাঁদব কেন ?'

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে তাঁতীবউ। বলে, 'ঘুমাও লক্ষ্মীটি, আমি হাত বুলিয়ে দিই।'

'কত তো দিলি।'

'সে কি বেশি কথা নাকি? তোর তো কোনো সাধই মিটল না আমাকে দিয়ে।'

'সব মিটেছে এতদিনে।'

তাঁতীবউয়ের ঠোঁট কাঁপল—একটা ছেলে চেয়েছিল, তাও পারলাম না দিতে। নীরবতার ফাঁকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

তাঁতীবউ ভাবে—এর চাইতে অনেক ভালো হত যদি গোকুল আগেকার মতো গঞ্জনা দিত তাকে। গোকুলের প্রভাহীন চোখ দুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে সে ভাবে চোখের চারিদিকের ওই কালো ও যেন গোকুলের মনের ছাপ, সেখানে আশা নেই, শুধু অন্ধকার। শুধু একটা মূক অভিযোগ। সংসার করার সামান্য সাধও মেটেনি। গোকুল মুখ ফুটে তো বলেই না, জিজ্ঞাসা করলেও অস্বীকার করে পাছে তার মনে ব্যথা লাগে! সে ভালো বলেই না এত কষ্ট তার জন্য তাঁতীবউয়ের।

চার-পাঁচদিন খুব বেশি জ্বর হওয়ার পর সেরাত্রিতে গোকুলের জ্বর কম।

'আজ ঘুমাতে পারব, তুইও ঘুমিয়ে নে একটু'—এই বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁতীবউয়ের ঘুম এল না।

বাইরে ভাদ্রমাসের আকাশ থেকে টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে-থেকে বাতাসের সঙ্গে ঝরঝর করে পড়ছে। ওপাশের বিছানায় ছেলেটা কেঁদে উঠল। গোকুলের মুঠি থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁতীবউ উঠে দাঁড়াল। ছেলেটাকে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। একটা সুস্থ সবল ছেলে কেন তার কোলে এল না? গাজনতলার হাটে দেখা ছেলেদের মতো একটা পেলে গোকুল হয়তো বাঁচবার জোর পেত। এত নিবিড় করে সে গোকুলকে সুখী করতে চায় তবু কেন পারবে না সে। তাঁবুর অন্ধকারে গোকুলকে দেখবার প্রথম দিন থেকে সবগুলো দিনের ছবি একটার পর একটা যেন বাইরের নিবিড় অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠতে থাকে। কত সাহস তার হয়েছিল যেদিন অন্ধকারের আড়ালে সে ফকিরের কাছে গিয়েছিল মন্তর আনতে। সে কি তার সাহস—সে তো প্রাণপণে গোকুলকে সুখী করার চেষ্টা। তারপর একদিন গোকুল চলে গেল। গোকুলের জন্য প্রতীক্ষার দিবারাত্রিগুলির কথা ভাবতে গিয়েই মনে হল তার সেই রাত্রির কথা যার স্মৃতিতে পৃথিবী ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। ছি-ছি, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষের মন: গাজনতলার হাটে দেবশিশুর মতো ছেলে দুটিকে দেখবার পর তাদের পরিচয় পাবার পর মুহূর্তের জন্য যে সম্ভাবনার কল্পনাতে ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল তার মন, আজ তেমনি সম্ভাবনার ইঙ্গিতটিই তাকে দিশেহারা করে দিল। ছি-ছি-ছি, তবু তেমনি ফুটে উঠতে লাগল কল্পনাটা।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল। অন্ধকারের বুকে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা কি

এমন করে চোখে দেখবার মতো হয়ে ফুটে ওঠে ? যেন ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোর কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, বাকিটুকু ঘটবেই। ভবিষ্যতের তাঁতীবউ যেন অন্ধকারের গায়ে ফুটে উঠেছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে তাঁতীবউ ঠেঁটি পালটে মসলিন পরল, কপালে টিপ দিল, চোখে আঁকল কাজল। আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের বুকে ফুটে ওঠা ভবিষ্যতের ওই অর্ধপরিচিত মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করল। রুক্ষ ভাস্বর রিক্ততায় সে যেন জ্বলতে-জ্বলতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল তাঁতীবউ। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ঝরঝর করে উঠল উঠোনের পারের আমগাছটার মধ্যে। তাঁতীবউ উঠোন পার হল, সদর পার হল, সদরের দরজা ঠেলে বন্ধ করে দাঁড়াল পথে। অন্ধকারে সামনে পিছনে একাকার হয়ে গেছে। সামনে তবু নজর চলে। পিছনের যে দরজাটা এইমাত্র সে বন্ধ করে দিল হাতড়েও সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাঢ় অন্ধকারে আর সব অনুভূতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, একটা অনির্দিষ্ট প্রাবল্যে উদরের অন্তগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে বারে-বারে।

জমিদার-বাড়ির বাগান পার হয়ে এল তাঁতীবউ। গ্রামের বউঝিদের কৌতূহল ও আতঙ্কের গল্প শুনে-শুনে সে জানে কোথায় সে ঘরটি। প্রতিবার পা ফেলতে সারা গায়ের স্নায়ুগুলো রিন-রিন করে উঠছে। রুদ্ধ দরজার ফাঁকে, আধ-খোলা জানলায় একটু আলো চোখে পড়ল। দরজা ধরে দম নিতে লাগল তাঁতীবউ। তার একবার মনে হয়েছিল কেঁদে ফেলবে সে। একটা অস্ফুট অর্ধজান্তব আকুতি যেন দরজায় করাঘাত করল তার মনের মধ্যে। কি করে দরজা খুলে গেল তাঁতীবউয়ের মনে নেই। প্রবল প্রতিরোধে হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে উঠতে না দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে।

বর্ষণক্ষান্ত আকাশে ভোরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনো প্রদীপটি জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। ছেলেটি এখনই জেগে উঠবে। তার আগে একটু বিশ্রাম করতে হবে। স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হল তার। ঘুমটা আজ ভালোই হচ্ছে গোকুলের। কয়েক বিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তাঁতীবউ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে।

মাটিতে শুয়ে দেখতে-দেখতে তাঁতীবউ ঘুমিয়ে পড়ল।